পূর্বাপর ১৯৭১

পাকিস্তানি সেনা-গহ্বর থেকে দেখা

মেজর জেনারেল মুহাম্মদ খলিলুর রহমান (অব.)

বেঙ্গল রেজিমেন্টের পথিকৃৎ অফিসারদের একজন হিসেবে মেজর জেনারেল মুহাম্মদ খলিলুর রহমান পাকিস্তান সেনাদলে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন উচ্চপদে। দীর্ঘকাল সেনাবাহিনীতে কর্মকালে পাকবাহিনীর ভেতর কাঠামোর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তিনি লাভ করেছিলেন। অবিভক্ত বাংলার প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় তখন এক ব্যতিক্রমী সত্তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। পাকবাহিনীতে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে স্টাফ কলেজের শিক্ষা সমাপন করেন, বাঙালি অফিসার হিসেবে বৈষম্যের শিকার হলেও সামরিক রণনীতি নির্ধারণে চিন্তাশীলতার প্রয়োগে তাঁর দক্ষতা ব্যবহার না করে সেনাবাহিনীর গত্যন্তর ছিল না। তাই তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে যুক্ত থেকেছেন এবং কাছে থেকে দেখেছেন পদস্থ পাকিস্তানি জেনারেলদের। ১৯৭১ সালে রাওয়ালপিণ্ডি আর্মি সদর দপ্তরে এহেন দায়িত্বে নিয়োজিত বাঙালি অফিসারকে কার্যত দাপ্তরিক কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং পরে আটক করা হয় বন্দিশিবিরে। পাকিস্তানি সেনা-গহ্বরে অতিবাহিত দিনগুলোর কথা এই প্রথমবারের মতো ব্যক্ত করলেন তিনি এবং সেই সূত্রে একাত্তরের পাকবাহিনীর ভেতরমহলের অজানা বিভিন্ন দিক এখানে উদঘাটিত হয়েছে। কেবল সামরিক ইতিহাস বিবেচনায় নয়, পাকিস্তান যুগ এবং তৎকালীন সামরিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক উপাদান মিলবে এই গ্রন্থে। ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন, সমরশক্তির গঠন ও মনস্তত্ত্ব যাঁদের বিবেচ্য তাঁদের বারবার ফিরতে হবে এই গ্রন্থের কাছে।

ISBN 984-465-404-1



পূর্বাপর ১৯৭১

পাকিস্তানি সেনা-গহ্বর থেকে দেখা

মেজর জেনারেল মুহাম্মদ খলিলুর রহমান (অব.)

সাহিত্য প্রকাশ



প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার
দ্বিতীয় মুদ্রণ : চৈত্র ১৪১৫, মার্চ ২০০৯
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১১, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
ISBN 984-465-404-1

মূল্য : দুইশত টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

সূচি

প্রথম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক ঘটনাবলি ও পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষের মনোভাব

২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু

তারিখ : ২৯ মার্চ ১৯৭১, স্থান : পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১ নং 'কোর' (corps)-এর সদর দফতর মংলা, সময় : সকাল এগারোটা। কোর সদর দফতরের অফিসারদের চায়ের মিলনী। সভাঘরে সকলে একত্র হয়ে চা-পানের কথা। একজন মেজর জেনারেল, দু'জন ব্রিগেডিয়ার, কয়েকজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও মেজর উপস্থিত। আমিও রয়েছি সেখানে। আমরা অপেক্ষা করছি কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইরশাদের জন্য। একটু পরেই তিনি তাঁর অফিস কক্ষ থেকে বের হয়ে এলেন এবং চা-পর্ব শুরু হলো। সেনাবাহিনীর এই সাপ্তাহিক চা-পর্বের উদ্দেশ্য, একত্রে চা-পানের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য গড়ে তোলা ও বজায় রাখা। এছাড়া বিভিন্ন দফতরের অফিসারদের মধ্যে যদি ছোটখাট সমস্যা থাকে পরস্পরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করা। আর তার চাইতেও প্রয়োজনীয়, কোর কমান্ডার বিভিন্ন অফিসারের সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে কথাবার্তা বলেন, পরস্পর পরিচিত হন এবং কারো কোনো সমস্যা থাকলে সে সম্পর্কে অবগত হন। কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে কোর কমান্ডারের কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে পৌঁছানো নিম্নপদস্থ অফিসারের পক্ষে বহু সময় ও বাধাসাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে বিকল্প এই প্রথাটি বিশেষ কার্যকর।

২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত ও অকল্পনীয় হত্যাকাণ্ড শুরুর পর এই প্রথম চা-চক্র। অতএব, সে ব্যাপারে আলোচনা উঠবেই জানতাম। তাই যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই, যেহেতু অফিসে এসেছি।

২৫/২৬ মার্চ রাতে ঢাকায় সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে জানার জন্য প্রায় ষাট মাইল দূরে রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়েছিলাম ২৭ মার্চে। সবই যে জানতে পেরেছি তা নয়। তবে যতোটুকুই জেনেছি তাতে আমার ও আমার পরিবারবর্গের যে মানসিক অবস্থা হয়েছিল তা বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। মনে বারবার একটি প্রশ্ন জেগে উঠতে লাগল— আধুনিক ও সভ্য মানবসমাজে এমন বর্বরতা কী করে সম্ভব? অথচ এরা উচ্চস্বরে দাবি করে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানেরই অর্ধাংশ এবং দুই অংশ পরস্পরের ভাই।

নিজেকে কোনো রকমে টেনেটুনে অফিসে যাই। যথাসম্ভব কাজ করি। কারো সাথে বিশেষ কথা বলি না। ওরাও কেউ ঢাকার প্রসঙ্গ আমার কাছে তোলে নি। আশা করছিলাম হয়তো আজকেও কথাটি না উঠতে পারে। কিন্তু ২/৪ মিনিট একথা-ওকথার পর 'কোর' কমান্ডার লে. জেনারেল ইরশাদ আমার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, ঢাকার ঘটনাবলি সম্পর্কে শুনেছি কিনা। কিছু কিছু শুনেছি বলার পর জানতে চাইলেন আমার প্রতিক্রিয়া কি। অর্থাৎ বাঙালির প্রতিক্রিয়া কি? কারণ সেখানে আমিই ছিলাম একমাত্র বাঙালি। পাঞ্জাবিদের প্রতিক্রিয়া জানার আগ্রহ তো তাঁর থাকার কথা নয়। যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরে কথা বলার চেষ্টা করলাম; কিন্তু বলার সময় গলা কিছুটা কেঁপে উঠলো তো বটেই।

বললাম, আমি সব খবর শুনতে পাই নি। মনে হয় আংশিকই শুনেছি। তবে যা শুনেছি তার এক-দশমাংশও যদি সত্যি হয় তবে নিশ্চিতভাবেই ধরে নিতে পারেন যে পাকিস্তান নামক দেশটি একটি অতীতের বিষয় হয়ে গেছে (পাকিস্তান ইজ এ থিং অব দি পাস্ট)। উপস্থিত সবাই হয়তো কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা করেছিল, কিন্তু 'দেশটি ভেঙে গেছে' এমন কঠোর মন্তব্য আশা করে নি। মনে হলো সবাই যেন একটু চমকে উঠল। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতায় কাটল। তারপর জেনারেল ইরশাদ অনেকটা ধীর কণ্ঠে বললেন, 'এই দেশটি রক্ষা করার দায়িত্ব তো সেনাবাহিনীরও রয়েছে। তাই না? সেই অনুসারেই ঢাকায় অ্যাকশন নিতে হয়েছে। আর তো উপায় ছিল না।' এই বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন। বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধে কোনো কথাই আমার ভালো লাগছিল না। তবুও উত্তরের অপেক্ষায় তিনি তাকিয়ে রয়েছেন দেখে বললাম, 'সেনাবাহিনীর কর্তব্য আদেশ-প্রাপ্ত হয়ে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। জাতিকে রক্ষা নয়। ঢাকার ব্যাপারটি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নয়। যা হোক, এসব তর্কের ব্যাপার। আমি কেবল বলতে চাইছি এরপর পাকিস্তান নামক দেশটির কী হবে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবেই দেশটি ভেঙে যাবে।'

আমার মন্তব্য শুনে সেখানে উপস্থিত কেউ সন্তুষ্ট তো হলেনই না, বিশ্বাসও করলেন না। তাঁদের চেহারা দেখে গোড়াতেই মনে হয়েছিল যে, তাঁরা ঢাকায়

গৃহীত সামরিক তৎপরতায় অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত যে সামরিক বাহিনীকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অর্থাৎ বাঙালিরা সেনাছাউনিতে অপমানজনক ও অসহায়ভাবে আটকে রেখেছিল তার সমুচিত জবাব দেয়া হয়েছে বলে এরা সামরিক বাহিনীর ওপর অত্যন্ত খুশি। ঢাকায় 'কিছু' আওয়ামী লীগপন্থীকে হত্যা করা হয়েছে? তা তো হবেই। এছাড়া উপায় কি? এই রকমই একটা মনোভাব ছিল এদের সবার; কিন্তু বাঙালি জনগণও যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে পারে এ চিন্তা তারা মোটেই করে নি। আর এই প্রতিরোধের ফলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, পাকিস্তান ভেঙে যেতে পারে, এসব তো একেবারেই অবিশ্বাস্য।

জেনারেল ইরশাদ আমার জবাব শুনে বললেন, 'আমি বুঝতে পারি এই তিক্ত ঘটনায় তোমরা কতটা আহত বোধ করছো। কিন্তু তুমি কি জান আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা কী রকম নৃশংসতার সাথে বিহারিদের হত্যা করেছে, তাদের ওপর কত অত্যাচার চালিয়েছে? এরপর কি সেনাবাহিনীর ওপর কর্তব্য বর্তায় না এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার?'

উপস্থিত সবার প্রতি আমার অন্তরে তখন ঘৃণা ও প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষা। তর্ক কিংবা আলোচনা করার মতো মনের অবস্থা আমার একেবারেই ছিল না। বরং ঘৃণা, অপমান, অসহায়ত্বের বেদনায় স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে চুপ করে গেলাম।

কিন্তু জেনারেল ইরশাদ আবার বললেন, 'দেখ খলিল, আমি তোমার মানসিক যন্ত্রণা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত। তবে আমি তোমার কাছে কয়েকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি। তুমিই বল, সেনাবাহিনী এই অবস্থায় কি করতে পারত।'

আলোচনার প্রতি আমার প্রবল অনীহা দেখে এবং সর্বোপরি আমার আশাতীত রূঢ় মন্তব্য শুনে জেনারেল ইরশাদের সেদিন আর প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করেই চলেছেন। এর কারণ মনে হয়, আমার মনের বিদ্যমান অবস্থা বুঝেও কিছু খবর আমার কাছ থেকে, একজন বাঙালির কাছ থেকে তিনি জানতে চাচ্ছিলেন। আর এতোই আগ্রহ নিয়ে কথা বলছিলেন যে, তখনকার পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধেও তাঁর খেয়াল ছিল না। কোর সদর দফতরের সব ক'জন অফিসার আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। এঁদের সকলের সামনে এইসব স্পর্শকাতর আলোচনা একেবারেই নিষিদ্ধ হওয়ার কথা; কিন্তু তিনি কথা চালিয়েই যাচ্ছেন। আমার মনে একবার সন্দেহ জাগল, কি ব্যাপার? সবাইকে সাক্ষী রেখে আমার এইসব দেশদ্রোহী বক্তব্য নেয়া হচ্ছে না তো? তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমার দেশের এই পরিণতির মধ্যে আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ তো একেবারেই 'ফরসা'। অতএব এ নিয়ে আর চিন্তা কেন? সেই সঙ্গে আমার এটাও মনে পড়ল, জেনারেল ইরশাদ আমার সঙ্গে এমনি বিভিন্ন

স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ইতোপূর্বেও বহুবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছেন ও করে অভ্যস্তই ছিলেন।

জেনারেল ইরশাদ পেশাগত জীবনে এর আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলেন। পাকিস্তান, ভারত ও অন্য যেসব দেশ পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কিত তাদের সম্বন্ধে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। এদিকে দেশ-বিদেশের খবর শোনা আমারও বিশেষ অভ্যাস। বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, ভারতের আকাশবাণী শোনা আমার নেশা। সেই সূত্রে আমাদের মধ্যে একটা কথোপকথন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইরশাদ ছিলেন স্বল্পভাষী। গাড়িতে চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ পরিক্রমণকালেও তিনি নির্বাক ও নিশ্চুপ বসে থাকতেন। গাড়িতে এ ডি সি ছাড়া কাউকে নিতেন না; কিন্তু এ ডি সির সাথেও বাক্যালাপ হতো না। এমনি প্রকৃতির ইরশাদ আমাদের সাপ্তাহিক চা-পানের আসরে পাকিস্তানের প্রতি ভারতীয় কার্যক্রম, কুমতলব ইত্যাদি নিয়ে মাঝে মাঝেই কথা বলতেন এবং ওখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তুলে ধরতেন তাঁর কথার যুক্তি হিসেবে। এইসব কথাবার্তার মাঝে আমি দু-একবার বলার চেষ্টা করেছি যে, ইরশাদ যা শুনেছেন সেসব একতরফা। ভারতে অন্য ধরনের অবস্থানও রয়েছে, যেমন অমুক ভারতীয় নেতা এ সম্বন্ধে এই বলেছেন ইত্যাদি। এভাবেই আলাপচারিতা দীর্ঘায়িত হতো এবং কখনো কখনো চা-বিরতির সময় ফুরিয়ে যেত বলে আমাকে অফিসে ডেকে নিয়েও অসমাপ্ত আলোচনা চালিয়ে যেতেন।

ভারতের আকাশবাণীর সম্প্রচার কোনো পাকিস্তানি অফিসারই শুনতেন না। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন ওটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ব্যাপার। এদিকে অন্তর্মুখী মনের ইরশাদের যে দু-একটা বিষয়ে আগ্রহ, তার মধ্যে প্রধান ছিল বিভিন্ন দেশের রাজনীতি ও গোয়েন্দা সম্পর্কিত খবরাখবর। এই সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন, ছয় দফা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনায় প্রাধান্য পেত; কিন্তু আজ পাকিস্তানের, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ভিন্নরূপ। আর আমার মনের অবস্থাও আলোচনার উপযোগী নয়। কিন্তু তবুও হয়তো আগেকার কথাবার্তার জের ধরে তিনি আমাকে প্রশ্নটি করেছেন। একবার ভাবলাম সরাসরি 'না' করে দিই যে আজকে কোনো কথা হবে না। আবার ভাবলাম, ইরশাদ পাকিস্তানের যে 'কোর'টির অধিনায়ক তা গুণগত ও শক্তিগত মানে পাকিস্তানের সামরিক শক্তির অর্ধাংশের অধিকারী। সে কারণে জাতীয় নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির বড় রকমের প্রভাব আছে। অতএব, ঠিক করলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করবো তাঁকে বোঝাতে যে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও সামরিক শাসকগোষ্ঠী দেশের অস্তিত্বই ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভাবলাম যদি কথাটি ইরশাদকে ভালো করে বোঝাতে পারি তবে হয়তো এই

ধ্বংসযজ্ঞ বাধা পেয়ে রাজনৈতিক সমাধানের দিকে মোড় নিতেও পারে।

বললাম, 'এ অবস্থায় সেনাবাহিনীর করণীয়ের স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে কয়েকটা মৌলিক ব্যাপার আপনাদের উপলব্ধি করতে হবে। প্রথমত, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং সন্দেহাতীতভাবেই করেছে। অতএব, গণতন্ত্রের অমোঘ বিধান অনুযায়ী সামরিক শাসকের জন্য একমাত্র, আমি পুনরায় বলছি 'একমাত্র' কর্তব্য পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা। এ ক্ষেত্রে কোনো রকম 'কিন্তু'র অবকাশ থাকতে পারে না। অথচ সামরিক সরকার নির্বাচিত দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর তো করেই নি বরং সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতা অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী দেশের প্রধানমন্ত্রীকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়েছে। আমি কোনো আবেগের মাথায় কথাগুলো বলছি না। বলছি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়। আশা করছি উপস্থিত সকলেই ঠাণ্ডা মাথাতেই পরিস্থিতিটি অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন।'

'এই পরিস্থিতিতে যদি কেউ প্রশ্ন করে সেনাবাহিনী নামক সংগঠনটিকে এ অধিকার কে দিয়েছে? অধিকার দেয়ার একমাত্র শক্তি দেশের জনগণ রাখে। জনগণ তো তাদের মতামত নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছে। এখানে সামরিক শাসক ও সামরিক বাহিনীর তো কোনো কর্তব্য নেই, অধিকারও নেই।'

আমাকে থামিয়ে জেনারেল ইরশাদ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত নেতা যদি পাকিস্তানকে ভেঙে দিতে চায়?'

উত্তরে বললাম, 'এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়টির উপলব্ধি প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি দেশের প্রশাসনিক, সাংবিধানিক কাঠামো ইত্যাদি একটি বিশেষরূপে পরিবর্তিত ও রূপান্তর করতে চায়, তবে রাজনৈতিকভাবে তো সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত রাজনীতিক দলগুলো মিলেই সেই প্রশাসনিক সাংবিধানিক কাঠামোটি ঠিক করেছে। এ ব্যাপারেও সামরিক বাহিনীর কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। এ অধিকার তো জনগণ তাদের দেয় নি। তারা তো গণতান্ত্রিক দেশে নিয়োগপ্রাপ্ত বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। জনগণের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ কেন?'

'এবার আপনার তৃতীয় প্রশ্নে আসা যাক। আওয়ামী কিংবা বাঙালি 'গুণ্ডারা' বিহারি অভিবাসনকারীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে। এমনকি হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। হ্যাঁ, পুরোপুরি না হলেও সেখানকার ঘটনা কিছু কিছু আমিও শুনেছি, বাকিটা অনুমান করতে পারি যে নির্বাচনে জয়ী হয়েও

ক্ষমতা পাওয়ার দিকে না গিয়ে বরং 'দেশদ্রোহী' আখ্যা পেয়ে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা অর্থাৎ সমগ্র বাঙালি জনগণ হতাশাগ্রস্ত ও অপমানবোধে উত্তেজিত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ও ইতস্তত হয়তো এ ধরনের অপরাধমূলক তৎপরতা চালিয়েছে; কিন্তু সেই অপরাধগুলো আইন-শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা। হতে পারে গোষ্ঠী দাঙ্গা। এর জন্য তো আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাই আছে। পরিস্থিতি তাদের সাধ্যের বাইরে গেলে বেসামরিক প্রশাসন সংবিধান অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে পারে। সে সাহায্য হবে একদিকে যেমন বেসামরিক প্রশাসনের অনুরোধে, অন্যদিকে হতে হবে অতি সীমিত আকারে ও অতি সীমিত সময়ের জন্য। শুনেছি পুলিশ ও সামরিক বাহিনী অনুরূপভাবেই আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার্থে জনতার ওপর গুলিও চালিয়েছে। বিহারি-বাঙালি দু' পক্ষেই হতাহত হয়েছে। প্রয়োজন হলে এ প্রচেষ্টা আরও চলতো। কিন্তু তাই বলে কি একটি আধুনিক সভ্যরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কামান দাগিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে?'

'আমি যতটুকু শুনেছি, ২৫ মার্চের রাতে তারা ছাত্রদের হোস্টেলে কামানের গোলা ছুঁড়েছে। রিকশাচালক, পথচারী নির্বিশেষে শত শত, কেউ কেউ বলে হাজার হাজার মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে। অধ্যাপকদের বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে তাঁদেরকে পরিবার-পরিজনের সামনে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয় ইংরেজের দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ও মাত্র একবারই ব্রিগেডিয়ার ডিওর কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগে সাধারণ নিরস্ত্র জনগণের ওপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। ভারতবাসীর ওপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ব্যবহার সেই প্রথম ও শেষ। এজন্য জেনারেল ডিওর বিলেতে বিচারের সম্মুখীন হয়ে শাস্তি পেয়েছে। আর আজ? স্বাধীন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদের দেশবাসীদের ওপর কেবল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নয়, গোলন্দাজ বাহিনীও ব্যবহার করেছে। জনগণ দ্বারা বিহারিদের ওপর অত্যাচার আইনসিদ্ধ নয়; কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই শক্তি প্রয়োগ পাকিস্তানের কোন্ আইনে আছে?'

'আপনি বলেছেন আমি মানসিকভাবে আহত। আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। ধরুন কোনো কারণে লাহোরের রাজনৈতিক কর্মী কিংবা জনসাধারণ, পাঞ্জাবের পাঠান কিংবা সিন্ধি কিংবা বালুচ বাসিন্দাদের ওপর অনুরূপ হত্যা ও অত্যাচার চালায়, তবে কি পাঞ্জাবি-প্রধান সামরিক বাহিনী কামান ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে লাহোরের নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাজার লোককে (অধ্যাপকসহ) হত্যা করবে? আর যদি করে, তবে কি অন্যান্য পাঞ্জাবি জনগণ ঘরে বসে তামাশা দেখবে? এছাড়া কোন্ পাঞ্জাবি জেনারেলের এমন সাহস আছে যে, পাঞ্জাবি সিপাহিকে আদেশ দেবে পাঞ্জাবিদের হত্যাযজ্ঞে

মেতে উঠতে? আজ বাঙালির দুর্ভাগ্য যে তাদের অঞ্চল তাদের সৈনিক দ্বারা রক্ষিত নয়। বুঝতেই পারছেন বাঙালি সৈনিক বাঙালি জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাতো না, যেমন পাঞ্জাবি সৈনিক পাঞ্জাবি জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো না। ঠিক এই কারণটির জন্য পাকিস্তান নামক দেশটি শেষ হয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার।'

একনাগাড়ে এতো কথা বলে আমি চুপ করলাম। জেনারেল ইরশাদ সকলের মুখের দিকে তাকালেন, পরে ঘড়ি দেখে বললেন, 'সময় হয়ে গেছে। চল কাজে যাই।' এই বলে তিনি তাঁর কক্ষে ফিরে গেলেন। আমরা যার যার দপ্তরে চলে গেলাম।

আমি পরিষ্কারভাবে বুঝলাম যে, আমার এই বক্তৃতা দেশপ্রেমহীন এবং আঞ্চলিকতা-দোষে দুষ্ট এক দেশবাসীর প্রলাপ বলেই উপস্থিত সকলে ধরে নিলেন। কোথায় পাঞ্জাবি জনগণ আর কোথায় পাকিস্তান ভঙ্গকারী অর্থাৎ পাঞ্জাবের অবাধ্য ও হিন্দুঘেঁসা বাঙালি জনগোষ্ঠী।

অফিসে এসে ভাবতে লাগলাম, বললাম তো যে পূর্ব পাকিস্তান আজ থেকে আর পাকিস্তানের অংশ নয়; কিন্তু বললেই তো হবে না। বাঙালিদের তো এই নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সংগঠন আছে। নেতৃত্বও আছে, কিন্তু এই প্রতিরোধ তো সশস্ত্র প্রতিরোধ। নিরস্ত্র, প্রশিক্ষণবিহীন জনগণের পক্ষে তো এর বিপরীতে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা কঠিন, যদিও অসম্ভব নয়। অতএব, এ কয়দিনে ঢাকার অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়েছে সেটা জানতে হবে। অপমানবোধ থেকে যেসব দম্ভোক্তি করেছি সেগুলো অর্থহীন প্রমাণিত হয়ে গেলে, নির্বোধ কাপুরুষতার গ্লানি ও অপমানের বোঝা চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবে না তো? হঠাৎ অসহায়ত্বের বেদনায় আরও অস্থির হয়ে চলে গেলাম বাসায়।

এদিকে চাকরিতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তো পুরোপুরিই ছিল। আমার এমনি বক্তব্যের পর আমাকে ওরা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যবিহীন সামরিক অফিসার হিসেবে কোর্ট মার্শালও করতে পারে; কিন্তু অপমানবোধে সে চিন্তা মনে এলেও বেশিক্ষণ ঠাঁয় পায় নি। দেশের অবস্থা যদি এইরূপ করুণ হয় তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার কি হবে তা ভাবা অর্থহীন মনে হয়েছে।

সেদিন আবার গেলাম পিণ্ডি, খবর জানতে। অনুমান করতে পারতাম বহু বছর পর যে বাঙালি জাতি আজ সম্পূর্ণভাবে একাত্ম সে জাতি পাঞ্জাবি সৈন্যের এই আঘাত অসহায়ভাবে মেনে নেবে না—অস্ত্র তুলে নেবে হাতে। তবে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া তো অস্ত্র পাওয়া যায় না, ব্যবহারও করা যায় না। কিন্তু যদি এই সংগ্রামে পুলিশ, ই পি আর এবং সেনাবাহিনীর দলত্যাগী বিদ্রোহী সৈনিকরা যোগ দেয় তবে অতি শিগগিরই সেই প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠবে।

২৯ মার্চ পিণ্ডি গিয়ে শুনলাম যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কেবল পুলিশ, ই পি আর, আনসার সবাই সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত হয়েছে তাই নয়, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরাও স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট তো প্রায় সংগঠিতভাবে যোগ দিয়েছে। ইতোমধ্যে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' অর্থাৎ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার যে ঘোষণা দিয়েছেন তা সব বাঙালিই শুনেছে। এই খবরগুলো পেয়ে আর সন্দেহ রইলো না যে, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমাদের সামরিক বিশ্লেষণ এই ছিল যে, হাজার মাইল দূর থেকে সীমিত সরঞ্জাম নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে এ সংগ্রামে বিজয় লাভ অসম্ভবই বলা চলে। বিশেষ করে একটি কথা মনে রাখলে এ সত্যটি অনুধাবন করতে কষ্ট হবে না যে, এই সংগ্রামে ভারতকে জড়িয়ে পড়তে হবে, ভারতের ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক।

এই সত্যটি বিশেষ করে আমার হতাশাপূর্ণ মনকে অনেকটা স্বস্তি দিলো।

বাসায় এসে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও ভারতীয় রেডিও'র সংবাদ শুনতে লাগলাম। শেখ মুজিবকে বন্দি করা হয়েছে। এদিকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী গ্রামে-গঞ্জে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড, বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছাই করা, ধর্ষণ, লুটপাট ইত্যাদি কার্যক্রমে মেতে উঠেছে। শুনে মনের অবস্থা অবর্ণনীয়ভাবে কাতর হলেও একটা আশাব্যঞ্জক দিকও মনে জেগে উঠলো। এবার আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী সবাই নিজেদের রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে গিয়ে একত্র হবে, আপামর জনসাধারণ এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একাত্তরের মার্চ-পূর্ববর্তী ঘটনাবলি

আজাদ কাশ্মিরের পাদদেশে অবস্থিত মংলা একটি ছোট্ট গ্রাম। ঝিলাম নদীর বিখ্যাত বিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মিত হয়েছিল এই ক্ষুদ্র মংলা গ্রামটিতে। তখন আমেরিকানরা প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীদের বাসস্থান হিসেবে গড়ে তোলে এক নাতিবৃহৎ কলোনি। গল্‌ফ্ কোর্স থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল আধুনিক সুবিধাদি ছিল এই কলোনিতে। বাড়িগুলো নিচু কিন্তু সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। আমেরিকানরা চলে যাওয়ার পর এই কলোনিতে স্থাপিত হয় সামরিক কোর সদর দফতর। আমেরিকা-প্রদত্ত আধুনিক যুদ্ধ-সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত চারটি ডিভিশন নিয়ে গঠিত হয়েছিল এক নম্বর কোর এবং এর সদর দফতর স্থাপিত হয় বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণশেষে পরিত্যক্ত মংলা কলোনিতে। স্থানটি পিণ্ডি-লাহোর

মহাসড়কে, পিণ্ডি থেকে মাইল ষাটেক দূরে।

১৯৭০-এর নির্বাচন। পাকিস্তানের সামরিক কর্মকর্তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল এই নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় সকল আসনে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্তত অর্ধেক আসনে আইয়ুব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কনভেনশন মুসলিম লীগ নামক দলটি জিতবে। এই দল ছিল একান্তভাবে সামরিকতন্ত্রপন্থী অর্থাৎ 'দেশপ্রেমিক'। অতএব, ইয়াহিয়া খানের সরকারের জন্য এই নির্বাচন কোনো মাথাব্যথার কারণ হবে না। এছাড়া একমাত্র 'দেশপ্রেমহীন' অর্থাৎ পাকিস্তান ভাঙার পক্ষের রাজনৈতিক দল তো শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ। তারা পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৩০/৩৫টির বেশি আসন পাবে না।

এ সম্বন্ধে একটি কৌতুকপূর্ণ ঘটনা এখানে না বললেই নয়। পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগকে সর্বোচ্চ বলা যায় এবং 'সর্বশক্তিমান' সংগঠন হলো আই এস আই (ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স), বাংলাদেশে যেমন ডি জি এফ আই গড়ে উঠেছিল দুই সামরিকতন্ত্র, জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে। এই আই এস আই'র একটি সুদৃশ্য ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বের হয় অনেকটা 'ম্যাগাজিন' আকারে। ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনটি ছাপা হয়ে বিভিন্ন দফতরে পৌঁছাতে প্রায় মাস দুই পার হয়ে যায়। অর্থাৎ আজকের ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন অফিসে পৌঁছাবে দু'মাস পরে। নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে গোয়েন্দা বিভাগের ভবিষ্যদ্বাণীটিও পৌঁছেছিল ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের পরে। অথচ এর আগেই নির্বাচন ও তার একান্তভাবে নৈরাশ্যজনক এবং পরম উদ্বিগ্নকারী ফলাফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে।' মনে আছে, প্রতিবেদনটি কোর সদর দফতরে আমার হাতে প্রথম পৌঁছায়। আমি পরে সেটি নিয়ে গিয়েছিলাম কোর কমান্ডার জেনারেল ইরশাদকে দেখাতে। প্রতিবেদনটির ওপর চোখ বুলিয়ে ইরশাদ যে উক্তিটি করেছিলেন তা যেমনি অশ্রাব্য তেমনি অমুদ্রণীয়। আমি চলে আসছি দেখে বললেন, 'বসো।' আমি তবুও ইতস্তত করছি দেখে শান্তস্বরে বললেন, 'খানিক বোস।'

ইরশাদ কমান্ডার হিসেবে ছিলেন যেমনি কঠোর তেমনি ভীতিপ্রদ। কথা বলতেন খুব কম কিন্তু ত্রুটি দেখিয়ে দিতেন অত্যন্ত কঠোর ভাষায়—যদিও উচ্চস্বরে নয়। যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ, তাই অধস্তন কর্মকর্তা কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে কিছুটা বিপদাপন্ন বোধ করতেন। অন্যদিকে অর্থ ও লোভ-লালসার ব্যাপারে ইরশাদের মতো সৎ ব্যক্তি আমি আর দেখেছি কিনা সন্দেহ। একটি উদাহরণ—একবার ব্যক্তিগতভাবে করা দূরপাল্লার টেলিফোন কলের বিল তাঁর অপারেটর সরকারি কাজের খাতে লিখে দিয়েছিল। আর যায় কোথায়—সে কি লঙ্কা কাণ্ড! আমার অভিজ্ঞতায় তিনি কেবল বাহ্যিকভাবে সৎ ছিলেন না, নৈতিকভাবেও সৎ ছিলেন। এমনি সমন্বয়

সচরাচর চোখে পড়ে না।

ইরশাদের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আমার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকতো। তিনি বক্তৃতার সময় কখনও বলতেন না, 'তোমরা সৎ হও', কিংবা 'সততা একটি উত্তম গুণ।' একথাও বলতেন না, 'তোমরা পরিশ্রম কর', 'পরিশ্রম কর' ইত্যাদি।' তবে পরিশ্রম না করে তাঁর অধীনে চাকরি বোধহয় সম্ভব ছিল না। মিথ্যা বললে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল সমধিক। অথচ আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যাঁরা বক্তৃতায় সদা বলেন, 'তোমরা সৎ হও', তাঁদের বেশির ভাগই ব্যক্তিগতভাবে সৎ নন।

আমি বছরখানেক তাঁর অধীনে চাকরি করেছি—তাঁর বন্ধু বলে কাউকেও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমরা যারা অধস্তন কর্মকর্তা, তারা তাঁর অফিসে গেলে কোনোদিন বসতে বলতেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ২/৪ মিনিট কথা বলেই বিদায়। নেহায়েত দীর্ঘ আলোচনার বিষয় হলে অন্য কথা; কিন্তু সে রকম প্রয়োজন মাসে দু'মাসে এক-আধবার হতো কিনা সন্দেহ। অতএব, বসতে আমার ইতস্ততভাব। অবশেষে বসলাম।

ইরশাদ চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখের চশমা খুললেন, কাচ পরিষ্কার করে টেবিলে রাখলেন, চোখ দুটো দু'হাত দিয়ে মৃদুভাবে ঘষলেন। বুঝলাম মনে মনে পরিশ্রান্ত কিংবা উদ্বিগ্ন। শেষে বললেন, 'বলতে পারো ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতি কোন্ দিকে মোড় নেবে?'

যদিও সেই মুহূর্তে প্রশ্নটির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, তবে এমনি প্রশ্ন নিয়ে যে ভাবি নি তা নয়; কিন্তু যা ভেবেছি তা তো তাঁকে বলা যাবে না। তাঁকে কী করে বলবো যে, আমার ধারণা রাষ্ট্রক্ষমতা পাঞ্জাবিরা বাঙালির হাতে ছেড়ে দিয়ে কোনোদিনও দ্বিতীয় সারিতে বসবে না। অতএব, সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। তবে মনে মনে আশা ছিল এই রাজনৈতিক সংঘাতের সমাধানও রাজনৈতিকভাবে হবে। দু'পক্ষ সহ-অবস্থানের একটি ফর্মুলা রাজনৈতিকভাবে উদ্ভাবন করবে।

উত্তরে বললাম, 'আপনি কি মনে করেন না যে, সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে? কারণ জাতি তো নীতিগতভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে।' আমারও ইচ্ছা তাঁর মতটি জানা। প্রশ্নটি শুনে ইরশাদ পুনরায় চেয়ারে হেলান দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মুজিবের ছয় দফা নিয়ে। ছয় দফা বাস্তবায়ন করা আর পাকিস্তান ভেঙে ফেলা তো একই কথা, তাই না?' উত্তরে আমি বললাম, 'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না। তবে চাপ দিলে মুজিব হয়তো ছয় দফা কিছুটা পরিবর্তন করে পশ্চিম পাকিস্তানের ভীতিটা দূর করতে পারে।' যদিও আমি জানতাম মুজিব তা করতে পারবে না। তারপর প্রশ্ন করে জানতে চাইলাম তেমন হলেও রাষ্ট্রক্ষমতা বাঙালির হাতে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা।

'তা যদি হয়ও তবু একটি কথা থেকে যায়। জান তো ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে সমর সরঞ্জাম ছিল অপ্রতুল। এর কারণও তুমি জান। ভারতের শক্তির তুলনায় পাকিস্তানের সামরিক শক্তি কম। এই শক্তি দিয়ে পাকিস্তানের দু'অংশেরই সম্যক প্রতিরক্ষা বিধান সম্ভব নয়। অতএব, আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নির্ভর করবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ওপর। এছাড়া উপায়ও নেই।' একথা বলে ইরশাদ থামলেন। আমিও জানতাম বলে তিনি সবিস্তারে বললেন না যে, ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করে ফেলে তবে আমরাও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দিল্লি পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যাব। ইতোমধ্যে যুদ্ধের জন্য আমাদের যেটা প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ কাশ্মির দখল সেটাও করা হয়ে যাবে। যুদ্ধশেষে যখন জাতিসংঘের অধীনে অস্ত্রবিরতি ঘোষিত হবে তখন বিজিত অঞ্চল বিনিময় করে আমরা পূর্ব পাকিস্তান ফিরে পাবো। এদিকে কাশ্মির ব্যতীত বাকি বিজিত অংশ ভারতকে ফেরত দেব। এই ছিল পাকিস্তানের পাক-ভারত যুদ্ধ পরিকল্পনার মূল ভিত্তি।

তবে ইরশাদ যে কথা বলতে পারলেন না তা হলো, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের ফলাফল, পাঞ্জাবিদের মতে কোনো অজ্ঞাত কারণে, আর সমগ্র পৃথিবী জানে অবশ্যম্ভাবীরূপে, পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তার আশানুরূপভাবে হয় নি। বরং তাদের ঘটেছে চরম পরাজয়; কিন্তু অজানা কারণে ভারত তখন পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে নি। হয়তো অহেতুক রক্তপাতের প্রয়োজন ছিল না। যুদ্ধবাজ আইয়ুবের নাক থেকে যথেষ্ট রক্ত পাঞ্জাবে ঝরেছে এবং ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি লাহোরের দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে থামে নি।

এসব তিক্ত কথার মধ্যে না গিয়ে ইরশাদ যে সমস্যাটির প্রতি ইঙ্গিত করলেন তা হলো এই যে, যুদ্ধশেষে শেখ মুজিব প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে আকাশ ফাটাতে শুরু করলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। তাহলে আমরা বাঙালিরা কেন এই সামরিক বাহিনীর খরচ যোগাব? অতএব, ছয় দফার এক দফা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে পূর্ব পাকিস্তানি মিলিশিয়ার ওপর। আরও ইঙ্গিত, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার পশ্চিম পাকিস্তানিরাই বহন করবে, পূর্ব পাকিস্তানিরা নয়।

অতএব, আওয়ামী লীগ অর্থাৎ বাঙালিরা যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে তবে তাদের একটি প্রধান কাজই হবে পাকিস্তানের অর্থাৎ পাঞ্জাবি সামরিক বাহিনীকে কাটছাঁট করে সাইজমতো করে দেয়া। এর অর্থ হলো কাশ্মির সমস্যা চিরদিনের জন্য সিকেয় তোলা। তারপর আছে আওয়ামী লীগের ছয় দফা। ছয় দফা তো প্রায় স্বাধীনতার সমান দাবি। পাকিস্তান (অর্থাৎ পাঞ্জাবি) তো পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দিতে পারে না। হ্যাঁ, এক ব্যক্তি এক ভোট। কিন্তু তাই

বলে পাকিস্তানের হাত থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়া (অর্থাৎ পাঞ্জাবের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া)?

এটা তো পাঞ্জাবের জনগণ মেনে নেবে না। অর্থাৎ পাঞ্জাবের সামরিক বাহিনী, পাঞ্জাবের আমলাতন্ত্র যারা পাঞ্জাবের সামন্ত প্রভুদের সন্তান, তারা তো মেনে নেবে না। নানাভাবে নানা ভাষায় এ কথাগুলো বললেন ইরশাদ। আমি চুপ করে থাকলাম। হঠাৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইরশাদ ঘড়ি দেখে বললেন, 'দুটো বেজে গেছে। চল যাওয়া যাক।'

যে কথাটা আমি খুব পরিষ্কারভাবে জানতাম, সেটা আজকে আরও ভালোভাবে শুনলাম, যে-কোনো অবস্থায় কাশ্মির সমস্যার সমাধান হওয়ার পূর্বে পাঞ্জাবিরা বাঙালির কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দেবে না—নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন। তবে ইরশাদ যদিও বলেন নি, আমরা এটাও জানতাম যে, কাশ্মির সমস্যার সমাধান হওয়ার পরও পাঞ্জাব তার সামরিক শক্তির জোরে রাষ্ট্রক্ষমতা বাঙালি কেন পাকিস্তানি অন্য কোনো জাতির কাছেও ছেড়ে দেবে না। অনেকে বিশ্বাস করতেন এবং এখনও করেন যে, ঠিক এই কারণে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র কেবল দু'ভাগে নয়, কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে হয়তো। ঠিক এই কারণে পাকিস্তানে গণতন্ত্র কখনও শিকড় গাড়তে পারবে না।

বর্তমান পাকিস্তান, তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানে, গণতন্ত্র শেকড় না গাড়ার আরও একটি প্রধান কারণ, যেমন পূর্বে আভাস দিয়েছি, সেখানে চার চারটি প্রদেশেই সামন্ততন্ত্র। এই সামন্ততন্ত্র স্বভাবগতভাবে গণবিরোধী। সহায়হীন প্রজার এক ভোট, আর সর্বক্ষমতার অধিকারী সামন্ত প্রভুরও একটি মাত্র ভোট, এটা অভাবনীয়।

আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ বাদ দিলে বাকি পাকিস্তানের ৫৭% লোক পাঞ্জাবি। আর সামন্ত শ্রেণীর আশীর্বাদপুষ্ট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শতকরা নব্বই ভাগ পাঞ্জাবি। এদিকে সেনাবাহিনীর সিনিয়র অধিনায়কগণের প্রায় ৮০ ভাগ এই সামন্ত শ্রেণীর সন্তান। সিভিল প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তাদেরও প্রায় ৮০ শতাংশ সামন্ত পরিবার থেকে আগত। অতএব সিন্ধু, বেলুচ ও পাঠান প্রদেশের পক্ষে পাঞ্জাবি প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন একেবারে অসম্ভব। গণতন্ত্রের তো প্রশ্নই ওঠে না।

এদিকে বাস্তব পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, ১৯৭০ সালের নভেম্বরে গোটা বাঙালি জাতি এক হয়ে একটি অতি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করেছে যে, তারা পাকিস্তানে তাদের ন্যায্য অধিকার চায়। এতোদিন এই চাওয়াটা ছিল অনেকটা অনুমানের ব্যাপার। এবার সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই বাস্তবতা।

অতএব, আমরা যারা জানতাম যে পাঞ্জাবি কোনো অবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা

বাঙালির হাতে তুলে দেবে না, আমরা উদ্বিগ্ন হলাম, প্রমাদ গুণলাম।

এ বিষয়টি নিয়ে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের পর জেনারেল ইরশাদ ও আমার মধ্যে প্রায়শ আলোচনা হতো। মনে হতো তিনিও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে আমি যে কথাটা ইরশাদকে বলি নি, বলতে পারি নি, কিন্তু সবসময় মনে খেলা করতো, তা হলো ভুট্টোর ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ।

লারকানা ষড়যন্ত্র

অন্য সবার মতো আমিও মোটামুটি জানতাম যে, শেখ মুজিব ছয় দফা নিয়ে বাঙালির গণরায় চেয়েছেন এবং বাঙালি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে এবং এককভাবে হ্যাঁ বলেছে অর্থাৎ এগিয়ে যাও বলেছে। অতএব, মুজিবের পক্ষে ছয় দফার মূল অবস্থান থেকে সরে আসার উপায় নেই। নিতান্ত প্রান্তিকভাবে কিছু কাটছাঁট হয়তো সম্ভব ছিল, তবে সেটাও ছিল কঠিন। কিন্তু গোটা পশ্চিম পাকিস্তান এবং বিশেষ করে সামরিক জান্তা এ কথাটা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতো না। তাদের ধারণা ছিল চাপ দিলে মুজিব ছয় দফা থেকে মৌলিকভাবেই সরে আসতে বাধ্য হবে। অথবা সংঘাত অনিবার্য।

এই সম্ভাব্য সংঘাত থেকে দেশকে বাঁচাবার চাবিকাঠি ছিল একমাত্র ভুট্টোর হাতে। ভুট্টোর রাজনৈতিক দল পিপিপি পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সেই সুবাদে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। ভুট্টো যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক হতেন এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা শেখ মুজিবের সাথে এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে প্রয়াস পেতেন, তবে পাঞ্জাবি সামরিক জান্তার পক্ষেও সে সমাধান মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না। শেখ সাহেবও হয়তো কোনো প্রান্তিক ছাড় ইত্যাদি দিয়ে দেশ ও গণতন্ত্র দুটো বাঁচিয়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হতে পারতেন; কিন্তু ভবিতব্য তা চায় নি। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ভুট্টো ছিলেন যেমনি বিবেকবিহীন হীন-চরিত্রের ব্যক্তি অর্থাৎ অমানব, তেমনি ছিলেন উচ্চাভিলাষ-তাড়িত স্বার্থান্ধ মনের অধিকারী। পরবর্তী সময়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের (এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার) জন্য দেশ ও দেশবাসীর ধ্বংস ডেকে আনা তাঁর কাছে ছিল নিতান্তই ছেলেখেলা। অপরদিকে তিনি ছিলেন ক্ষুরধার মেধাশক্তির অধিকারী। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় সর্বদাই ধ্বংস ডেকে আনে।

অতএব, প্রতিদিন মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করতাম ভুট্টোর রাজনৈতিক

পদক্ষেপ। খবর শুনলাম, তিনি দাওয়াত করেছেন সামরিক প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লারকানা জেলায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে পাখি শিকার করার জন্য। গোটা দেশবাসীর মধ্যে ঔৎসুক্য, কী ব্যাপার? দু'একদিন মেহমানদারির পর ইয়াহিয়াকে বিদায় দিলেন ভুট্টো।

তখন ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস। এদিকে গোটা জাতি নতুন রাজনৈতিক ঘটনাবলির অগ্রগতি লক্ষ্য করছে, প্রতীক্ষা করছে কবে সংবিধান রচনার কাজ শুরু হবে এবং কার কার দ্বারা নতুন সরকার গঠিত হবে ইত্যাদি।

ইতোপূর্বে ইয়াহিয়া খান দু'একবার ঢাকা গিয়েছেন রাষ্ট্রীয় সফরে। সেখানে তিনি শেখ মুজিবের সাথে প্রকাশ্যে এমন আচরণ করেছেন, যেন শেখ সাহেবই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। শেষ সফরে তিনি খোলাখুলি বলেই দিয়েছিলেন যে, শেখই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু লারকানায় শিকার সফরের পরে দেখা গেল ইয়াহিয়ার কণ্ঠে কিছুটা ভিন্ন সুর। তিনি নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংবিধান রচনার বৈঠক পিছিয়ে দিলেন একাধিকবার। মনে হলো ভুট্টোর সাথে তাঁর আঁতাত হয়ে গেছে।

পরে জেনেছি যে, লারকানায় শিকার পর্বে 'লারকানা ষড়যন্ত্র' নামে কুখ্যাত এই চক্রান্তে ভুট্টো ইয়াহিয়াকে সফলভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বাঙালির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করলে পাকিস্তান থাকবে না। ভুট্টো এও বোঝালেন যে, যদিও ভুট্টো নিজে একজন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনীতিক, তবুও তাঁর পক্ষে দেশের এতোবড় ক্ষতি হতে দেয়ার চেয়ে সামরিক শাসনই অনেক ভালো ও গ্রহণযোগ্য। অতএব, ভুট্টো ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনকে সমর্থন দেবেন, মুজিবকে নয়। মুজিব এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। তাতে কী? পশ্চিম পাকিস্তানে তো মুজিব একটি আসনও পান নি। পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা ভুট্টো। বিশেষ করে, গুরুত্বপূর্ণ দু'প্রদেশেই (ভুট্টো পাঞ্জাবকে অভিহিত করতেন 'পাকিস্তানের তরবারি-ধরা হাত')। অতএব, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ তাঁর কথাতেই উঠবে-বসবে এবং সামরিক শাসন মেনে নেবে। বলাবাহুল্য যে, এই কথাগুলো ইয়াহিয়াকে বোঝাবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিজেই চাচ্ছিলেন যেভাবে হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত এই দুই নেতাকে আলাদা করা। ভুট্টো যদি ইয়াহিয়ার পক্ষে থাকেন তবে মুজিব পাকিস্তানের নতুন সংবিধান রচনায় হয় পাঞ্জাব তথা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্তমান প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখবেন, নয় তো দেশদ্রোহী হিসেবে বন্দুকের নলের সম্মুখীন হবেন। হ্যাঁ, হতে পারে বাঙালিরা মুজিবের আদেশে আন্দোলনে নামবে। কিন্তু কঠোরভাবে রক্তপাতের মাধ্যমে তা দমন করলে বাঙালি এবার কেন আগামী দু'তিন প্রজন্ম পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

রাষ্ট্রক্ষমতার স্বাদ সিংহশাবকের রক্তের স্বাদ পাওয়ার মতো। ক্ষমতা

একবার হাতে এলে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে এরূপ উদাহরণ বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। ইয়াহিয়ার এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। ব্যতিক্রম এবারও হলো না। তিনি সানন্দে রাজি হলেন।

কিন্তু বিবেকবিহীন ধূর্ত ভুট্টোর আসল পরিকল্পনা তা ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতা সামরিক সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখার জন্য তিনি একটি সুষ্ঠু নির্বাচনে এতো বড় বিজয় লাভ করেন নি। বিজয়টি কেবল বৃহৎই নয়, বিজয়টি পাকিস্তানের তরবারিবাহী বাহু পাঞ্জাবেও। পাঞ্জাবই পাকিস্তানের শক্তির উৎস। এ সুযোগ মানুষের জীবনে বারবার আসে না। তাঁর কাছে সুযোগ এসেছে পাঞ্জাব, তথা পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে এবং ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে আজীবন সেই ক্ষমতা উপভোগ করতে।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান তো এটা মানবে না। অতএব, পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে চিরতরে বিদায় করে দিতে হবে। পাকিস্তানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের পাট রফতানির আয় দ্বারা অর্জিত দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে তো পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প-কারখানা ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের কোরীয় যুদ্ধে বর্ধিত মূল্যের পাটের দ্বারা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাতে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গঠন কাজ অর্ধেকের বেশি হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান এখন পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপণ্যের বন্দি বাজার বৈ তো আর কিছু নয়। তদুপরি বিশ্বে পাটের বাজারে সৃষ্ট মন্দা ইঙ্গিত করছে পাটের ভবিষ্যৎও শেষ হয়ে আসছে। এদিকে রাজনৈতিক বিবেচনায় পূর্ব পাকিস্তান সবসময় একটি তিক্ততা সৃষ্টিকারী সমস্যাসঙ্কুল স্থান হিসেবে পাঞ্জাবের বুকের পাশে কাঁটার মতোই কাজ করবে। অতএব, একে বিদায় দেয়াই সর্বোত্তম। আর সেই সুযোগও এবার সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে 'স্থূল বুদ্ধি' সেনাপতি-শাসকরা ভেতরের ব্যাপার কিছু বুঝতে পারবে না। অস্ত্র হাতে থাকলে যুক্তি ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি বিশেষ কাজ করে না। এঁরা বুঝবেন না যে, যে অঞ্চলের (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের) মানুষ একবার জেগে উঠেছে, একক নেতৃত্বে সংগঠিতভাবে পরিকল্পনামাফিক নিখুঁতভাবে ভোট প্রয়োগ করে নিজেদের জন্য এমন মজবুত ক্ষমতার অবস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে, সেই জনগণকে কেউ দীর্ঘদিনের জন্য দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

ভুট্টো জানতেন যে, সামরিক বাহিনী শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জাগ্রত জনগণকে দাবিয়ে দেয়ার ঠিক এই পথটি বেছে নেবে। কারণ অস্ত্রশক্তির ওপর তাদের প্রচণ্ড আস্থা। জনগণের সংহতি গোলার সামনে টিকতে পারবে না। অতএব, সমস্যা যাই হোক, সামরিক কিংবা রাজনৈতিক, গোলাই একমাত্র মহৌষধ।

ধূর্ত ভুট্টো বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পাকিস্তানের জেনারেলদের সাথে মেলামেশা ও ষড়যন্ত্র করে এসেছে। অতএব, এঁদের সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন ছিল অনেকটাই সঠিক।

পলায়ন প্রচেষ্টা

সপ্তাহান্তে প্রায় প্রতি শনিবারে যেতাম রাওয়ালপিণ্ডি, নতুন খবর শুনতে। ঢাকা থেকে যদি কেউ সেই সপ্তাহে এসে থাকে, তার কাছে ছুটে যাই। দু'চারজন পাকিস্তানি বন্ধু-বান্ধব ছিলেন তাঁদের কাছেও যাই গল্প করতে—যদি ঢাকার কোনো খবর পাওয়া যায়। ইসলামাবাদে যে সিভিলিয়ান বাঙালি অফিসাররা ছিলেন তাঁদের কাছেও অনেক খবর পাওয়া যেত। অতএব, রোববার ঢাকা তথা পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে অনেকটা হাল নাগাদ খবর নিয়ে মংলা ফিরতাম।

খবর পেলাম শেখ সাহেব ও ড. কামাল হোসেন ব্যতীত প্রায় সব আওয়ামী লীগ নেতা ভারতে চলে গিয়েছেন এবং সেখানে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। অবশেষে ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের সীমান্তে আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হলো। এদিকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআরের সৈনিকরা শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যেতে বাধ্য হয়েছে। মেহেরপুরে গঠিত নতুন বাংলাদেশ সরকারে (পরে মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিত) কর্নেল ওসমানী এম.পি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন।

এদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু পিছু ধাওয়া করার সময় যাত্রাপথের সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। গ্রামে যাঁকে সামনে পাচ্ছে তাঁকেই হত্যা করছে। সেই সঙ্গে নারী ধর্ষণ, লুটপাট তো চলছেই। এর ফলে নিতান্ত প্রাণ বাঁচানোর জন্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ নর-নারী উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে পৌঁছাতে লাগল। অতএব, অতি শিগগির ভারতও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহায়তা দেয়া এবং উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেয়ার কাজ সরকারিভাবে নিতে বাধ্য হলো।

ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শুরু হলো এবং নিয়মিত সৈনিক ও ইপিআর সৈনিকদের রেজিমেন্টে ভাগ করে পুনর্গঠিত করে বিভিন্ন সেক্টরে বিন্যস্ত করা হলো। এসব খবর আমরা পিণ্ডিতে পেতাম ও পরিষ্কারভাবে বুঝতাম যে, ঠিক এই সময়টিতে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের প্রয়োজন পাকিস্তান প্রবাসী আমাদের মতো বাঙালি অফিসারদের, বিশেষ করে সিনিয়র অফিসারদের। অতএব,

আমরাও পথ খুঁজতে লাগলাম কি করে পালিয়ে গিয়ে দেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়া যায়। জানতাম যে-কোনো দিক দিয়েই হোক একবার পাকিস্তান সীমান্ত পার হলে তো আর বাধা নেই। তবে একটি রাস্তা ছিল পুরোপুরি বন্ধ। সে হলো বিমানযাত্রা। বাঙালি সামরিক অফিসারকে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বিমানে পাকিস্তানের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিতো না। কিছুদিন পর আমাদের পাসপোর্টও আটক করা হলো।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। শুনলাম লেফটেন্যান্ট জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন তাঁর কর্মস্থল মুলতানের 'কোর' (Corps) কমান্ড থেকে দু'একদিনের জন্য পিণ্ডি এসেছেন। শুনেই ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি রাওয়ালপিণ্ডি অর্ডন্যান্স অফিসার্স মেসে থাকতেন। সাদরে তিনি বসতে দিলেন। কথাবার্তা শুরু হলো কিন্তু প্রাত্যহিক মামুলি আলাপ ছাড়া আমাদের মনের কথা কেউই খুলে বলতে পারছিলাম না। কি জানি, মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে কার মনের কী ভাব, কী চিন্তাধারা? হঠাৎ আমার মনে পড়লো ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি জেনারেল ওয়াসি তাঁর বাঙালি ব্যক্তিগত সহকারীকে নিজের উদ্যোগে পাঠিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে খবর দিয়ে যে, ১০ ফেব্রুয়ারির কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, দেশের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা শেখ মুজিবের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র হামলা দ্বারা উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা হবে। 'মার্শাল ল' অব্যাহত থাকবে। শিগগিরই পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো শুরু হবে। সামরিক জান্তার প্রত্যাশা ছিল সামরিক শক্তি বৃদ্ধি মার্চ মাসের মাঝামাঝি শেষ হবে এবং তখনই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর সামরিক আঘাত হানা হবে।

এখানে বলে রাখা দরকার, শেখ সাহেব ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা জানতেন এ খবর; কিন্তু তাঁদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত সামরিক জান্তা আলোচনা করতে চায় ততক্ষণ আলোচনা করতে হবে। তবে মার্চের মাঝামাঝি এই শক্তি বৃদ্ধির কার্যক্রম সমাপ্ত হয় নি বলেই ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চের পরবর্তী সময়ে আলোচনার প্রহসন চালিয়ে গিয়েছেন। ২৫ মার্চ প্রস্তুতি শেষ এবং সেই রাতেই ঘটে চরম আঘাত।

বঙ্গবন্ধুর সমালোচকরা বলে থাকেন, তিনি যদি মার্চ মাসের প্রথমেই স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন তবে এতো হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ ঘটতো না। এই সমালোচনার উত্তর দীর্ঘ এবং তা বর্তমান রচনার আওতায় পড়ে না। তবে একটি কথা বললে সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি ঘটবে। নেহায়েত আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কোনো প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশই মেনে নিতে পারে না; কারণ বহু দেশে তাদের অংশবিশেষের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সমস্যা আছে। তাছাড়া এর পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোও সহজ নয়।

সর্বোপরি, অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ও লজ্জার ব্যাপার হলেও এ কথাটি আজ স্বীকার করতেই হবে যে, '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে যিনি নিজে কিংবা তাঁর পরিবারবর্গ বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এমন মুসলমান এখনও এ দেশে আছেন যিনি পূর্বেকার পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যদি ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হতো তবে এ দেশের বহু বাঙালি মুসলিম পাকিস্তান ভাঙার জন্য ভুট্টোকে নয়, ইয়াহিয়াকে নয়, মুজিবকেই দায়ী করে আহাজারি করতো। যাক, একথাটাও এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ রেখে বরং আমার পলায়ন প্রসঙ্গে আসা যাক। জেনারেল ওসমানীর মাধ্যমে শেখ সাহেবের কাছে জেনারেল ওয়াসির বার্তা পাঠানোর কথা তাঁর একান্ত সহকারী সুবেদার সাহেবের কাছে শুনেছি। অতএব, আমিই সাহস করে কথাটা পাড়লাম এবং বললাম যে এখন আমাদেরও তো কিছু করা উচিত।

কথাটা বলে ফেলে বুঝতে পারলাম জেনারেল ওয়াসিও উসখুস করছিলেন আমাকে কিছু বলার জন্য। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা এমন ছিল যে, এসব কথা বাঙালি হয়েও হঠাৎ একজন আরেকজনকে চট করে বলতে পারতো না।

অত্যন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে ওয়াসি কথাটা শুনলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'কি করা যায়?' আমি একটি পরিকল্পনা চিন্তা করে এসেছিলাম। ওয়াসি ছিলেন 'কোর' অধিনায়ক। প্রত্যেক কোরেই একটি করে ক্ষুদ্র বিমানের ইউনিট থাকে। এই বিমানগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে নিচু দিয়ে উড়ে দীর্ঘপাল্লার কামানের গোলা কোথায় পড়লো দেখে এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া 'কোর' অধিনায়কের জন্য একটি বিশেষ বিমান থাকে, যাতে তিনি যখন ইচ্ছে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন, প্রস্তাবিত আক্রমণ কীরকম ভূমির ওপরে কীভাবে হতে পারে ইত্যাদি পর্যবেক্ষণে যেতে পারেন।

জেনারেল ওয়াসির অধীনে যে বিমান স্থাপনাটি ছিল তার অধিনায়কও বাঙালি, মেজর (পরে মেজর জেনারেল) লতিফ। এদিকে মুলতান ভারত সীমান্ত থেকে খুব বেশি দূরত্বে নয়। অতএব, ঐ বিমানে ওয়াসি, আমার আর লতিফের পরিবার ঠাসাঠাসি করে হলেও উঠে সোজা পূর্ব দিকে গিয়ে সীমান্ত পার হতে পারবে।

ওয়াসি অনেকক্ষণ ধরে পরিকল্পনাটি মনে মনে ওলটপালট করে পরীক্ষা করে নিলেন। অবশেষে বললেন, 'উত্তম। বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা।' ওয়াসি ছিলেন অল্পকথার মানুষ। 'আমি কাল-পরশু মুলতান ফিরে যাচ্ছি। এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা যাবে। তার দু'দিন পূর্বে তোমাকে জানাবো। তুমি পরিবারসহ মুলতান চলে আসবে।'

সব ঠিকঠাক করে আমি বিদায় নিলাম। মনটা প্রফুল্ল হওয়ার কথা, তাই হলো। বুক থেকে কেমন একটা অপরাধবোধজনিত বোঝা নেমে গেল; কিন্তু কি

আশ্চর্য। অন্যদিকে বুকটায় যেন কিছুটা দুরু দুরু ভাবও অনুভূত হতে লাগলো। এমনটা হবে ভাবি নি। তবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মনের গভীরে প্রবেশ করে বোধগম্য হলো, পরিকল্পনাটিতে যে ঝুঁকি ছিল, ব্যর্থতা অর্থাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার ভীতিটা, একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগে পরিণত হয়ে মনের প্রত্যাশা পূরণের প্রফুল্লতাকে অনেকটা কাবু করে ফেলতে পারলো। মংলায় ফিরে এসে এই প্রফুল্লতা-উদ্বেগ মেশানো অনুভূতিতে দিন কাটতে লাগল। পরিবারের কাউকে কিছু বললাম না। তবে মনে মনে, কি কি সঙ্গে নেব সব গুছিয়ে ফেললাম। বাস্তবে গোছাতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগবে না হয়তো। মোটামুটি তৈরি হয়ে বসে আছি। আর জেনারেল ওয়াসির টেলিফোনের অপেক্ষা করছি; কিন্তু টেলিফোন আসে না। প্রায় দিন দশেক হয়ে গেল। ভাবছি আমিই টেলিফোন করব কিনা।

এমন সময় একদিন জেনারেল ইরশাদ আমাকে বললেন, 'শুনেছ তো, জেনারেল ওয়াসি সেনাসদরে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে আসছেন। হয়তো এসেই গিয়েছেন।' ইরশাদ ভাবলেন, একটা ভালো খবর আমাকে দিলেন।

ওয়াসি মুলতানে ফিরে গিয়ে দু'একদিনের মধ্যে আদেশ পেলেন তাঁকে পিণ্ডি সেনাসদরে বদলি করা হয়েছে। এর ফলে আর যাই হোক, আমাদের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি যেন চুপসে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম আমার বদলিরও দেরি নেই। পাকিস্তান প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন, যা আমার ওপরে ছিল, কোনো বাঙালিকে সেই গুরুতর দায়িত্বে বহাল রাখবে না ওরা।

এর মাসখানেক পরে আমারও বদলির পালা। আমি মংলায় এসেছিলাম বছরখানেকের জন্য। 'কোর' সদরে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি আমার পেশাগত কর্তব্যের অংশবিশেষ। অতএব, জুন/জুলাইয়ের দিকে আমাকে বদলি করা হলো সেনাসদর পিণ্ডিতে। পেশাগত দিক দিয়ে পদটি একজন ব্রিগেডিয়ারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত খুশির কারণ হতে পারে। কিন্তু দেশে যখন যুদ্ধাবস্থা তখন এই অফিসটির গুরুত্ব ততোটা নয়। অতএব, একজন বাঙালি অফিসারকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে নিষ্কর্মা ও দায়িত্বহীন রাখার জন্য পদটি ছিল অত্যন্ত উপযুক্ত।

রাওয়ালপিণ্ডি গেলাম, একটা ভালো বাড়ি দেয়া হলো। জীবন আরামের। পাঞ্জাবি সহকর্মীরা ঈর্ষান্বিত। কারণ আমার নতুন অফিসের পূর্বসূরিরা সবাই পরবর্তী জীবনে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদে আসীন হয়েছেন। অতএব, এই অফিসের ঐ পদটির জন্য অনেকে নানাভাবে চেষ্টা করতেন। তাঁরা সবাই ধরে নিলেন আমার ভবিষ্যৎও অতি উজ্জ্বল।

কিন্তু আমার মনের অবস্থা ভিন্ন। জেনারেল ওয়াসির সাথে সীমান্ত অতিক্রম করার পরিকল্পনা তো ভেস্তে গেল। পিণ্ডিতে এসে ভাবতে লাগলাম, সীমান্ত-নিকটবর্তী আমাদের আরও একজন বাঙালি অফিসার আছেন। তিনি করাচিতে

অবস্থিত সপ্তম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক। তাঁর দায়িত্ব সিন্ধু-রাজস্থানের সীমান্তের এক অংশের প্রতিরক্ষা। অতএব, সীমান্ত পরিদর্শনে যাওয়ায় তাঁর কোনো বাধা নেই। স্থির করলাম তাঁর সাথে আলাপ করতে হবে।

যদিও আমার পাকিস্তানের বাইরে যাওয়ার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল; কিন্তু তখনও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আমার যাতায়াতের ওপর কোনো বাধা আরোপ করা হয় নি। একটি পরিদর্শন কার্যক্রম অনুমোদন করালাম—করাচির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখবো।

যথাসময় উপস্থিত হলাম করাচিতে। ঐদিন সন্ধ্যায় গেলাম মালীর সেনানিবাসে সপ্তম বেঙ্গল সদর দফতরে, লে. কর্নেল এরশাদের (পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) বাসায়। আমরা অতি ঘনিষ্ঠ বলে পরস্পরের চিন্তাধারাও জানতাম। অতএব, সময়ক্ষেপণ না করে আলোচনা শুরু হলো। আমি, এরশাদ ও এরশাদের স্ত্রী তিনজনে আলোচনা করছি কীভাবে সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়া যায়। ম্যাপ খুলে বসলাম—এরশাদের সপ্তম বেঙ্গলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সীমান্ত এবং করাচি থেকে সেখানে জিপে করে যাওয়ার রাস্তা ও পথের দূরত্ব সবকিছু আলোচনায় এলো; কিন্তু সন্তোষজনক কোনো ফলাফল বেরুলো না। করাচি থেকে সীমান্তের দূরত্ব, যেদিক দিয়ে গণনা করা যাক না কেন, পাঁচশ' মাইলের কম নয়। রাস্তার বেশির ভাগ অংশই পাকা নয়।

এই রাস্তায় সারারাত বিরামহীনভাবে গাড়ি চালালেও সকালের আগে গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। অথচ আমাদের সীমান্ত অতিক্রম এক রাতের মধ্যে করতেই হবে। কারণ পরদিন সাতসকালে সবাই জানতে পারবে যে, আমরা পালিয়েছি। অতএব, অত্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে রাতের খাওয়া সেরে বিদায় নিলাম এরশাদ দম্পতির বাসা থেকে। পরদিন ফিরে এলাম রাওয়ালপিণ্ডিতে।

রীতিমতো অফিসে যাই; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ নেই। তখন স্বভাবতই পাকিস্তান সেনাসদরের মনোযোগ ও ব্যস্ততা নিবদ্ধ পূর্ব পাকিস্তান ঘিরে। যে দু'একটা কাজের আদেশ এসেছে তা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কিত। ভারতের সাথে যুদ্ধ হলে ভারতের জন্য কোন্ অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হওয়া বেশি সুবিধাজনক সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ। বলাবাহুল্য, এই কাজের জন্য আমার দিক দিয়ে মনোযোগ দেয়ার মতো কর্তব্যবোধ আমি অনুভব করতাম না। অতএব, কাজটি আমার সহকারী পাঞ্জাবি কর্নেলের ওপর ন্যস্ত করে দিলাম। বিশেষ খোঁজখবরও নিতাম না হেতু ধীরগতিতে চলছিল কাজ।

এদিকে একমাত্র ভাবনা কীভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করা যায়। ইসলামাবাদের বেসামরিক অফিসার ও বন্ধুবান্ধব সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি। ইশারা-ইঙ্গিতে বলি যে, যদি কোনো পথ পাওয়া যায় তবে

যেন দয়া করে আমার জন্যও বন্দোবস্ত করেন। একদিন পাকিস্তান সরকারের যুগ্ম-সচিব আবদুর রশীদ কানে কানে বললেন যে, তিনি একটি যোগসূত্র হয়তো বের করতে পারবেন। আমি যেন তৈরি হয়ে থাকি। তিনি জামালপুর জেলার লোক, আমার বাড়ির কাছের, বিশেষ অন্তরঙ্গ। তিনি ধার্মিক মানুষ, নিয়মিত ইসলামাবাদের মসজিদে নামাজ পড়তে যান। সেখানকার ইমাম সাহেব 'গায়ের এলাকা' অর্থাৎ সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তানের সংলগ্ন এলাকার অধিবাসী, যেখানকার পাঠানরা বাহ্যত পাকিস্তানের অংশ, কিন্তু কার্যত স্বাধীন।

রশীদ সাহেব তাঁকে বোঝালেন যে, পাঠানরা যেমন নিজেদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করে থাকেন, তেমনি বাঙালিরাও পাঞ্জাবিদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়ার জন্য রশীদ সাহেবের দু'চারজন বন্ধু বাঙাল মুলুক যেতে চান। সরকার তো ওঁদেরকে যেতে দেবে না, অতএব গোপনে তাঁদেরকে আফগানিস্তানের সীমান্ত পার করিয়ে দিতে হবে। এর জন্য যাবতীয় খরচপত্র তাঁরাই বহন করবেন। ইমাম সাহেব যদি তাঁদের সাহায্য করেন তবে অত্যন্ত উপকার হবে। ইমাম সাহেব, বাঙালিদের বিশেষ করে রশীদ সাহেবকে পছন্দ করতেন। তিনি সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন। তবে বন্দোবস্ত করতে কয়েকদিন সময় লাগবে। ইমাম সাহেবের বাড়ি খাইবার পাসে এবং আফগান সীমান্তের কাছাকাছি। অতএব, পেশাওয়ার-কাবুল সীমান্তের চেকপোস্টের কাছ দিয়ে পার হতে হবে। তবে ভয়ের কিছু নেই। সাহায্যকারীরা ইমাম সাহেবের বিশ্বস্ত লোক।

তখন আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। সপ্তাহখানেক পরে রশীদ সাহেব এসে বললেন, সব তৈরি, তবে ডেপুটি সেক্রেটারি ড. সাত্তার ও তাঁর ভাই ক্যাপ্টেন দেলওয়ার অনেক কাকুতি-মিনতি করায় তাঁদেরকে তিনি কথা দিয়ে ফেলেছেন যে তাঁরা দু'জনই প্রথমে যাবেন। অতএব, ঠিক হয়েছে তাঁরা যাবেন আগস্টের শেষের দিকে এবং ওখানে পৌঁছে খবর পাঠাবেন। সেই খবর পেয়ে আমি পরিবারসহ আমার গাড়িতে করে পেশাওয়ার পৌঁছাবো। তারপর সমস্ত ব্যবস্থা ওদের। ঠিক হলো সাত্তার সাহেবরা নিরাপদে সীমান্ত পার হওয়ার পর খবর পাঠাবেন। খবর হবে এইরকম, 'মেহমান মঙ্গলমতো পৌঁছেছে, জলিল।' চিঠিখানা লেখা হবে বাংলায়।

অতএব, আবারো সেই আগের মতো অনুভূতি, মুক্তির প্রত্যাশায় উৎফুল্লতা, সেই সঙ্গে বুকে দুরুদুরু ভাব।

একদিন বাসার বারান্দায় বসে আছি, এমন সময় একটি চিঠি দিয়ে গেল ডাকপিয়ন। চিঠিখানা বিলেত থেকে আসা। চিঠি পড়ে অবাক হলাম— সেই বহু পরিচিত হাতের লেখা, কর্নেল ওসমানীর। গোটা গোটা অত্যন্ত সুন্দর হাতের

লেখা, 'খলিল, আমরা ২৪ সেপ্টেম্বর কুসুমের বিয়ে ঠিক করেছি। এ বিয়েতে তোমাকে আসতেই হবে—যেভাবে পারো। তোমাদের চাচা।' ওসমানীকে আমরা 'চাচা ওসমানী' বলে একে অপরের কাছে পরিচয় দিতাম। ওসমানীও কথাটি জানতেন। চিঠিটা প্রথমে বিলেতে কারো কাছে পাঠানো হয়েছিল। ঐ বিলেতি ভদ্রলোক পরে নতুন লেফাফায় চিঠিখানা আমাকে পাঠিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, চিঠিখানা একটি অবর্ণনীয় অনুভূতির উদ্রেক করলো। মনে হলো, 'আহা যদি শামিল হতে পারি।' যদিও তখন পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের সেন্সরশিপ ব্যবস্থা অতীব কঠোর ছিল তথাপি লিখলাম, 'চাচা সাহেব, আমাদের প্রিয় কুসুমের বিয়েতে আসার উদ্‌গ্রীবতা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। ভাগ্য ভালো থাকলে হয়তো হাজির হতে পারি।' চিঠিখানা পাঠালাম আমার এক চাচাত ভাইয়ের ঠিকানায়। নিচে দিলাম একটি নাম যে নামে আমাদের রেজিমেন্টের সব অফিসারই আমার স্ত্রীকে কৌতুক করে ডাকতো। যদিও কর্নেল ওসমানী আমার হাতের লেখার সাথে পরিচিত, তবুও ঐ ছদ্মনাম দেখে আরও নিশ্চিত হবেন। চিঠিখানা শহরের রাস্তার পাশে একটা ডাকবাক্সে ফেলে এলাম। সেই সাথে আমার সেই চাচাত ভাইকে আরও একটা চিঠিতে সঙ্কেতে জানালাম ওসমানীর চিঠি তাঁর কাছে কীভাবে পৌঁছাতে হবে।

এদিকে ড. সাত্তার সাহেবদের পৌঁছানোর সংবাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি। কথা ছিল ওঁরা যাওয়ার পরদিন রাতের মধ্যে খবর পাঠাবেন, লোক মারফত হাতে হাতে। পরদিন, তার পরদিন, তাও নয়, তিনদিন হয়ে গেল খবর নেই। রোজ দু'বার করে রশীদ সাহেবের কাছে খবর জিগ্যেস করি। পরের দিকে রশীদ সাহেবও কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

যতো দূর মনে পড়ে সেদিন ছিল ৩ সেপ্টেম্বর। তখনও গরম কাল, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল বলে বেশ শীত শীত। বেলা আড়াইটা নাগাদ হঠাৎ কোথা থেকে ক্যাপ্টেন তাহের (পরে মুক্তিযুদ্ধে আহত ও জাসদের সামরিক শাখা গণবাহিনীর সংগঠক কর্নেল তাহের, যাঁকে জিয়ার আমলে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়) ও ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন (পরে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল হিসেবে সর্বহারা পার্টিতে যোগদান), দু'জনেই এসে হাজির।

তাহেরের চোখেমুখে তাড়াহুড়ো ভাব। বেশি ভূমিকা না করে সোজাসুজি জানালেন তাঁর প্রস্তাব। তিনি পিণ্ডি থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে সীমান্ত প্রদেশের অ্যাবটাবাদ জেলায় নিয়োজিত। সেখান থেকে দশ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে এসেছেন। এসেই পিণ্ডির বন্ধু-বান্ধবের কাছে খবর নিয়ে বেড়াচ্ছেন, কীভাবে সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করা যায়। এভাবে তাঁর ছুটির তিন দিন কেটে গেছে। বাকি রয়েছে সাত দিন। এই সাত দিনের মধ্যে তাঁকে ভারত পাড়ি দিয়ে ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্তী শহর নেত্রকোনায় পৌঁছাতে

হবে। সেখান থেকে শিশুপুত্রসহ স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যেতে হবে। নতুবা দশ দিন পার হয়ে যাওয়ার পর তাঁর রেজিমেন্টে খবর রটে যাবে যে, তাহের পলাতক এবং নেত্রকোনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওঁৎ পেতে বসে থাকবে। অতএব, তাঁর হাতে সময় নেই, কিন্তু আজই তিনি ও ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন খবর পেয়েছেন যে, আগামীকাল আমি পরিবারসহ সীমান্ত পার হয়ে কাবুলে যাচ্ছি। অতএব তাহেরের একান্ত অনুরোধ যে, আগামীকাল তাহের যাবেন এবং আমি আরেকদিন পরেই যাবো।

আমি প্রস্তাবটি শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম এই ভেবে যে, এই অতি গোপনীয় পরিকল্পনাটি তাহের এবং জিয়াউদ্দিন জানলেন কী করে। প্রশ্ন করে সদুত্তর পেলাম না। ওরা প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন।

এদিকে আমি ভাবছি যে, জীবনে অনেক পরিস্থিতি দেখা দেয়, যেখানে উদারতার অবকাশ থাকে এবং উদারতা দেখিয়ে স্বার্থত্যাগ করা যায়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটি ছিল এমন যে, এখানে উদারতা নয়, স্বার্থপরতাই প্রয়োজন। অতএব, আমি সোজা বলে দিলাম যে তা সম্ভব নয়। আমি যাচ্ছি পরিবারসহ, আর ওঁরা দু'জনই পুরুষ এবং একলা। তাই স্বার্থত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। আমি আগামীকাল যাবো এবং ওরা দু'জন যাবে পরের দিন কিংবা তার পরের দিন।

এই কথা শুনে তাহেরের চোখে পানি এসে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমার হাতটা চেপে ধরে বসে থাকল। আমার মনটাও নরম হয়ে উঠল। আমি তাহেরের কথায় রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, 'তৈরি থাকো, আজই খবর আসবে। তোমরা কাল সকালে রওনা হবে।'

এতোক্ষণ তাহের ও জিয়াউদ্দিন অত্যন্ত উদ্গ্রীবতা নিয়ে আমাকে রাজি করাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু যেইমাত্র আমি রাজি হয়ে গেলাম, ওঁদের মনেও সেই মুক্তির প্রত্যাশা ও ঝুঁকির অনিশ্চয়তায় বুক দুরুদুরু ভাব শুরু হয়ে গেল।

আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে আমি ওঁদের মানসিক অবস্থা অনুভব করছিলাম। ওঁদের ওপর মায়াও হলো। ঘরে ছিল ব্র্যান্ডি। নানা কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য রেখে দেয়া। উঠে গিয়ে দুটো গ্লাসে সামান্য ব্র্যান্ডি ঢেলে নিয়ে ওঁদের খেতে দিলাম। বললাম, 'এক ঢোকে গিলে ফেল।' ওরা তাই করলো। মিনিটখানেক পরে দেখি ব্র্যান্ডি তার কাজ করেছে। দু'জনেই প্রফুল্ল। ওঁরা হাসতে লাগলো। বললো এখন তাঁরা জিয়ার আবাসস্থল ইঞ্জিনিয়ার্স অফিসার মেসে গিয়ে তৈরি হবেন। রাতে এসে আমার কাছ থেকে আগামীকালের যাত্রার ব্যবস্থাদি জেনে নেবেন।

ওরা দু'জনেই চলে গেলেন। তখন আনুমানিক বেলা চারটা। সন্ধে হতে

দেরি নেই। টেলিফোন করলাম রশীদ সাহেবকে ইসলামাবাদে। তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা ও অতিশয় উদ্বিগ্ন। বললেন, খবর এসেছে এবং আমাদের নির্ধারিত 'কোড' অনুযায়ীই। তবে বাংলায় নয়, ইংরেজিতে এবং টাইপ করা, তাও বড় অক্ষরে। 'গেস্টস্ এরাইভ্ড্ সেফ, জলিল।' রশীদ সাহেবের মতো আমিও বুঝলাম খবরটি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লেখা। অর্থাৎ প্রথম ঝাঁক পাখি খাঁচায়। দ্বিতীয় ঝাঁকের জন্য খাঁচা প্রস্তুত। আর কথা না বাড়িয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম। বুঝলাম ভাগ্য এবারও বিরূপ। শুধু ভাগ্য বিরূপ তাই নয়, এবার বিপদও আসন্ন। কারণ প্রথমত ড. সাত্তার ও ক্যাপ্টেন দেলওয়ার যে শুধু ধরা পড়েছেন তাই নয়, গোয়েন্দা বাহিনীর গুঁতো খেয়ে আমাদের 'কোড'সহ সব কথা এবং পরিকল্পনাকারীর পরিচয় ও এর পরে কারা যাবেন সেসবও বলে দিয়েছেন। তাই, খবরখানা লেফাফায় করে রশীদ সাহেবকে পাঠানো হয়েছে। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেলাম প্রাপ্য শাস্তির জন্য। বেচারা রশীদ সাহেবের জন্যই বেশি মায়া হলো। প্রবল এক অপরাধবোধ মনকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো। তিনি একটি উচ্চপদের চাকরি থেকে শেষ নাগাদ জেল খাটবেন, নেহায়েত আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে! আর বাঙালি কয়েদিদের ওপর পাকিস্তানের পুলিশি অত্যাচারের কথাও আমার অজানা ছিল না।

এইরূপ একান্ত ভারাক্রান্ত মনে অপেক্ষা করছি, রাতে তাহের ও জিয়া আসবেন আগামীকালের পরিকল্পনা শুনতে; কিন্তু ওঁরা এলেন না।

রাতে ভালো ঘুম হলো না। সকালবেলায় উঠে পত্রিকা হাতে নিয়ে দেখি প্রথম পৃষ্ঠায় বেশ বড় হেডলাইনে লেখা : 'গতকাল পাকিস্তান সরকারে কর্মরত একজন যুগ্ম সচিব (আসলে উপ-সচিব) ও সামরিক বাহিনীতে কর্মরত অফিসার তাঁর ভাই খাইবার গিরিপথের কাছ দিয়ে পালানোর সময় পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক ধৃত।' খবরে ড. সাত্তার ও ক্যাপ্টেন দেলওয়ারের নাম দেয়া হয়েছে। রশীদ সাহেবকে আর টেলিফোন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম না।

সকাল দশটা কি এগারোটা। শিয়ালকোট ব্রিগেড সদর দফতর থেকে টেলিফোন। আমার সাথে কথা বলবেন। টেলিফোন হাতে নিলাম। একজন মেজর পদবির অফিসার প্রশ্ন করলেন, 'ওই ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর আবুল মনযুর (পরে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীতে মেজর জেনারেল) কি আমার বাসায়? বললাম, 'না তো। কিন্তু কী হয়েছে তাঁর?' 'আজ সকাল থেকে তিনি তাঁর বাসায় নেই, তাঁর পরিবারও নেই। বাসা থেকে মনে হয় সবাই কোথাও গিয়েছেন। কিন্তু কাউকে কিছু না জানিয়ে। তাই আমরা ভাবলাম আপনি হয়তো জানেন কোথায় গেছেন।' একটু ধমকের সুরে বললাম, 'এই মনযুর কিংবা অন্য কোনো অফিসার কখন কোথায় থাকেন তা জানতে তোমরা

আমাকে জিগ্যেস করবে কেন?' তখন অপর প্রান্তের মেজর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে বলেই ফেললেন, 'বাঙালি অফিসাররা তো সবাই সিনিয়র হিসেবে সাধারণত আপনার বাসায় যান। তাই জিগ্যেস করলাম। আমাকে মাফ করবেন স্যার।'

বুঝলাম মেজরটি গোয়েন্দা বিভাগের এবং তাদের কাছে এসব ব্যাপার গোপন থাকে না। এর আগেও দু'একজন অফিসার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার আগে আমার বাসা হয়ে গেছেন। আমার বাসা ঘিরে রাখা গোয়েন্দারা নিশ্চয় তাদের প্রতিবেদন সদর দফতরে পাঠিয়েছেন। অতএব, এ নিয়ে অতো বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই স্থির করে আর কথা না বাড়িয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম।

পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম মেজর মনযুর পালিয়েছে ও পরিবারসহ সফলভাবে পালিয়েছে। খুব খুশি হলাম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু রাগও হলো মনযুরের ওপর। ওর সুবিধে ছিল যে তার ব্রিগেড শিয়ালকোটের সীমান্তে অবস্থিত। পরিদর্শনের ভান করে সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়া ওর জন্য কোনো সমস্যা ছিল না। অতঃপর দরকার সুবিধাজনক জায়গা দেখে রাস্তা ছেড়ে ভারতমুখী করে জিপের অ্যাক্সিলেটরের ওপরে জোরে চাপ দেয়া ও স্টিয়ারিংটি শক্তভাবে ধরে রাখা। ও নিশ্চয় জানতো আমিও আমার গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। একটু খবর দিলেই পারতো। সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করে টেলিফোন করা তো এমন কোনো সমস্যার ব্যাপার নয়।

এদিকে ভাবতে লাগলাম জিয়াউদ্দিন ও তাহেরের কী হলো? জিয়ার মেসে খবর নিলাম। আশ্চর্য, তাঁরাও নেই। তাঁরাও নাকি কাউকে কিছু না জানিয়ে কাল রাতে উধাও। একদিন পরে জানতে পারলাম সমস্ত ঘটনা।

আমার বাসা থেকে মেসে ফিরে গিয়ে জিয়াউদ্দিন ও তাহের ঠিক করলেন যে, সেই রাতে জিয়ার নিজস্ব গাড়ি করে প্রায় শ'দেড়েক মাইল দূরে শিয়ালকোটে যাবেন এবং চট্‌জলদি মনযুরকে রাজি করাবেন সীমান্ত অতিক্রম করতে। প্রয়োজন হলে মনযুরের শিশু সন্তান আর এক ছোট বাচ্চাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে সীমান্ত পার হতে হবে রাতে রাতেই। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা-মাফিক তাঁরা তিনজন অগ্রসর হন ও সফলভাবে সীমান্ত পার হয়ে যান।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। জিয়া ও তাহের উভয়ে অত্যন্ত ভালো করে জানতেন যে, আমি আধ ঘণ্টার নোটিশে পরিবারসহ আমার গাড়িতে করে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতাম। মনে হলো ওঁরা অত্যন্ত স্বার্থপর। এদিকে ড. সাত্তার ও দেলওয়ার ধরা পড়ার পর সবসময় আশঙ্কা করছিলাম কখন আমাকে পরিবারসহ বন্দি করা হবে। এই অবস্থায় ওঁদেরকে বিশেষভাবে স্বার্থপর মনে হলো; কিন্তু পরে উপলব্ধি করলাম এসব ব্যাপারে বোধহয় সবাই

স্বার্থপর হয়। হয়তো এমনি অবস্থায় আমিও অনুরূপ স্বার্থপরতাই করতাম। তখন সীমান্ত পার হওয়ার বিপদ ও সমস্যাসঙ্কুল দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে বোধহয় অন্য কোনো চিন্তার জন্য স্থান সঙ্কুলান হয় না। এভাবে মনকে প্রবোধ দিয়ে ভাবতে লাগলাম আমার ও যুগ্মসচিব রশীদ সাহেবের কী হবে।

যথারীতি অফিসে গেলাম। শুনলাম রশীদ সাহেবও তাই করেছেন। মনের ভেতরে গোপনে একটু আশা ছিল। রশীদ সাহেবের নাম তো ড. সাত্তারের মুখ থেকে গোয়েন্দা বিভাগ বের করে নিয়েছে। তা না হলে চিঠিটি এলো কি করে। তবে হয়তো আমার নাম নাও বলে থাকতে পারেন, কিন্তু না। অফিস-ফেরত পাঞ্জাবি আরদালি ও আমার বাঙালি বাবুর্চির মুখে শুনলাম যে, আমার বাড়ির সামনে ও পেছনের গোয়েন্দা রক্ষী দ্বিগুণ করা হয়েছে।

এমনিভাবে গেল কয়েকদিন। একদিন এক বাঙালি উপ-সচিবের কাছ থেকে খবর শুনলাম যে, রশীদ সাহেবকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং সাত দিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ভাবলাম, আহা যদি অনুরূপ বন্দোবস্ত আমার ক্ষেত্রেও করা হতো; কিন্তু তা হবে না জানতাম। কারণ রশীদ সাহেব সম্বন্ধে যা ছিল শাস্তিমূলক, আমার বেলায় তা হতো আমার জন্য আশীর্বাদমূলক।

যা হোক, আমার পলায়ন ও সীমান্ত অতিক্রমের এই তৃতীয় চেষ্টা শেষ চেষ্টাতে পরিণত হলো। গোয়েন্দা রক্ষী এমন প্রবল হলো যে, তাদের ফাঁকি দেয়ার প্রচেষ্টা অসম্ভব ছিল। কুসুমের বিয়েতে উপস্থিত হওয়ার ভাগ্য আমার হয় নি।

কার্যস্থলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন

রাওয়ালপিণ্ডিতে আমার প্রাত্যহিক অফিস জীবন দু'পর্বে ভাগ করা যায়। ড. সাত্তার ও মেজরত্রয়ী মনযুর-জিয়া-তাহেরের পলায়নের পূর্বে, অর্থাৎ আমিও যে পলায়ন পরিকল্পনায় রত এটা জানার পূর্ব পর্যন্ত এক পর্ব। ওই পলায়ন পরিকল্পনা ধরা পড়ার পরে আরেক ভিন্নতর পর্ব।

আমার পলায়ন পরিকল্পনা ধরা পড়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে। এর আগেও আমাদেরকে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি বিশ্বাস করতো না। তার প্রধান কারণ পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকায় বাঙালি সৈনিক অর্থাৎ পুলিশ, ইপিআর ও সমরবাহিনীর সৈনিকরা সামগ্রিকভাবে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে মার্চ মাসেই, ঢাকায় পাকিস্তানি সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে। কুষ্টিয়াসহ কয়েকটি জায়গায় নিয়োজিত পাঞ্জাবি সৈনিক দলকে এই বিদ্রোহীরা

সমূলে ধ্বংস করে। তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে বিদ্রোহীরা নিজেরা যেমন মৃত্যুবরণ ও আহত হতে থাকে, তেমনি প্রচুর সংখ্যায় পাঞ্জাবি সৈন্যও হতাহত হতে থাকে। এ পরিস্থিতির জন্য পাঞ্জাবিরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। তারা মনে করেছিল নৃশংস ও নির্বিচারে কয়েকদিন ধ্বংসযজ্ঞ চালালে গোটা পূর্ব পাকিস্তান ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল বৈ কিছু নয়। জনগণ এই ধ্বংসলীলা দেখলে বাকি জীবনে আর আওয়ামী লীগের নাম এবং বাংলাদেশের তথাকথিত স্বাধিকার আন্দোলনের কথা তাদের মুখেও আনবে না; কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। এই 'ছোটখাটো ও কৃষ্ণকায়' বাঙালিরা রুখে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু রুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারটি পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে গোপন রাখা হলো। সামরিক প্রশাসক তাদের পাকিস্তানি নাগরিকদের সফলভাবে বোঝাতে পারলো, যা ঘটছে তা কোনো মুসলমান বাঙালির কাজ নয়। হিন্দু বাঙালি ও ভারতীয় হিন্দুদের যোগসাজশে হচ্ছে এই 'গণ্ডগোল'। এদেরকে শিগগির উচিত শিক্ষা দেয়া হবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই অর্থাৎ ভুট্টোর কথাই ঠিক যে, ২৫ মার্চে আমাদের দেশপ্রেমিক ও সাহসী সৈনিকরা ধ্বংসের হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে।

এই বক্তব্য পাঞ্জাব তথা পাকিস্তানের মানুষ বিশ্বাস করতো এবং মনে মনে চাইতো যে, সেনা-অভিযান যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু সেনাসদর ও সামরিক কর্তৃপক্ষ আসল ব্যাপার টের পেয়েছিল ও হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতো যে গোটা বাঙালি জাতি আজ চরমভাবে বিক্ষুব্ধ এবং পাকিস্তান তারা আর চায় না। এ অবস্থায় আমরা যেসব বাঙালি তখন পাকিস্তানে কর্মরত ছিলাম তাদের ওপর পাঞ্জাবিদের আস্থা ছিল না, থাকার কথাও নয়। তদুপরি পশ্চিম পাকিস্তানেও যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখান থেকে বাঙালি সামরিক অফিসাররা সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করছে। অনেকে প্রাণের প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে চলে যাচ্ছে। অতএব, বাঙালি সেনা অফিসারদের বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না।

তবে মনে মনে বিশ্বাস না করলেও বাহ্যিক আচরণে তো তা দেখানো যায় না। আমাদের দৈনন্দিন কাজ থেকে বিরত রাখলে তো চলবে না। বিদেশি সাংবাদিকদের নজর তো আছেই, তাছাড়া পাঞ্জাবি জনগণও জানতে পারবে যে, 'দাল মে কুছ কালা হ্যায়'। অতএব, বাহ্যিকভাবে আমাদের অফিসে যাওয়া-আসা, গাড়ি-বাড়ি সব বহাল থাকলো। অফিস করতে হতো রুটিনমাফিক মামুলি কাজ। নীতি-নির্ধারণী জাতীয় সিদ্ধান্তগুলো আমাদের মাথার ওপর দিয়ে নেয়া হতো। আমাদের কিছুই জানতে দেয়া হতো না।

সেনাসদরে মূলত তিনটি শাখা থাকে। দুটি শাখা প্রধানত আইন-শৃঙ্খলা এবং রসদ ও পূর্ত বিষয়ক। তৃতীয় শাখাটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ শাখার কাজ সমর পরিচালনা ও তার জন্য পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক। এই শাখাটিতে

গোপনীয়তা বেশি প্রয়োজন; কিন্তু পাকিস্তানিদের জন্য বিশেষ অসুবিধার দিক ছিল এই শাখাটিতে আমরা দু'জন সিনিয়র বাঙালি অফিসার ছিলাম—ব্রিগেডিয়ার মজিদুল হক ও আমি। আমরা দু'জনে ডাইরেক্টর ছিলাম বিধায় প্রতিটি কনফারেন্সে আমাদের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ছিল। এইসব কনফারেন্সে নীতি-নির্ধারক ও সংবেদনশীল সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হতো। অথচ সেসব তো আমাদের দু'জনকে জানিয়ে নেয়া যায় না।

একদিনের কথা মনে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য একশ' ট্যাংক-বিধ্বংসী কামান সমরাস্ত্র কারখানায় তৈরি করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে যেসব কামান কারখানায় তৈরি অবস্থায় আছে তা অনতিবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত এবং এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোচনা আমাদের দু'জনের সামনে হতে পারে না। অতএব, অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার পর সভা স্থগিত ঘোষণা করা হলো। আমরা দু'জন ছাড়া বাকি সব ডাইরেক্টরকে আগেই জানানো হয়েছিল যে, আনুষ্ঠানিকভাবে সভা ভঙ্গ করার পরও যেন তাঁরা থাকেন। তাই আমরা চলে যাওয়ার দু'চার মিনিট পর তাঁরা পুনরায় একত্র হলেন এবং ট্যাংক বিধ্বংসী কামান ও পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের অবস্থা আলোচনা করলেন। কনফারেন্সটির সভাপতি ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান, জেনারেল স্টাফ প্রধান। ক্ষমতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পর দ্বিতীয় স্থানে। পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদারকি তিনি করতেন। অথচ এই গুল হাসান পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কি ঘটছে ও ঘটেছে তার কিছু তিনি জানতেন না, সহকারী সেনাপ্রধান জেনারেল হামিদ খান তাঁকে কিছু জানতে দেন নি। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ কিংবা অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও তিনি শেখ মুজিবকে একজন দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি আখ্যা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

পূর্বোক্ত কনফারেন্সগুলোতে আমাদের দু'জনের অবর্তমানে কি কি আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হতো তা জানা আমার পক্ষে কোনো সমস্যা ছিল না। কারণ এসব ডাইরেক্টরের মধ্যে দু'একজন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁরা আমাকে বিশ্বাসের অযোগ্য ভাবতেন না।

সেপ্টেম্বরের ঘটনার আগেও আমাদেরকে অনুরূপভাবে অবিশ্বাস করা হতো। ড. সাত্তারের ধরা পড়া ও মনযুরদের সফল পলায়নের পর আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তৃপক্ষ জানতে পারলো যে, আমি বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তখন ধীরে ধীরে আমার দফতর থেকে সব অফিসারকে অন্যত্র বদলি করা হলো। রাখা হলো কেবল আমার অফিস সেক্রেটারি ও ব্যক্তিগত সহকারীকে। এঁরা দু'জন যখন খুশি অফিসে আসতেন, কোনো দিন হয়তো আসতেনও না।

আমিও কিছু বলতাম না। তবে রোজই অফিসে যেতাম। একদিন এমনিতে ইচ্ছে হলো যে, পরীক্ষা করে দেখি এরা অন্তত বাহ্যিকভাবে আমার ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় কিনা। সহকারীর মাধ্যমে খবর পাঠালাম যে, আমি দু'দিন পর ওয়াহ্ সামরিক কারখানায় একটি কাজ পরিদর্শন করতে যাবো।

আমি ধরে নিয়েছিলাম কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে আমার প্রস্তাবিত কার্যক্রম অনুমোদন করা হবে না। কিন্তু না, সময়মতো লম্বাটে আমেরিকান গাড়ি ব্রিগেডিয়ারের পদবির তারা লাগিয়ে দফতরে এসে হাজির। যেখানে গেলাম সেখানেও দেখি সব প্রস্তুত। একজন ব্রিগেডিয়ার আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। যা যা দেখতে চাইলাম দেখানো হলো।

এ কথাটা স্বীকার করতে হবে যে, পাঞ্জাবি সেনা কর্তৃপক্ষের এই বাহ্যিক ভদ্রতামূলক আচরণ আমার মনে রেখাপাত করেছিল। ঘটনাটি বিশেষ করে মনে পড়লো, ১৯৭৫-৭৬ সালে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী ত্যাগ করার পর যখন ঘরে বসে থাকতাম, সেই সময়ের নিরিখে। তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক একনায়ক, আমার প্রতি সামরিক শাসকের অনুরোধ/আদেশ ছিল যে, আমি যেন দেশের বাইরে যাই রাষ্ট্রদূত হয়ে; কিন্তু আমি রাষ্ট্রদূতের পদ নিয়ে দেশের বাইরে যেতে রাজি হই নি। সেই সময় দু'দুটো গোয়েন্দা গাড়ি আমার বাসার দু'দিকে সার্বক্ষণিক পাহারায় নিযুক্ত থাকতো। আমি যেখানে যেতাম একটি গাড়ি অনুসরণ করতো। এতে আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তারা আমার কাছে আগত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে প্রশ্ন করা ও ভয়ভীতি দেখাতে আরম্ভ করলো। মনে পড়ে তখন একদিন আমি একটি গোয়েন্দা গাড়ির ভেতরকার গোয়েন্দাদেরকে অলক্ষ্যে ধরে ফেললাম এবং তীব্রভাবে বকুনি দিতে লাগলাম। বকাবকি শুনে গোয়েন্দা হাবিলদারটি বেশ বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'স্যার, আমরা হুকুমের দাস। চাকরি করে খাই। আপনি যদি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসেন তবে আপনার হুকুমও আমরা অনুরূপভাবে তামিল করবো। আমাদেরকে অযথা আপনি গালাগালি দিচ্ছেন কেন?' হঠাৎ আমার হুঁশ হলো। আমি হাবিলদারটির কাছে মাফ চাইলাম।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

১৯৭১ সালের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা

এখানে ১৯৭১ সালের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ দেয়া হলো। ঘটনাগুলোর কোনো কোনোটির সাথে তৎকালীন ইতিহাসের সম্পর্ক আছে। আবার কোনো কোনোটিতে মানব চরিত্রের ক্ষুদ্রতা ও উদারতার অদ্ভুত বৈচিত্র্যও প্রকাশ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকে যদি একটি বিপ্লবের সাথে তুলনা করা যায় তবে এটাও প্রকাশ পাবে যে, বিপ্লবের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী বিপ্লব-পরবর্তী ইতিহাসের অধ্যায়ে বিপ্লবের সন্তানরাই প্রথম কোরবানি হয় এবং যারা বিপ্লবের বিরোধিতা করে কিংবা যারা বিপ্লব থেকে নিজেদের সযত্নে দূরে রাখে তারাই বিপ্লবের ফল ভোগ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

আবার কোনো কোনো ঘটনায় পাঞ্জাবিদের মনোভাবও পরিস্ফুট হবে। ঘটনাগুলো যথাসম্ভব সময়ানুক্রমিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানে 'বিদ্রোহী' অফিসারদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তা

ঘটনাটা বোধ করি একাত্তর সালের এপ্রিল মাসের, আমি তখন মংলায়। একদিন রাওয়ালপিণ্ডি থেকে খবর জানতে পারলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানে যেসব বাঙালি অফিসার বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'একজনের পরিবার সেখানকার সেনাছাউনিতে আটকা পড়েছেন। মেজর জিয়ার স্ত্রী খালেদা জিয়াও ছিলেন এঁদের একজন। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। অথচ তাঁদেরকে আত্মীয়-পরিজনের কাছে যেতে দেয়া হচ্ছে না। খবরদানকারীরা আমাকে অনুরোধ করলেন যেন আমি চেষ্টা করি এ বিষয়ে

একটা কিছু করতে। ভাবছি দুর্ভাগা বোনদের জন্য কী করতে পারি। শেষে কোর কমান্ডার জেনারেল ইরশাদকে কথাটা বললাম।

বলার পূর্বে এটাও চিন্তা করলাম তিনি হয়তো সাধারণ পাকিস্তানিদের মতোই বলবেন যে, যাদের স্বামী বিদ্রোহী তাদের তো এটাই প্রাপ্য। সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবলাম যে, তিনি হয়তো দয়াপরবশও হতে পারেন। অতএব, বলতে তো আপত্তি থাকা উচিত নয়। সেই ভাবনা থেকে কথা পাড়লাম এভাবে যে, এই মহিলাদের স্বামীরা হয়তো বিদ্রোহী, কিন্তু আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী এঁরা আমাদের আশ্রিতা। এঁদের অসম্মান তো আমাদের ধর্মেও গ্রহণযোগ্য নয়। ভয়ে ভয়েই বললাম কথাগুলো। শোনা মাত্র ইরশাদ বলে উঠলেন, 'বলো কি হে? ওঁরা তো তোমার আমার বোন ও মেয়ে। ওঁদের অসম্মান? তাও আমাদের সৈনিকদের হাতে—যে সেনাবাহিনীকে আমরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী বলে বিশ্বাস করি। বলো কি? আমি এখনি আমার মা-বোনদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করছি। আর তুমি যাদের বিদ্রোহী বলছো আমি বলবো তারা 'গুমরাহ' (পথভ্রষ্ট)। ওরাও একদিন পথে ফিরে আসবে।' বলেই তিনি টেলিফোন করলেন সেনাসদরে। একদিন পরে আমাকে ডেকে বললেন, 'খলিল, আমি বন্দোবস্ত করেছি। ওঁরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে সেনানিবাসে থাকতে পারবেন।'

আমি আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, জেনারেল ইরশাদ ঢাকায় সেনাহামলা পুরোপুরি সমর্থন করেন, তবে তিনি ব্যক্তিগত ও মানসিকভাবে উঁচুমানের নৈতিকতায় বিশ্বাসী। ঠিক এই ধরনের পাঞ্জাবি অফিসার আমি পরেও কয়েকজন দেখেছি। প্রত্যেক সমাজে বোধহয় এমনি ধরনের উচ্চ মনের ব্যক্তি আছেন। এঁদের সংখ্যা অধিক হলে পৃথিবী ও জীবন আরও উপভোগ্য হতো।

জুনিয়র অফিসারের পলায়ন ও মুক্তিযুদ্ধে যোগদান

মংলায় থাকাকালীন একটি ছোট ঘটনার কথা মনে পড়ে। একদিন বিকেলে আমার পরিচিত ক্যাপ্টেন (পরে কর্নেল) হামিদ দেখা করতে এলেন। হামিদ ছিলেন, যতো দূর মনে পড়ে, আর্টিলারি কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের অফিসার। চা খেতে খেতে একথা-সেকথার পর তিনি বললেন, 'স্যার, আমি সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে চাই।' জিগ্যেস করে জানতে পারলাম তাঁর ইউনিট থেকে মাইল পনের দূরে আজাদ কাশ্মিরের মিরপুরের সীমান্ত। সেখান থেকে ছদ্মবেশে আজাদ কাশ্মিরের পায়ে-হাঁটা পথ পার হলে ভারতের কাশ্মির। ব্যাস্। আমি জিগ্যেস করলাম, তা এ বিষয়ে আমাকে জিগ্যেস করা কেন? প্রশ্ন

করে বুঝতে পারলাম যে, মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি, হামিদের জন্য তাতে যোগদান সঠিক হবে কিনা, এই কথাগুলো আমার মতো প্রবীণ ও অভিজ্ঞ অফিসারের কাছ থেকে শুনে নিশ্চিন্ত হতে চান হামিদ। আমার মনে সন্দেহ তো প্রথম থেকে ছিল যে অফিসারটি পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর চর নয়তো। কিন্তু সন্দেহটিকে মুহূর্তে উড়িয়ে দিলাম এই চিন্তা করে যে, আমাদের জন্য তো ভূত ও ভবিষ্যৎ সব শেষ হয়ে গেছে ২৫ মার্চের রাতেই। অতএব, সন্দেহমুক্ত মনে ওঁকে বললাম, 'দেখ হামিদ, তোমার জায়গায় আমি (অর্থাৎ অবিবাহিত) হলে কোনো রকম ইতস্তত না করেই রওনা দিতাম।'

কারণ হিসেবে বললাম, 'মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জয় হবে কি পরাজয় সেটা তো আমার ভাববার বিষয় নয়। আমার একমাত্র চিন্তা আমার দেশ আজ অন্যায়ভাবে জালেমের কবলে পড়ে কাতরাচ্ছে। আমার মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার প্রশ্ন উঠেছে। অতএব, সৈনিক হিসেবে আমার একান্ত কর্তব্য মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করা।' আমার কথা শুনে হামিদের শক্ত চোয়াল আরও শক্ত হয়ে উঠল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমার সাথে গভীরভাবে করমর্দন করে এই বলে বিদায় নিলেন, 'দোয়া করবেন স্যার।'

হামিদকে ঈর্ষা হলো। আমিও যদি তাঁর মতো পিণ্ডি যাবো বলে তিন দিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে উল্টোপথে হাঁটা দিতে পারতাম! কিন্তু সঙ্গে আমার পরিবার, মা ও যুবতী মেয়ে রয়েছে।

পরে প্রায়শ শুনতে পেতাম, আজ অমুক কাল তমুক চলে গেছে। এমনিভাবে কয়েক দিন পরপর আমাদের জুনিয়র, বিশেষ করে যাঁদের পরিবার সঙ্গে ছিল না এবং যাঁদের পালাবার সুবিধা ছিল, তাঁরা চলে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করছেন। শুনে বুকটা ভরে উঠতো তাঁদের জন্য—গর্বে ও প্রশংসায়; কিন্তু একই সময় অতীব লজ্জাজনক ঘটনাও ঘটতো। অনেক অফিসারের এইরূপভাবে পালাবার সুযোগ ছিল; কিন্তু তারা পালায় নি— হয়তো সাহস ছিল না কিংবা ইচ্ছে ছিল না। এর চাইতে আরও লজ্জাজনক ঘটনা ছিল। অনেক অফিসার ১৯৭১ সালের মার্চের পর পাকিস্তান থেকে ঢাকায় ছুটিতে গিয়েছে; কিন্তু সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পরিবর্তে তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে করাচি পৌঁছেছে।

ঠাণ্ডা মাথায় খুন

মাসখানেক পরের কথা, আমি রাওয়ালপিণ্ডিতে বদলি হয়েছি। এখানে ঢাকার খবরাখবর প্রায় সব পাওয়া যায়। পিণ্ডি এসে শুনলাম আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্নেল মুশতাককে বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যা করা হয়েছে ঢাকার

সেনাসদরের একটি অফিস কক্ষে। যে পাঞ্জাবি অফিসার তাঁকে হত্যা করেছে সেও বেঙ্গল রেজিমেন্টের। যখন হত্যা করা হয় মুশতাক তখন উর্দি পরিহিত ছিলেন। মুশতাক বিদ্রোহ করে সীমান্ত পার হন নি। বরং প্রমোশন পেয়ে অতি বাধ্য অফিসারের মতো সেনাসদরে এসেছিলেন তার জন্য কি আদেশ জানতে। আদেশের পরিবর্তে জুটলো বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি। অথচ ঘাতক অফিসারটির কোনো শাস্তি হয় নি।

পঁচিশে মার্চের সময় অনুরূপভাবে অফিসে ঢুকে কর্নেল হাইসহ অনেক ক'জন অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে জানতাম; কিন্তু তার দু'তিন মাস পরও একই ধরনের ঘটনা ঘটল কীভাবে? ভাবতে লাগলাম—এরা কি চায়? এরা কতো দূর যাবে?

কোর্ট মার্শাল

শুনতে পেলাম ঢাকার ধ্বংসযজ্ঞের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জাহানযেব আরবাব (২৫ মার্চের 'ঢাকার জল্লাদ' হিসেবে কুখ্যাত) বগুড়ার স্টেট ব্যাংক ভেঙে অগুনতি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এজন্য তার কোর্ট মার্শাল হচ্ছে। আরও কোর্ট মার্শাল হচ্ছে এক লেফটেন্যান্ট কর্নেলের অনুরূপ কোনো অপরাধের জন্য। সব প্রস্তুতি শেষ; কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে কোর্ট মার্শাল আদেশ বাতিল হলো। ইস্টার্ন কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি নাকি পাকিস্তান সেনাসদরকে বুঝিয়েছেন যে, যুদ্ধের সময় এ ধরনের কাজ হয়েই থাকে। আর পূর্ব পাকিস্তানে কোনো অফিসারকে কোনো অপরাধের জন্য কোর্ট মার্শাল করলে বহির্বিশ্বের সাংবাদিকরা জানতে পারবে এবং তাতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সাহসী সেনাবাহিনীর সুনামের ক্ষতি হবে। হতে পারে পাকিস্তান সেনাসদর থেকে নিয়াজিকে অনুরূপ কারণে কোর্ট মার্শাল বন্ধ করতে বলা হয়েছিল। অতএব, পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার আরবাব বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পূর্ববর্তী মুহূর্তে বীরের মতো পাকিস্তানে ফেরত গিয়েছিল এবং সেখানে পরে তাকে লে. জেনারেল পদ পর্যন্ত পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। তবে এটাও জানি যে, এই ঘটনার পর চুরি, লুণ্ঠন ও নারীঘটিত কোনো অপরাধের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধরত কোনো সৈনিক কিংবা অফিসারকে শাস্তি পেতে হয় নি। বরং পরবর্তী সময়ে অক্টোবরে জেনারেল নিয়াজির একটি বক্তব্যে এই নির্দেশটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, 'অপরাধ যতো ইচ্ছে করো কিন্তু বাঙালিকে দমন করতে হবে এবং ভারতকে যুদ্ধে হারাতে হবে।'

শুনলাম অক্টোবর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ডিভিশন কমান্ডার মেজর জেনারেল শওকত রেজাকে 'যুদ্ধে অনীহা প্রদর্শনের' কারণে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছে। কমান্ড হারিয়ে তিনি হয়েছেন পাকিস্তান সেনাসদরে আমাদের উপরস্থ জেনারেল স্টাফের উপ-প্রধান। যদিও পদ হিসেবে ততোটা খারাপ নয় তবে বোঝা গেছে শওকত রেজার সামরিক ভবিষ্যৎ সমাপ্ত-প্রায়। পূর্বেই বলেছি, দু'একজন অন্তরঙ্গ পাকিস্তানি বন্ধুর মাধ্যমে আমি সব খবরই যোগাড় করতে পারতাম। শওকত রেজা অকৃতদার ও সামরিক পেশায় একান্ত নিবেদিতপ্রাণ। এছাড়া অতীব মেধাসম্পন্ন অফিসার হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। আমরা অনুমান করতাম তিনি ভবিষ্যতে সেনাপ্রধান হবেন। সেনাবাহিনীর অফিসার্স মেসের একটি সাধারণ কামরায় থাকতেন। নিতান্ত গ্রামীণ ভদ্রলোকের মতো তাঁর বাহুল্যবর্জিত জীবনধারা ও আবাস। সেনাবাহিনীর দেয়া বেতের চেয়ারগুলো ছিল তাঁর সোফা সেট। আমি একদিন মেহমান হয়ে গিয়েছিলাম তাঁকে সালাম করতে। চা দিলেন আর খেতে দিলেন তাঁর সৈনিক ব্যাটম্যান দ্বারা প্রস্তুত আটার হালুয়া।

আমি যে দফতরের ডাইরেক্টর ছিলাম, শওকত ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ডাইরেক্টর। সেনাবাহিনীর সংগঠন ও রণ-কৌশল বিষয়ে গবেষণা করা ছিল ঐ দফতরের কাজ। এক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান রয়েছে। তিনি শুধু কাজেকর্মেই সৎ ছিলেন তা নয়, জেনারেল ইরশাদের মতো মনে-প্রাণেও সৎ। একইভাবে সত্য কথাটা সোজা ভাষায় বলা ছিল তাঁর অভ্যাস। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। এছাড়াও বাঙালিরা তাদের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে না সেটা অনুভব করে তিনি সাধারণভাবে বাঙালি অফিসারদেরকে বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন।

তাঁর সামরিক পেশার হঠাৎ ইতি ঘটার কাহিনী শুনতে পেলাম পরে। ঘটনাটি ছিল এইরূপ। ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের সকল ডিভিশন কমান্ডারের কনফারেন্স হচ্ছিল। এক সময় কোনো অফিসার নালিশ করেছিলেন যে, দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৈনিক দ্বারা নারী ধর্ষণের অপরাধ ঘটছে। এর উত্তরে নিয়াজি নাকি বলেছিলেন, 'দেখ, বর্তমানে আমরা যুদ্ধাবস্থায় আছি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিকভাবে ঘটে বলে ধরে নিও।' তারপর অত্যন্ত উঁচুমানের কৌতুক মনে করে বললেন, 'ভালোই তো, এইসব বাঙালি রক্তে পাঞ্জাবি রক্ত মিশিয়ে এদের জাত উন্নত করে দাও।'

এই কথা শুনে নিবেদিতপ্রাণ সৎ সৈনিক শওকত রেজার আর সহ্য হয় নি। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, 'আশা করি আপনার এই বক্তব্য কনফারেন্স শেষে যে

'মিনিটস' সর্বত্র (পাকিস্তান সেনাসদরসহ) প্রেরণ করা হবে, সেখানেও ঠিক এই ভাষায় লেখা থাকবে।' নিয়াজি বিরক্ত হয়ে বিষয়টা হালকা করার চেষ্টা করলে শওকত রেজা জোরের সাথে বলেছিলেন, 'এটা আপনার নির্দেশ বলেই আমরা ধরে নেবো। অতএব, আপনার এই বক্তব্য লিপিবদ্ধ করাকে আমি সৈনিকসুলভ সততা ও সাহসিকতার পরিচায়ক বলে মনে করি।'

আর যায় কোথায়? নিয়াজি তাঁকে সেখানে কিছু বলার সাহস না পেলেও শওকত রেজার যুদ্ধ করার মতো 'গুরদা' নেই বলে প্রতিবেদন লিখে তাঁকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠান। যদিও শওকত রেজা তাঁর উজ্জ্বল পেশাগত ভবিষ্যৎ এভাবে নষ্ট হবে ভাবেন নি, তবুও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেয়ে স্বস্তি অনুভব করেছেন।

নিয়াজির অনুরূপ কেবল একটি বক্তব্য শুনেই শওকত রেজা চাকরির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন নি। নিয়াজি প্রায়শ বলতেন, 'মনে রেখো, This is a low lying country— people here are low and they lie.'

পাকিস্তান-প্রেমিক বাঙালি কূটনীতিক রিয়াজ রহমান

জুন-জুলাই মাসের কথা। একদিন পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলোতে দেখলাম বড় শিরোনামে লেখা হয়েছে, 'বাঙালি দুষ্কৃতকারীদের অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করে দেশপ্রেমিক বাঙালি কূটনীতিকের দিল্লি ত্যাগ ও করাচিতে আগমন।' ভেতরে বর্ণিত হয়েছে দিল্লি দূতাবাসে নিযুক্ত বাঙালি দ্বিতীয় সচিব রিয়াজ রহমান কীভাবে সেখানকার বাঙালি দুষ্কৃতকারীদের পরাস্ত করে করাচিমুখী প্লেনে আরোহণ করেন।

খবরটি পড়ে আমার এক পাঞ্জাবি বন্ধু টেলিফোন করে জানালেন যে, দেখেছ তো সমস্ত বাঙালিই গাদ্দার (বিশ্বাসঘাতক) নয়।

কয়েকদিন পর আমি ও ব্রিগেডিয়ার মজিদুল হক গিয়েছি ইসলামাবাদে বেড়াতে। উপসচিব হেদায়েত আহমদের (পরে সচিব) বাসায় গেলাম। তিনি ছিলেন আমাদের অন্তরঙ্গ। তাঁর বৈঠকখানায় প্রবেশ করে দেখি সুদর্শন এক যুবক বসে আছেন। হেদায়েত পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় সচিব রিয়াজ রহমান।' আমাদের দু'জনের পরিচয়ও দিলেন তাঁকে। ওঁকে দেখে তো আমার রক্ত মাথায় চড়ে গেছে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার অবস্থা দেখে গৃহকর্তা হিসেবে হেদায়েতও প্রমাদ গুণলেন। কারণ হেদায়েত আমার মনোভাব সম্যকভাবেই বুঝতে পেরেছেন। আমি সেসব দেখেও দেখলাম না। বললাম, 'তা হলে

আপনিই সেই রিয়াজ রহমান, যিনি অতি সাহসিকতার সাথে দিল্লিস্থ বাঙালি দুষ্কৃতকারীদের প্রচেষ্টা প্রতিহত করে নিজের দেশ করাচিতে পৌঁছেছেন সফলভাবে?' বলাবাহুল্য, রিয়াজ এভাবে তিরস্কৃত হতে অভ্যস্ত ছিলেন না বলে নিজেও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তর্কের এক পর্যায়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'পত্রপত্রিকায় লিখেছে ঢাকায় পাকিস্তানিরা 'জেনোসাইড' (একটি জাতি নির্মূলকরণ) করেছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? জেনোসাইডের অর্থ কি এরা জানে?'

আমি অনেকটা ধীর কণ্ঠেই উত্তর দিলাম, 'জেনোসাইডের অর্থ আমিও জানি না। তবে আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী ঢাকায় পঁচিশে মার্চ সেনাবাহিনী কতো লোক মেরেছে?'

'যা পত্রিকায় বলা হয় তার চাইতে অনেক কম।'

'তবুও বলুন সেই সংখ্যা কতো হবে, দশ হাজার?'

'না এতো হবে না।'

'তবে হাজার দুয়েক?'

'তা হতে পারে।'

'রিয়াজ সাহেব, এই যে দু'হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে তাদের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ও তাদের বেতনভুক সেনাবাহিনী হত্যা করলো, এই বুলেটগুলোর মূল্যের অর্ধেক তো বাঙালিরা মিটিয়েছে, তাই না? এ ব্যাপারটি আপনার কাছে অতীব ক্ষুদ্র মনে হতে পারে। কেননা আপনি একটি 'খুশি চাকরিতে' আছেন। আর যারা মরেছে তাদের দেয় অর্থ থেকে আপনার বেতন আসে। আপনার লজ্জা করে না 'মাত্র দু'হাজার' হত্যা করা হয়েছে এমন কথা বলতে?'

রিয়াজ কি একটা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে হেদায়েত ও মজিদুল হক দু'জনেই তাঁকে ঠেলেঠুলে অতি কষ্টে বিদায় করে দিলেন। আর আমাকে ওঁরা দু'জন ও আমাদের স্ত্রীদ্বয় তিরস্কার করতে লাগলেন। আমি বুঝতে পারলাম যা করেছি তা অত্যন্ত ছেলেমানুষির পর্যায়ে পড়ে। তবে বোঝা যায় কেমন কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়তাম এসব বাঙালিদের দেখলে।

১৯৭৩ সালে দেশে ফিরে দেখি রিয়াজ রহমান আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্র সচিব হন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। এতে আমার ক্ষোভের কিছু থাকত না, যদি মেজর মনযুর, মেজর জিয়াউদ্দিন, কর্নেল তাহের এঁরাও বাংলাদেশের সরকারে মন্ত্রী পর্যায়ের কিছু হয়ে থাকতেন; কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম খোরাক হলেন এঁরাই, আর স্বাধীনতার সুফলভোগকারী হচ্ছে রিয়াজ রহমান। হয়তো সেটাই নিয়ম।

কর্নেল কাইয়ুম চৌধুরী

এর কয়েকদিন আগে মেজর মান্নান সিদ্দিকী (পরে মেজর জেনারেল ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) আমাকে বলেছিলেন যে, 'স্যার, গতকালের পাকিস্তান রেডিও শুনেছেন?'

'না শুনি নি তো। কেন?'

'স্যার, অবাক কাণ্ড! মেজর কাইয়ুম চৌধুরী (মুনীর চৌধুরীর ভাই) বার্লিনে গেছেন একটা প্রশিক্ষণ কোর্সে। সেখানে এতো সুযোগ ছিল পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার অথচ তা না করে মুনীর চৌধুরীর মতো লোকের ভাই যে ভাষণ দিয়েছে রেডিও পাকিস্তানে তা শুনে কতোটা ঘেন্না ধরে গেছে তা বলার ভাষা আমার জানা নেই। শেখ মুজিবকে তো গাদ্দার বলেছেই, তাছাড়া বলেছে, মুজিব তুমি জানো না তোমার মতো কুলাঙ্গার এই সোনার দেশটির কি ক্ষতি করেছে ও করছে।'

কাইয়ুম ছিলেন অত্যন্ত কৃতী ব্যক্তি, তাঁর ভাষা, শব্দ চয়ন ও বলার ভঙ্গি সব মিলে এই ইংরেজি বক্তৃতা 'যেমনি আকর্ষণীয় তেমনি ঘৃণা উদ্রেককারী' বলে মান্নান জানালেন। মেধাবী হিসেবে কাইয়ুম আমাদের অহঙ্কার ও স্নেহের পাত্র ছিলেন। মনটা নিতান্তই খারাপ হয়ে গেল। তবে ঘটনাটা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম; কিন্তু এর দু'এক মাস পরে কাইয়ুম আমার বাসায় এসে হাজির।

অক্টোবরের শেষ কিংবা নভেম্বরের প্রথম দিকের কথা। বাসায় বসে আছি। মুনীর চৌধুরীর ছোট ভাই মেজর কাইয়ুম চৌধুরী এলেন। যদিও জার্মানিতে প্রশিক্ষণ অবস্থায় তাঁর রেকর্ডকৃত বক্তব্য পাকিস্তানে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল, প্রচারের বিষয়বস্তু আমি মোটামুটি পুরোপুরিভাবে জেনেছি, তবুও এ কথা বলতে পারবো না যে ওঁকে দেখে খুশি হই নি। এর প্রধান কারণ ওঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্নেহ করতাম। ১৯৬৭ সালে একবার সেনাবাহিনীতে বাঙালি ক্যাডেটে ভর্তি করার উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে উৎসাহিত করার জন্য দুটো টিম গঠিত হয়েছিল। কাইয়ুম আমার টিমে ছিলেন। তখন ওঁর কথাবার্তা বিশেষ করে বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ইতোপূর্বে কাইয়ুম পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে কোর্স সমাপনকালে 'সম্মানীয় তরবারি' নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে পাস করাতেও আমরা ছিলাম গর্বিত; কিন্তু যখনি বেতারে ওঁর বক্তব্যের কথা মনে পড়লো—মনটা বিরূপ হয়ে গেল। তাই ওঁর সাথে গল্প বিশেষ জমলো না। ওঁ বারবার প্রশ্ন করলেন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি কি? এই প্রশ্নের উত্তর ওঁকে দিতে আমার মনে এক প্রকার ঘৃণার উদ্রেক হলো। সংক্ষেপে বললাম, অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে, এখন কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে কবর দেয়া বাকি।

আমার কথা শুনে বুদ্ধিমান কাইয়ুম এতোটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন বুঝতে

পারি নি। তিনি কটুকণ্ঠে আমার কথার প্রতিবাদ করে বললেন, 'ওখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনার চিন্তা একান্তই ভুল। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এরপর আমি আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে বললাম, 'কাইয়ুম, তুমি কোথায় উঠেছ?'

এই মাত্র দেশে ফিরেছে এবং কোথাও এখনও ওঠে নি শুনে বললাম যে, আমার অতিথি কামরা খালি আছে। ইচ্ছে করলে আমার অতিথি হতে পারো। কাইয়ুম তাতে রাজি হলেন না। বরং আবার প্রশ্ন করলেন, আমি পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজেকে এতোটা সঠিক মনে করি কেন?

এতোক্ষণে আমারও ধৈর্য ফুরিয়ে আসছিল। বললাম, 'দেখ কাইয়ুম, তুমি বিদেশ থেকে পালিয়ে দেশে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পরিবর্তে পাকিস্তানে ফিরে এসেছ। তোমার তো দেশের খবর জানার কথাও নয়। কারণ তুমি যে পরিস্থিতিতে বসবাস করো (কাইয়ুম ওঁর চাইতে অনেক অধিক বয়সী এক পাঞ্জাবি গৃহবধূর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সাথেই বসবাস করতো) তাতে তুমি বাঙালি সমাজ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন এবং তোমার মনও বাঙালির ব্যাপারে অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে।' আমি কথাটা ইংরেজিতে বলেছিলাম, 'Qayyum, you are isolated from our society and your mind is insulated.' কথাটা শুনে স্বাভাবিকভাবেই কাইয়ুম অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং কিছুটা অপমানিতও বোধ করলেন। কিন্তু আমি তাঁকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দরজা দেখিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। বুদ্ধিমান কাইয়ুম আর প্রত্যুত্তর দেয়ার চেষ্টা করেন নি।

পরে শুনেছিলাম কাইয়ুম পাঞ্জাবি জেনারেল শওকত রেজার মেহমান হয়েছেন। শুনে মনে হলো ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির জন্য বাঙালি ব্রিগেডিয়ারের চাইতে পাঞ্জাবি জেনারেলের আতিথ্য গ্রহণ হয়তো শ্রেয় বলে মনে হয়েছে কাইয়ুমের। কিন্তু তিনি হয়তো জানতেন না যে, মেজর জেনারেল শওকত রেজার ভবিষ্যৎও ফিকে হয়ে পড়েছে। প্রত্যাখ্যাত ও নিরুৎসাহ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ফেরত এসে তিনি সেনাসদরে ডিসিজিএস পদে বহাল হয়েছেন।

ডিসেম্বরের কোনো এক সকালবেলা। কি কাজে শওকত রেজার পাশের অফিসে গিয়েছি। দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম—সালাম দিলাম ও চলে যেতে লাগলাম। শওকত রেজা ডাকলেন, 'খলিল, এসো না, চা খাবে।' বুঝলাম গল্প করবেন। ভেতরে গেলাম। গিয়ে দেখি মেজর কাইয়ুম বসে আছেন। ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্বন্ধে শুনেছি এর পূর্বেই। আর এও জেনেছি যে, কাইয়ুমের ভাই মুনীর চৌধুরীও ঐসব শহীদদের মধ্যে একজন। অতএব, অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাইয়ুমকে সমবেদনা জানালাম। শওকত রেজা এই সঙ্গে

বললেন যে, 'কাইয়ুম, আমিও অত্যন্ত দুঃখিত এই চরম পাশবিক কাহিনী শুনে।'

কিন্তু কাইয়ুম হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ও চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'আপনি বলেছেন যে আমি সমাজ থেকে isolated এবং আমার মন insulated। এখন তো বুঝতে পেরেছেন যে বাঙালি চরিত্র সম্বন্ধে আমি জার্মানির মতো দূরে থেকে যা বুঝতে পেরেছি এবং সঠিক অনুধাবন করেছি, আপনারা এখান থেকেও তা বুঝতে পারেন নি। দেখলেন তো আপনাদের পরম গর্বের মুক্তিযোদ্ধারা কি করেছে—আমার ভাই বাঙালির গৌরব মুনীর চৌধুরীকে হত্যা করেছে। আপনারা যতো বড়ই হোন বাঙালিই থেকে যাবেন।'

কাইয়ুম কথাগুলো সবই ইংরেজিতে বলছিলেন বলে জেনারেল শওকত রেজাও শুনছিলেন ও কাইয়ুমকে উত্তেজিত দেখে তাঁকে কীভাবে থামাবেন এবং আসল কথাটি কী করে বোঝাবেন, বুঝতে পারছিলেন না। বললেন, 'কাইয়ুম তুমি থাম।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খলিল, আমি দুঃখিত যে কাইয়ুম সঠিক খবরটি জানে না। আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো। তবে বুঝতে পারছো সে এখন অত্যন্ত শোকাহত। ওকে আমি সত্যি ঘটনা বুঝিয়ে বলবো। আমার মনে হয় তোমার এখন যাওয়াই ভালো। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।'

আমিও অনুরূপ একটি পরিত্রাণ চাইছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তবে কাইয়ুমের অগ্নিদৃষ্টি আমাকে অনেকক্ষণ অনুসরণ করেছিল বলেই আমার অনুমান।

বিচারপতি নূরুল ইসলাম

জুলাই কি আগস্ট মাস। একদিন অফিসে বসে আছি। ব্যক্তিগত সহকারী বললেন, আপনার এক বাঙালি বন্ধু টেলিফোনে অপর প্রান্তে। ফোন হাতে নিলাম।

'কে খলিল? আমি নূরুল ইসলাম।' ভাবতে লাগলাম কোন নূরুল ইসলাম। 'আরে কলকাতা বেকার হোস্টেলের নূরুল ইসলাম, যাকে তোমরা... বলে ডাকতে।'

'ওহ্ জাস্টিস নূরুল ইসলাম? তুমি কোত্থেকে? পিণ্ডি কবে এলে?'

'ভাই খলিল, আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আছি। তোমার সাথে জরুরি কথা বলা দরকার; কিন্তু তোমার অফিসে আসা তো মুশকিল, নানা রকমের বাধা। তুমি কি এখনই আসতে পারবে?'

হাতে কোনো কাজ ছিল না। বললাম, আসছি।

নূরুল ইসলাম ও আমি ছাত্রজীবনে কলকাতার বেকার হোস্টেলে এক ব্লকে থাকতাম। অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওকালতি শুরু করে হাইকোর্টে বিচারপতি হয়েছেন। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের রেডক্রসের সভাপতি (নূরুল ইসলাম জেনারেল

এরশাদ সরকারের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও পরে উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। জাতীয় পার্টির টিকিট নিয়ে সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন)। হোটেলে পৌঁছতেই চায়ের হুকুম, তারপর নূরুল ইসলাম জানতে চাইলেন, 'পাকিস্তানের অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে?' নূরুল ইসলাম ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ। অতএব, কোনো সঙ্কোচ না করেই উত্তর দিলাম, 'পরিস্থিতি' সম্পর্কে জেনে কী লাভ হবে। পাকিস্তান তো ভেঙে গেছে সেই পঁচিশে মার্চের ভয়াল রাতে। এখন তো শুধু আনুষ্ঠানিকতা বাকি। তবে তুমি এ প্রশ্ন কেন করছো?'

আমার কথা শুনে নূরুল ইসলামের ফরসা মুখটা সাদা হয়ে গেল। 'তবে যে ওরা বলে সব ঠিক হয়ে গেছে। আর তুমি বলছো পাকিস্তান ভেঙে গেছে?'

তখন বুঝতে পারলাম নূরুল ইসলামের কোনো সমস্যা আছে। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী নূরুল ইসলামকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে বলেছেন, রেডক্রসের চেয়ারম্যান হিসেবে জেনেভা ও জাতিসংঘে গিয়ে সবাইকে বলতে হবে পূর্ব পাকিস্তানে এখন কোনো সমস্যা নেই। আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো যা বলে তা মিথ্যে। বিচারপতি হিসেবে নূরুল ইসলামের কথার মূল্য আছে। তাই রাও ফরমান আলীর নির্দেশে নূরুল ইসলাম প্রথমে জেনেভা ও পরে আমেরিকা ইত্যাদি দেশে যাবেন। নূরুল ইসলাম একা নন। তাঁর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীন মুহম্মদও আছেন।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, 'কোন দীন মুহম্মদ? সেই রাজাকারের রাজা দীন মুহম্মদ তো নয়?'

'হ্যাঁ, সেই দীন মুহম্মদ। তিনি পাশের কামরায় নামাজ পড়ছেন। এখনই এখানে আসবেন।'

বললাম, 'তবে উনি আসার আগেই আমাদের কথা শেষ হওয়া প্রয়োজন। ওর সামনে আমি খোলাখুলি কথা বলবো না। কেননা উনি পাকিস্তানের একজন বেতনভুক চর।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'নূরুল ইসলাম, তুমি এর মধ্যে জড়িত হতে গেলে কেন? শান্তিতেই তো ছিলে। বাংলাদেশ তো স্বাধীন হবেই। তারপর তুমি পরিগণিত হবে রাজাকার হিসেবে। আমি তোমাকে যতোটা জানি তুমি তো নিছক কিছুটা ভীতু, কর্তৃপক্ষ-ঘেঁষা ও ছা-পোষা গোছের লোক। তুমি তো রাজাকার নও। বরং তুমি নিজে ধার্মিক হলেও অসাম্প্রদায়িক। সমূহ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তুমি হিন্দু-মুসলমান রায়টের সময় দেবেশ ভট্টাচার্যের পরিবারকে মাসের পর মাস আশ্রয় দিয়েছো। তোমার শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী একজন স্বনামখ্যাত কবি। তা তুমি এই বিতর্কিত ব্যাপারে জড়িত হতে গেলে কেন?'

আমার কথা শুনে নূরুল ইসলাম কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'খলিল, তুমি তো জানো না ঢাকায় আমাদের অবস্থা কি? ছেলেপুলে নিয়ে বাস করি। কোনো নিরাপত্তা নেই। রাও ফরমান আলীর অবাধ্য হবো? সে সাহস আমি পাবো কোথায়? আমি পেলেও আমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ পাবে কোথায়? অতএব, যেতেই হবে জেনেভায়। অন্যথায়? না, আমি কল্পনাও করতে পারি না', বলে নূরুল ইসলাম কাঁদতে লাগলেন। আমার খুব মায়া লাগলো এই বিপন্ন লোকটির ওপর; কিন্তু কী-ই-বা করতে পারতাম তাঁর জন্য।

কিছুক্ষণ পরে অধ্যাপক ড. দীন মুহম্মদ এলেন ঘরে। নূরুল ইসলামকে কাঁদতে দেখে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেন; কিন্তু একটু পরেই স্বাভাবিক কণ্ঠে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। চোখে-মুখে দৃঢ়মনস্ক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির ছাপ। আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'পরিস্থিতি কেমন বুঝছেন?' উত্তরে বললাম, 'পরিস্থিতির সরেজমিনে তো আপনারা। অতএব, আপনিই বলবেন পরিস্থিতি কি। আমরা এতো দূরে থেকে পরিস্থিতি কি বুঝবো। তবে শুনেছি সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

'আমি তো তাই বলছি। কিন্তু আপনার এই বন্ধুটি আমাদের কথায় আস্থা আনতে পারছেন না। ভয় পাচ্ছেন। অনর্থক।'

বুঝলাম আমার বন্ধু নূরুল ইসলাম শক্তিমান লোকের খপ্পরে এবং তাঁকে উদ্ধার একটি অসম্ভব কর্ম। তাই তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে গেলাম।

তবে নূরুল ইসলাম উপাখ্যান এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যে, আমি যেন সাক্ষ্য দিই যে তিনি নিজের ইচ্ছায় জেনেভা যান নি। তা হলেই তিনি তাঁর পূর্বপদে বহাল হতে পারবেন। তিনি এটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দিনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। আমি সুপারিশও করেছিলাম। তবুও কাজ হয় নি।

তবে শেখ মুজিব সরকারের পতনের পর নূরুল ইসলাম রাজনীতিতে জড়িত হয়ে স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির সাথেই একাত্ম হয়েছিলেন। তখন মনে সন্দেহ জাগতো যে, নূরুল ইসলামকে জেনেভা পাঠানোর জন্য রাও ফরমান আলীকে হয়তো বেশি বেগ পেতে হয় নি।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে দুটি ভবিষ্যদ্বাণী

বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই এ বিশ্বাস আমাদের ছিল। কিন্তু রিয়াজ রহমান, কাইয়ুম চৌধুরী, নূরুল ইসলাম এঁদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা শুনে মাঝে মাঝে আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, কিছুটা হলেও, মনে ভয় ও আশঙ্কার উদ্রেক হতো না তা নয়। তবে দু'জন চিন্তাবিদের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে,

অন্তত আমার মনে সেই সময় পর্বতপ্রমাণ আশা ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হয়েছিল।

আমাদের বিজয়ের পরে একদিন আমি জেনারেল শওকত রেজার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে গিয়েছিলাম। পূর্বেই বলেছি যে, এই সুশিক্ষিত উচ্চমানের চরিত্রবান লোকটির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সাধারণতা ও সরলতা দেখে অভিভূত হয়েছি। তিনি অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো বাস করতেন। আসবাবহীন কামরাটির চারদিকে পুস্তকের অরণ্য।

সেদিন কথাবার্তার পরে যখন বিদায় নিতে যাবো তখন কোলাকুলির সময় তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বললেন, 'খলিল, যাও তোমার স্বাধীন মাতৃভূমিতে ফিরে যাও। একে গড়ে তোল। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। ওখানে কোনো প্রতিরক্ষার সমস্যা নেই বলে তেমন কোনো বৃহৎ প্রতিরক্ষা বাহিনীর কিংবা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত খরচের প্রয়োজনও নেই। অতএব, অতি শিগগিরই তোমরা অর্থনৈতিক উন্নতির দিক দিয়ে পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যাবে।'

শওকত রেজার এই কথাটির সাথে বাংলাদেশ সম্বন্ধে উপমহাদেশের আরেকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ভবিষ্যদ্বাণীও মনে পড়ে। তিনি 'সীমান্ত গান্ধী' হিসেবে খ্যাত প্রবীণ নেতা খান আবদুল গাফফার খান। সেই সময় কাবুলে স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে শুনে তিনি বলেছিলেন (আমি রেডিওতে শুনেছি), 'এই উপমহাদেশে একমাত্র বাংলাদেশেই নিখুঁত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে ও কার্যকর থাকবে।'

প্রতিভাবান ও প্রজ্ঞাবান এই দুই ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণী এখনও প্রায় প্রতিদিন আমার মনে পড়ে। তাঁদের কথা আংশিকভাবে সত্য হয় নি, একথা বলতে পারবো না। তবে পুরোপুরি সত্য হওয়ার জন্য এখনও এই তিন যুগ পরেও অপেক্ষা করে আছি। আমার বিশ্বাস দু'জনেরই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হবে। তবে কতো দিন লাগবে জানি না।

হিন্দুস্তানি কর্নেল

আগস্টের প্রথম দিকে করাচি গিয়েছিলাম, পূর্বেই বলেছি। ফেরার পথে আমার পাশে বসা নৌবাহিনীর উর্দি পরিহিত এক ক্যাপ্টেন অর্থাৎ কর্নেল। আমার পরনে সুট-টাই। আমি আর পরিচয় দিলাম না। বিমান উড়তে লাগলো। তিনি একটি টাইপ করা প্রতিবেদন বের করে পড়তে লাগলেন। পরে বুঝলাম প্রতিবেদনটি তাঁরই লেখা, তিনি সেটার প্রুফ দেখছেন। তিনি পড়ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আড়চোখে আমিও পড়ছিলাম। প্রতিবেদনটি ছিল 'অতীব গোপনীয়' ছাপ

দেয়া। অতএব, আমার আগ্রহ সমধিক।

প্রতিবেদনটি বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক কার্যক্রম সম্বন্ধে। প্রথম অর্ধেকাংশে সমস্যাটি কীভাবে শুরু হলো তার বিস্তারিত বিবরণ, অতঃপর আলোচনা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া, সমস্যাটি যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং সমাধানও যে রাজনৈতিকভাবে এসব বিষয় অত্যন্ত সঠিকভাবে লেখা। কিন্তু শেষ অধ্যায়ে গিয়ে অনেকটা অসঙ্গতভাবেই উপসংহার, 'যেহেতু শেখ মুজিব দেশপ্রেমিক নন, বরং তিনি দেশকে দু'ভাগ করতে চেয়েছিলেন, এমতাবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আঘাত হানা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।' প্রথমার্থে আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের দ্বারা বিহারিদের ওপর আক্রমণ পরিচালনার কথাও ছিল। তবে বিহারিরা যে বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করছিল সেটাও লেখা আছে। উপসংহারটি ছাড়া বাকি প্রতিবেদন অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ।

পড়া শেষ হলে ক্যাপ্টেন আমার দিকে তাকিয়ে আমার সাথে পরিচয় করলেন। আমার সামরিক চাকরি ও পদবি শুনে অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন। তিনি তখনও বুঝতে পারেন নি যে আমি বাঙালি। বাঙালি আবার ব্রিগেডিয়ার হয় কী করে? তেমন সন্দেহ চট করে জাগে না। আমি বুঝলাম ক্যাপ্টেন হিন্দুস্তানি, হতে পারে বিহারি এবং সামরিক বাহিনীর গণপ্রচার বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। হয়তো প্রতিবেদনটি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিংবা জেনারেল হামিদের অফিসের জন্যই তৈরি। মনে হলো নির্দেশ এসেছিল পূর্ব পাকিস্তানে আর্মি অ্যাকশন, তৎপরবর্তী অবস্থা, জনগণের মনের ওপর প্রতিক্রিয়া, পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে হতে কতোদিন বাকি ইত্যাদি খবর চেয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নের। এ সবগুলোর উত্তর প্রতিবেদনটির উপসংহারে বলা আছে। পূর্ব পাকিস্তান ধরতে গেলে স্বাভাবিক আছে, কেবল দু'এক জায়গায় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা হিন্দুদের (যারা মূলত ভারতীয় চর) নিয়ন্ত্রণে কিছু কিছু গোলমাল করছে। তবে দেশপ্রেমিক বাঙালিরা (অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামীর গোলাম আজম গং) ওদেরকে সফলভাবে মোকাবিলা করছে।

প্রতিবেদনটি পড়ে (যদি পড়ার সময় হয়) ইয়াহিয়া খান কিংবা হামিদ খান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁদের 'ব্ল্যাক ডগ' নামক প্রিয় হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেবেন এবং প্রতিবেদকের প্রতি ভবিষ্যতে সুনজর রাখবেন।

আমি ক্যাপ্টেনের (সেনাবাহিনীর কর্নেল পদমর্যাদাসম্পন্ন) সাথে গল্প জমাবার জন্যই পরিচয় দিলাম যে, আমি বাঙালি। তাতে ক্যাপ্টেন কিছুটা আশ্চর্য হলেও চিন্তিত হলেন না—বোধহয় এই ভেবে যে, যে অফিসারটি বাঙালি হয়েও পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে এতোটা ঊর্ধ্বপদে উন্নীত হতে পেরেছেন, তিনি নিশ্চয়ই 'দেশপ্রেমিক' (অর্থাৎ অখণ্ড পাকিস্তানপ্রেমিক) হবেন।

নানা কথার পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রসঙ্গ উঠলো। আমার অনুমান সঠিক প্রমাণিত হলো যে, অফিসারটি বিহারি। ওঁর সাথে কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না। তবে সময় কাটানোর জন্য অনেকটা কৌতুকভরেই তাঁকে বললাম যে, বাঙালিরা মুসলমান হলেও হিন্দুদের প্রভাবে দেশপ্রেমিক না হয়ে, হয়ে গেছে পথভ্রষ্ট। এর মধ্যে বাস করে মুষ্টিমেয় বিহারি। অনেকটা যেমন মাছ হয়ে কুমিরের সাথে বসবাস করার মতো। বাঙালি তো এবার শায়েস্তা হয়েই গেছে; কিন্তু ভবিষ্যতেও তো এরা বিহারিদের আপন ভাববে না। বিহারিরাও তো নিজেদের আলাদা সংস্কৃতি ভুলে বাঙালিদের সাথে মিশে যাবে না। এমতাবস্থায় এইসব বিহারির জন্য পূর্ব পাকিস্তানে থাকা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না কি?

আমার কাছ থেকে এমন উটকো প্রশ্ন ক্যাপ্টেন ঠিক আশা করেন নি। তবে হঠাৎ যেন চিন্তিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'প্রশ্নটি আমার মনেও যে আসে নি তা নয়।' আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি মনে হয়?'

বললাম, 'উত্তরটা জানি না বলেই তো তোমাকে জিগ্যেস করলাম। সবচাইতে বড় মুশকিল এই যে, এরা বাস করে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ বাংলাদেশে অথচ মনেপ্রাণে হতে চায় পাঞ্জাবি কিংবা পাঠান। বর্তমানে পাঞ্জাবিরা এদেরকে সাদরে কাছে টেনে নিয়েছে। কিন্তু মূলত তো পাঞ্জাবিরা এদের গ্রহণ করবে না, উর্দু ভাষাভাষী হলেও। কারণ এরাও তো বাঙালিদের মতো, অতো কালো না হলেও কালোই এবং ক্ষুদ্রাকৃতিরই। এদিকে টাকা পয়সা ও শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়েও এরা গুরুত্বপূর্ণ নয়। পশ্চিম পাকিস্তান পশ্চিম হিন্দুস্তানের কিছু অংশের লোককে বাস্তুহারা হিসেবে গ্রহণ করেছে; কিন্তু দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব-ভারতীয় মুসলমানদের পশ্চিম পাকিস্তানে ঢুকতে দেয় নি দেশভাগের পরও। ভবিষ্যতেও ঢুকতে দেবে না বলে আমার বিশ্বাস।' এ কথা বলে ক্যাপ্টেনের মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করে থাকলাম।

ক্যাপ্টেনকে যেন আরও চিন্তিত মনে হলো। বললেন, 'আপনার কথাগুলোর মধ্যে সত্যতা আছে। এ সত্যগুলো কেবল আপনি নন, আমরাও বাস্তব জীবনে দেখেছি। এরা অর্থাৎ পাঞ্জাবি, পাঠানরা তো আমাদের নিজেদের সমকক্ষ ভাবে না। হ্যাঁ, তাই ভাবছি এই সমস্যাটি সমস্যা হিসেবে থেকে যাবে। তাই না?'

ততোক্ষণে আমাদের বিমান পিণ্ডির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এদিকে আমার কৌতুক স্পৃহাও শেষ হয়ে গেছে। তাঁকে বললাম, 'আমি যতো দূর জানি পূর্ব পাকিস্তানের বিহারিদের কোনো প্রজ্ঞাবান নেতা নেই। থাকলে তিনি বোঝাতেন যে, হয় সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সকলকে উর্দুভাষী, দেশপ্রেমিক মুসলমান করে ফেল। আর তা যদি তোমাদের সাধ্যে না কুলোয় তবে ওদের সাথে মিশে

যাও। কারণ ধনী ও শক্তিশালী ব্যক্তি ভাষার দিক দিয়ে তোমার যতো আত্মীয় হোক না কেন, সে তোমাকে তার ঘরে ঢুকতে দেবে না।'

পিণ্ডি এসে পড়ায় কথা আর এগোয় নি। আমরা বিদায় নিলাম। পরে এই ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা হয়েছে। মনে হয়েছে তিনি আমার সঙ্গে আরো আলাপ করতে চান; কিন্তু আমি এড়িয়ে গিয়েছি।

উপ-সেনাপ্রধান আবদুল হামিদ খানের সাথে সাক্ষাৎ

আগস্ট মাসে একটি বিজ্ঞপ্তি পেলাম যে, উপ-সেনাপ্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান সেনাসদরের সব ডাইরেক্টরের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। উদ্দেশ্য তাঁদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও নিজ নিজ বিভাগীয় দক্ষতার উন্নয়নের দিকনির্দেশনা প্রদান। আমার জন্য একটি দিন-তারিখ ধার্য করা আছে। আমার তো বিশেষ কোনো কার্যক্রম নেই। অতএব, ভেবেই নিলাম যে, আমার সাথে আলোচনা পেশাগত দিকে বিশেষ ঘেঁষবে না, মোড় নেবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির দিকে।

নির্ধারিত দিন ও সময়ে উপস্থিত হলাম। অনেকক্ষণ বিভিন্ন কথাবার্তার পর উঠলো পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে আলোচনা। আমি মনে মনে অনেকটা প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। ইয়াহিয়া খান ছিলেন প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান। ব্যক্তিগতভাবে তিনি মেধাবী অফিসার হিসেবে খ্যাত ছিলেন; কিন্তু ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসক হওয়ার পর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রক্ষমতা তাঁর হাত থেকে চলে যেতে থাকে। যে গ্রুপটি এই ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকে তাদেরকে সবাই বলতো পাঞ্জাবি গ্রুপ। এই গ্রুপের নেতা ছিলেন জেনারেল হামিদ খান। তবে এর সদস্যরা সবাই পাঞ্জাবি ছিলেন না। এই দলে ছিলেন সর্ব-জেনারেল পীরজাদা, আবু বকর মিঠ্‌ঠা, খুদাদাদ, ওমর প্রমুখ। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা পছন্দ করতেন কিন্তু সেই সাথে শরাব ও মেয়েমানুষও কম পছন্দ করতেন না। এই সুযোগ নিয়ে হামিদ গ্রুপ আসল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও প্রয়োগ করতে থাকেন। যখন হামিদ খানের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে তখন তিনি রাষ্ট্রক্ষমতার অনেকটার অধিকারী। অতএব, আমি স্থির করলাম যে, এমনি শেষ মুহূর্তেও যদি এই ক্ষমতাধর জেনারেলকে বোঝাতে পারি পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাটি রাজনৈতিক, সামরিক নয়, তাহলে হয়তো রক্তপাত বন্ধ হলেও হতে পারে।

আলোচনার গতি-প্রকৃতি নিয়ে আমার অনুমান ঠিক প্রমাণিত হলো। তিনি মিনিটখানেক আমার বিভাগ সম্বন্ধে আলাপ করার পরই চলে গেলেন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যায়। যা বললেন তার সারাংশ হলো নিম্নরূপ : পূর্ব

পাকিস্তানের সমস্যাটি সৃষ্টি করেছে ভারত। ভারতের উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা, সেই লক্ষ্যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধ বাধিয়ে রেখেছে। তবে বর্তমানে সব আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে; কিন্তু মনে হয় ভারত অতো সহজে ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই বাধবে। যুদ্ধ যদি হয় তবে এবার ভারতকে আমরা উচিত শিক্ষা দেবো। পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে ভারতের এতো বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নেবো যেন ভারত শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় আমাদের সাথে সন্ধি করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে।

এই কথাগুলো সবিস্তারে বলতে হামিদ খানের মিনিট বিশেক লাগলো। আমিও চুপ করে শুনে গেলাম। অপেক্ষা করছিলাম তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চান কি না। তাঁর কথা শেষ হলো। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি মনে হয়।'

বললাম, 'স্যার, এতোক্ষণ আপনি ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ, তার প্রকৃতি ও আকৃতি, অন্তিম ফলাফল কেমন হবে এসব নিয়ে বললেন। এসব বিষয়ে আমি আপনার সাথে একমত। আপনার অভিজ্ঞতার সাথে আমার অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না। তাই আমি আপনার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। সর্বক্ষণই আপনি দুটি প্রতিপক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ দিয়েছেন; কিন্তু এতে যে আরও একটি পক্ষ অর্থাৎ ফ্যাক্টর আছে তা একবারও বলেন নি। সে পক্ষটি পূর্ব পাকিস্তান এবং তার অধিবাসীবৃন্দ, বাঙালি। আপনার এই যুদ্ধ পরিস্থিতির আলোচনাতে সেই ফ্যাক্টরটি কি ধর্তব্যের মধ্যে নেই। পাকিস্তান এবং ভারত এই দুটিই কেবল ফ্যাক্টর। বাঙালির মনোভাব কি এর মধ্যে কোনো ফ্যাক্টর নয়?'

মনে হলো হামিদ খান এই প্রশ্নটির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, অথচ আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে রেখেছি পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা ও তার বাস্তবসম্মত সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টা।

হামিদ খান আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন যে, আমি এ সম্বন্ধে কি বলতে চাই। আমি জানতে চাইলাম, পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যেসব খবর পান তা যে সঠিক এ কথাটা তাঁরা কীভাবে যাচাই করেন। আমার তো মনে হয় সব খবরই একতরফা। কর্তৃপক্ষ যা শুনতে চান তাই তাদেরকে শোনানো হয়। হয়তো সত্য তা থেকে বহু দূরে।

স্বাভাবিকভাবেই হামিদ প্রশ্ন করলেন, আমি কীভাবে জানি যে কর্তৃপক্ষের প্রাপ্ত সব খবর সঠিক নয়। তখন আমি একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। প্রথমেই বললাম যে, কর্তৃপক্ষকে দেয়া খবরগুলোতে কোনো বাঙালির পক্ষ থেকে দেয়া খবর নেই। বাঙালির আসল মনোভাব ও অনুভূতি তো বাঙালি ছাড়া কারও পক্ষে সম্যকভাবে জানা ও অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

অথচ খবর প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে কোনো বাঙালি নেই। এই বলেই উদাহরণটি দিলাম।

বললাম, 'ধরুন একজন বাঙালি ও একজন পাঞ্জাবি কিংবা বিহারি অফিসার এক হেলিকপ্টারে করে উড়ে যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের ওপর দিয়ে। বেশ নিচু দিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা দেখল নিচে এক নির্জন এলাকায় একজন লোক একটি মেয়েকে ধর্ষণ করছে। তাঁরা উভয়ে স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখলো। তাঁরা ফিরে এসে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটি সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করবে। সেখানে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পাঞ্জাবি কিংবা বিহারি অফিসারটি জানাবে যে, একজন বিহারি মহিলাকে একজন বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত হতে আমি নিজ চোখে দেখে এলাম। এদিকে বাঙালি অফিসারটি তার প্রতিবেদনে লিখবে যে, সে নিজ চোখে দেখেছে যে একজন বাঙালি মহিলাকে একজন বিহারি কিংবা পাঞ্জাবি ধর্ষণ করছে। তাই না?'

মনে হলো হামিদ খান কিছুটা বিব্রতবোধ করলেন। হয়তো-বা ঠিক এভাবে আগে চিন্তা করেন নি। অতএব, সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও কিছুটা বিচলিত হলেন; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ পূর্ব-নির্ধারিত বিশ্বাসে অনড় থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস যুক্তিতর্ক দিয়ে পরিবর্তন করা যায় না। এক্ষেত্রেও সেই সত্যের ব্যতিক্রম হলো না।

হামিদ খান যা বললেন তার মর্মার্থ এই যে, মুশকিল তো এখানেই, বিশ্বাসযোগ্য ও প্রবীণ কোনো বাঙালি অফিসার এ কাজের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও আমি যখন বলছি তখন তিনি চেষ্টা করবেন এমন কোনো বাঙালি অফিসার পাওয়া যায় কি না; কিন্তু সেই বাঙালি অফিসারকেও তো দেশপ্রেমিক ও চরিত্রবান হতে হবে। বুঝতে বাকি রইলো না এর অর্থ কর্তৃপক্ষের হ্যাঁ-এর সাথে সুর মেলাবার মতো হতে হবে।

এ কথা শোনার পর আমার আর সন্দেহ রইলো না যে, বাংলাদেশের ওপর নির্মম সামরিক আঘাত পাঞ্জাবি সামরিক কর্তৃপক্ষের পূর্ব পরিকল্পিত, তা বদলাবার নয়। সবচাইতে বড় কথা, আমার পুনরায় মনে পড়লো, লারকানা ষড়যন্ত্রের একজন অংশীদার তো এই হামিদও ছিলেন। অতএব, আমাদের দেশের প্রস্ফুটোন্মুখ নবীন গোলাপগুলোর অকালে দলিত হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

জানতাম বিজয় ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। তবে তার জন্য যে বিপুল মূল্য দিতে হবে সেটা কোনোভাবে যদি কমানো যেতো! এছাড়া আরও মনে পড়লো, ১৭ জানুয়ারির লারকানা ষড়যন্ত্রে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ছিলেন হামিদ খান। তিনি তো মনস্থির করে আছেন যে, বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না।

হামিদের অফিস থেকে কুশল বিনিময় করে বিদায় নিলাম। ততোক্ষণে আমি ভালোভাবে বুঝতে পারলাম শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানে নেমেছে এই পরিকল্পনা করেই যে আঘাত এমন হবে যেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক কি দুই প্রজন্মের বাঙালি মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং মিশেই থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তারা যেন কখনো কোনো মাথাব্যথার কারণ না হয়। সেই প্রধান পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে হামিদও একজন। অতএব, তাঁর পক্ষে অন্য কথায় কান দেয়া সম্ভব নয়।

সেকেন্ড বেঙ্গলের অস্ত্রমোচন প্রচেষ্টা ও ব্রিগেডিয়ার ইসহাক

একদিন রাওয়ালপিণ্ডিতে আমার ঝিলাম রোডের বাসায় বসে আছি। সন্ধ্যা সাতটা। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। এমন সময় গেট খুলে এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। আমার অ্যালসেশিয়ান কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। কুকুরটিকে আমার এক বন্ধু মিলিটারি 'ডগ সেন্টার' থেকে খানদান দেখে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক, কুকুরটি ছিল বুদ্ধিমতি। আগন্তুকের চেহারা দেখে বুঝে নিতে পারতো হালচাল। অতএব, ঘেউ ঘেউ করেই আমার বারান্দার দিকে তাঁকে নিয়ে এলো। লোকটিও সাহসী। পাহারাদার কুকুরকে ভয় পান না। সিভিল পোশাক পরিহিত, মাথায় পাঠান টুপি। কাছে এলে চিনতে পারলাম আমাদের অনেক সিনিয়র ও অনেক শ্রদ্ধেয় দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের পুরনো দিনের অধিনায়ক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার) ইসহাক। সেকেন্ড বেঙ্গলকে সামরিক দক্ষতার দিক দিয়ে পাকিস্তানের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যাটালিয়নে পরিণত করার জন্য অধিনায়ক ইসহাকের অবদান হয়তো সর্বাধিক। স্বভাবতই নিজের হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যেক সৈনিকই তাঁর কাছে পুত্রতুল্য।

আমি চট্‌ করে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে সানন্দে অতিথিকে স্বাগত জানালাম।

এদিকে ইসহাক এসেই বকুনি, 'ইয়ারা খলিল তু ক্যায়সা আদমি হ্যায়? গেট কা সামনে রাখ্‌খা হুয়া এক বেওকুফ পাঞ্জাবি সিকিউরিটি। উসকা সওয়াল, 'ম্যায় কোন হুঁ'। ম্যায়নে ভি জওয়াব দিয়া 'ম্যায় তেরা বাপ হুঁ'। উসকা বাদ গেট কা আন্দর তেরা কুত্তা। লেকিন তেরা কুত্তা বেতমিজ নেহি হ্যায়। হামলা নেহি কিয়া।'

আমি যেমনি সম্মানিত বোধ করছি তেমনি অভিভূত, কী করে এই অতিথিকে আপ্যায়ন করা যায়। জিগ্যেস করলাম তিনি কি জন্য আমার প্রতি এতোটা দয়াপরবশ এবং কি করে আমার বাসার সন্ধান পেলেন? পরিচারককে বললাম চা দিতে। ব্রিগেডিয়ার ইসহাক বসলেন। কুশল বিনিময়ের পর বললেন, তিনি

এসেছেন আমাকে একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করতে। প্রশ্নটি করার জন্য তাঁর গ্রামের বাড়ি ঝিলাম জেলা থেকে ছুটে এসেছেন, তাই প্রশ্নটি তিনি আমাকে শুরুতে সরাসরি করবেন। আরও বললেন যে, তিনি প্রশ্নটির সোজাসুজি সঠিক উত্তর আমার কাছে চান। আবারও সাবধান করে দিলেন যে উত্তরটা যেন সঠিক হয়।

ততোক্ষণে চা এসে গেছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'খলিল সঠিক বল যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কি আমার গড়া পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ব্যাটালিয়ন সেকেন্ড বেঙ্গলের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদেরকে নিরস্ত্র করতে গিয়েছিল? সোজাসুজি বলো, হ্যাঁ কি না।'

বললাম, 'অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি উত্তর হলো, হ্যাঁ। তারা আপনার সেকেন্ড বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করতে গিয়েছিল।' জবাব শুনে ব্রিগেডিয়ার ইসহাক যেন থ খেয়ে গেলেন। বললেন, 'হারামজাদেঁ, 'আমি তাইতো বলি আমার সেকেন্ড বেঙ্গল বিদ্রোহ করতে পারে না। নিশ্চয়ই এমন কিছু করা হয়েছে যাতে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছে। জান তো একজন সৈনিককে নিরস্ত্র করা এবং একজন মহিলাকে বিবস্ত্র করা একই কথা। এরপরও তার কাছ থেকে তুমি কীভাবে আনুগত্য আশা করো?' আমি জানতাম এ প্রশ্নটি ব্রিগেডিয়ার ইসহাক আমাকে করেন নি এবং এর উত্তরও তিনি আমার কাছে চান নি। তাই চুপ করেই থাকলাম।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা খলিল তু বাতা, আমাদের সুবেদার আইয়ুবের (পাঞ্জাবি) পরিবারকে হত্যা করেছে কে? আমাদের জওয়ানরা?'

ঘটনাটি আমি শুনেছিলাম। ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানযেব আরবাব ১৯ মার্চ ঢাকা থেকে ২০ মাইল দূরে জয়দেবপুরে অবস্থিত সেকেন্ড বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করতে যান। তার সঙ্গে ছিল ঢাকার আর্টিলারি ফিল্ড রেজিমেন্টের প্রায় শ'দুয়েক সৈন্য ও তার ব্রিগেড সদর দফতরের অফিসারগণ এবং যথেষ্ট পরিমাণ ভারি অস্ত্রশস্ত্র। তখনকার রাজনৈতিক হাওয়া ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত। সেনাবাহিনীর প্রতিটি পদক্ষেপই আশপাশের গ্রামের লোক এবং রাজনৈতিক কর্মীরা অনুসরণ করতো ও জানতো। তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধও ছিল। বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করা হবে এ কথাটা বাঙালি গ্রামবাসী যেমন জানতো তেমনি বাঙালি সৈন্যরাও অনেকটা অনুমান করতো। এদিকে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কর্তৃপক্ষের হুকুম অনুযায়ী সব সৈনিক তাদের অস্ত্রগুলো, অস্ত্রখানায় না রেখে হাতে নিয়ে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতো। তাদেরকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র করা সহজ ছিল না।

আরবাব দেখলেন দ্বিতীয় বেঙ্গলেরও অনুরূপ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। দেখে জাহানযেব আরবাব আর দ্বিতীয় বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করতে সাহস না পেয়ে ফিরে

আসেন। তাদের ফেরার পথে স্টেশনের কাছে গ্রামবাসী রেল ক্রসিংয়ে দুটি খালি মালবাহী বগি ঠেলে এনে রোড ব্লক তৈরি করে। দ্বিতীয় বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন বাঙালি, কর্নেল মাসুদুল হোসেন খান। তাঁকে হুকুম দিলে তিনি বাঙালি সৈনিকদের দ্বারাই ধাক্কা দিয়ে এই রোড ব্লকটি পরিষ্কার করিয়ে দিতে পারতেন। বস্তুত কর্নেল মাসুদ সেটা করার জন্য প্রস্তুতও হচ্ছিলেন। এমন সময় আরবাব গর্জে উঠলেন, 'এদের ওপর গুলি চালাও, মাসুদ শুনতে পাচ্ছো না? গুলি চালাও।' মাসুদ তবুও আরবাবকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, এই তুচ্ছ কারণে গুলি চালানোর প্রয়োজন নেই। এতে হিতে বিপরীতও হতে পারে; কিন্তু আরবাবের তর্জন-গর্জন থামে না। অগত্যা গুলি চালানো হলো, কতিপয় গ্রামবাসী নিহত হলেন, পালটা গুলিও আসতে লাগলো। অবশেষে এই মোটা বুদ্ধি ও চরম বাঙালি-বিদ্বেষী আরবাব নানাভাবে হেনস্তা হয়ে ঢাকা ফেরেন। কিন্তু নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে ঘটা অঘটনের সমস্ত দায়দায়িত্ব তিনি দ্বিতীয় বেঙ্গলের অধিনায়ক কর্নেল মাসুদুল হোসেন খানের ওপর চাপিয়ে তাঁকে কৌশলে ঢাকা সদর দফতরে ডেকে নিয়ে বন্দি করেন। অতএব, দ্বিতীয় বেঙ্গলের সৈনিকদের ব্রিগেডিয়ার আরবাব তথা পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর কোনো আস্থা ছিল না।

তাই যখন তারা শুনতে পেল যে পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় নিরস্ত্র জনতার ওপর ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ও কাপুরুষোচিত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তখন তারা অনেকটা একত্রে টাঙ্গাইল হয়ে ময়মনসিংহের দিকে যাত্রা করে এবং পাকিস্তানি ঘাতকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে পায় নি। সুবেদার আইয়ুবের পরিবার দ্বিতীয় বেঙ্গলের আবাস থেকে বাইরে সংলগ্ন গ্রামের কোনো বাসায় থাকতো। ঐ পঁচিশে মার্চের রাতে চরমভাবে উত্তেজিত গ্রামবাসীদের দ্বারা ঘেরাও বাসা থেকে আইয়ুব নিজে পালিয়ে বেঁচেছেন; কিন্তু তাঁর পরিবার বাঁচতে পারে নি। এটা খুবই সম্ভব যে, চরমভাবে উত্তেজিত গ্রামের লোকেরা এদেরকে হত্যা করেছে।

এইসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে ব্রিগেডিয়ার ইসহাককে বললাম।

বিদায় নেয়ার সময় অতীব বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে তিনি বলতে লাগলেন, 'হারামজাদোঁনে হামারা পাকিস্তানকো খতম কর দিয়া, খতম কর দিয়া।'

কোনো পাঞ্জাবির মুখে আমি এই প্রথম শুনলাম যে, পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে। আর এই 'শেষ' করার কাজের জন্য দায়ীও পশ্চিম পাকিস্তানিরা।

ব্রিগেডিয়ার ইসহাক তাঁর প্রিয় পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য যেসব পাকিস্তানিকে দায়ী করেছেন এবং তাদেরকে (তাঁর ভাষায়) 'বেজন্মা' বলে আখ্যায়িত করেছেন এদের অনেকেই পরে পাকিস্তানে পদোন্নতি লাভ করেছে।

ব্রিগেডিয়ার জাহানাযেব আরবাব, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর কমান্ডে, ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরকে শ্মশানে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এরা দু'জন ও টিক্কা খান 'ঢাকার কসাই' বলে কুখ্যাত। অথচ এদের তিনজনকেই ঢাকার হাজার হাজার নিরস্ত্র মুসলমান অধিবাসীকে কামান দাগিয়ে দোজখে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান পরবর্তীকালে পুরস্কৃত করেছে। টিক্কা হয়েছে সেনাবাহিনী প্রধান, আরবাব হয়েছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর ফরমান আলী বন্দিশিবির থেকে ফিরে গিয়ে সমরবাহিনীতে উচ্চপদস্থ বেসামরিক চাকরি নিয়ে নিজেকে পূর্ব পাকিস্তানের পরম বন্ধু ঘোষণা করে বই লিখেছেন। জে. এন. দীক্ষিতের লেখা বইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী এই ফরমান আলী ভারতে যাওয়ার সময় বিমানে উঠেছে এই বলে যে, বাঙালি জাতি হিসেবে অকৃতজ্ঞ। অথচ এই রাও ফরমান আলীই আমাদের গোলাম আজম ও বিহারিদের দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করিয়েছে। অপরদিকে এই নৃশংসতা ও দেশ ভাঙার জন্য দায়ী প্রধান ব্যক্তি জুলফিকার আলী ভুট্টো ইসলামিক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের 'ফোর্ট্রেস ডিফেন্স'

সেপ্টেম্বর মাসের দিকে, মংলার ১ নং কোরের অধিনায়ক আমার পুরোনো কমান্ডারের টেলিফোন পাই। 'আমি অমুক মেসের ভি আই পি কামরায় আছি। পিণ্ডি এসেছি কাজে। আজকের রাতই থাকবো। এসো না গল্প করা যাক।' তখনও আমার পলায়ন তৎপরতা ধরা পড়ে নি। ঠিক হলো রাতে খাওয়ার পর যাবো। গেলাম। গল্প শুরু হলো। যা অনুমান করেছিলাম—তাই। আলোচনার বিষয় দাঁড়ালো পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা। এবার মনে হলো ২৯ মার্চের তুলনায় ইরশাদ সাহেবের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই কম।

অসমসাহসী পাকিস্তানি সামরিক যোদ্ধারা ঠিক ভাবতে পারে নি যে, আওয়ামী লীগকে শায়েস্তা করার 'কর্তব্য' করতে গিয়ে, শক্তিতে দ্বিগুণ ভারতীয় বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে পড়তে হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে সেই আশঙ্কাই অবশ্যম্ভাবী রূপ নিয়ে সত্য হয়ে উঠছে প্রতিদিন। কেবল জেনারেল ইরশাদ কেন, আরাম-আয়েশের জীবনে অভ্যস্ত সব জেনারেলই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম যুদ্ধ লাগলে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর জন্য কতোটা ক্ষতিকর হবে কিংবা হওয়ার ক্ষমতা রাখে, সে সম্বন্ধে আমার মতামত এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনায় আমার মন্তব্য ও পরামর্শ গ্রহণই এই আলাপের উদ্দেশ্য।

পূর্বেই বলেছি, আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের বাইরেও আমাদের দু'জনের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইরশাদ আমাকে স্নেহ করতেন। সেটা বুঝে আমিও তাঁর মনে আঘাত দেয়া থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতাম। সত্য কথা যে বলতাম না তা নয়, কিন্তু সত্যটিকে তিক্ত করে বলতাম না। তবে আজ বিপদ গুণলাম। কারণ আমার কথা তো একটাই এবং তা অত্যন্ত সহজ ও সরল। পাকিস্তানকে দু'ভাগ করে, ভারতের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হোক, আর এক কোটি না হোক অন্তত পঞ্চাশ লক্ষ বাস্তুহারাকে বছর ধরে পালনের ক্ষমতা ভারত কেন, বিত্তশালী দেশের পক্ষেও অসম্ভব বলেই হোক, ভারতকে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়তে হবে। আর যুদ্ধ হলে ফল অনিবার্য। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম সাহসী পাকিস্তানি সৈন্যরা নিজেদের মাতৃভূমিকে হারাতে বসবে। আর পূর্ব পাকিস্তান? ভারত দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে ঢাকার পতন কেবল সময়ের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। দিনে ভারতীয় বিমানবাহিনী আর রাতে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও নড়তে দেবে না। আর নড়াচড়ার অক্ষমতা মানেই তো মৃত্যু।

কিন্তু এ কথাটি জেনারেল ইরশাদকে তো বলা যায় না। তিনি মনে আঘাত পাবেন। অতএব, নানা রকম ধানাই-পানাই গল্প চলতে লাগলো পূর্ব পাকিস্তান ও মুক্তিবাহিনী সম্বন্ধে, যেসব কথা সবাই জানে, সেগুলো বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে লাগলাম। হঠাৎ ইরশাদ একবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, সিদ্দিকী না কি নামের যে একটি সন্ত্রাসী দল আছে, তারা কোথায় তাদের কার্যক্রম চালায়?' বললাম, 'টাঙ্গাইলে মধুপুর নামক একটি জঙ্গল আছে, সেইখানে।'

'আচ্ছা মধুপুর জঙ্গলটি কি উত্তরে গারো পাহাড়ের জঙ্গলের সাথে গিয়ে মিশেছে।'

'না স্যার, জঙ্গলটি একটি দ্বীপের মতো। চারদিকে বিস্তীর্ণ লোকালয়।'

'আল্লাহকে শুকুর, ভারতীয় দুষ্কৃতকারী এখানে ঢুকতে পারবে না, আর এরাও ভারত থেকে গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র আনতে পারবে না।'

আমি ভেবে অবাক হলাম যে, এতো উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল অফিসারও পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে কতোটা অজ্ঞ। তিনি জানেন না যে, এই ভাদ্র মাসে সেখানে নৌকায় করে যথাখুশি যাওয়া যায়। আর গ্রামের প্রতিটি মানুষ সপক্ষে বলে মুক্তিযোদ্ধারা পানির ভেতর মাছের মতো সর্বত্রই নিরাপদ। তাই ভারত থেকে রসদ আসার পথ অসংখ্য ও সর্বত্রই।

তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। টেলিফোন এলো। এরশাদই ধরলেন। 'না বহিন, আপনার স্বামী বহাল-তবিয়তে এখানে আছেন। অনেকদিন পরে দেখা। তাই কিছু গল্পসল্প করছি। না বেশি দেরি হবে না। তবে আরও আধ ঘণ্টা। ঘণ্টাখানেক দেরি হলেও চিন্তিত হবেন না। ঘণ্টাখানেক পরে আসবেন।

আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। এই নিন কথা বলুন ওর সাথে।' এই বলে টেলিফোন আমার হাতে দিলেন ইরশাদ। পূর্বেই বুঝেছি, টেলিফোনটি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে। তিনি নিশ্চয়ই ভাবছেন আমাকে আটকে জেলে পুরে দিলো না তো? তখন দিনকালও এমনি ছিল যে, ভয়ে মন সর্বদাই সঙ্কুচিত থাকতো। তবে আমার স্ত্রীও ইরশাদ দ্বারা আমার কোনো বিপদ হবে এ আশঙ্কা কমই করতেন। তাই সংক্ষেপে বললেন, 'যতো তাড়াতাড়ি পারো এসে যাও। এতো রাত পর্যন্ত কিসের গল্প?' সেদিন ফিরতে ফিরতে রাত একটা হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু আমার স্ত্রী আর টেলিফোন করেন নি।

'আচ্ছা খলিল, এবার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে তোমাকে দু'একটা প্রশ্ন করবো। হ্যাঁ ভালো কথা। তোমার জন্য একটি সুখবর আছে। জানো তো আমাদের সেনাসদর (জিএইচকিউ) লাহোর সীমান্তের অমুক চরের (নামটি এখন আর মনে নেই) আক্রমণ সম্বন্ধে তোমার সংশোধনী প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে এবং আমাদের 'কোর'-কে 'শাবাশ' জানিয়েছে। আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে 'শাবাশ' জানিয়েছে।'

ঘটনাটি এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, তবে পাঠকের কৌতূহল মেটাতে ব্যাপারটি অতি সংক্ষেপে বলি। ১৯৭০ সালের ঘটনা। আমাদের কোরের দায়িত্ব ছিল একমাত্র সিন্ধু প্রদেশ ব্যতীত উত্তরের সমগ্র পাক-ভারত সীমান্তের প্রতিরক্ষা। আমার দফতরের দায়িত্ব ছিল এই প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা হালনাগাদ করে সংরক্ষণ করা। ঐ হালনাগাদ করতে গিয়ে নজরে পড়লো যে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে লাহোরের কাছে ইরাবতী নদীর একটি বিস্তীর্ণ চরভূমি ভারত কর্তৃক সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। এই খবরটি জেনে পাকবাহিনী তখন তাদের প্রথম আক্রমণে ঐ এলাকাটি দখল করে নেয় এবং এই প্রাথমিক বিজয়কে অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার করে। ওখানকার রেলস্টেশনে হিন্দিতে লেখা নাম, গ্রামগুলোর নাম টেলিভিশনে দেখিয়ে একদিকে যেমন নিজের দেশবাসীর কাছ থেকে বাহবা কুড়িয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় নাগরিকদের কাছে ভারতীয় সৈনিকদের কিছুটা হলেও, মাথা হেঁট করিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। অতএব, এই বাহাদুরি আগামী যুদ্ধের প্রথম রাতেও করা হবে। এই অনুযায়ী যুদ্ধ পরিকল্পনাতে লাহোর পদাতিক ডিভিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পরিকল্পনাটি পড়ে আমার মনে হলো গতবার ভারত যেখানে মার খেয়েছে এবার সেখানে তার প্রতিরক্ষাটি বিশেষভাবে দৃঢ় করার কথা। এটা সাধারণ অনুমানের ব্যাপার। অতএব, আমার মনে হলো যে, সম্ভাব্য মজবুত ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংবলিত স্থানটিতে প্রথম রাতেই আমাদের একটি মূল্যবান ব্রিগেডকে আক্রমণ করতে বলা মানে তো ব্রিগেডটির আত্মহত্যা করার শামিল। হ্যাঁ, হতে পারে স্থানটি ১৯৬৫ সালের মতো অরক্ষিত এবং আমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

কিন্তু তা হলেও তো গতবারের মতো আমাদের বিজয় প্রচার হবে মাত্র দু'চার দিনের জন্য। তারপর তো যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে 'বিজয় প্রচার' ইত্যাদি। অথচ যদি ভারতীয় প্রতিরক্ষা সুসংহত হয় তবে পাকিস্তানি ব্রিগেডটির জন্য সেটা হবে অনেকটা আত্মঘাতী। আর এই প্রাথমিক যুদ্ধ বিপর্যয় আমাদের জাতীয় ও সামরিক মনোবলের ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলবে। অতএব, সম্ভাব্য লাভের চেয়ে ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশি। তাই যদি হয় তবে এতো বড় ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা তো নেই। তাই আমি তীব্রভাবে এই ঝুঁকি নেয়ার বিরোধী ছিলাম।

তবু আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য এবং আমার সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি নিজে গেলাম জায়গাটা দেখতে। ওখানকার মাইলখানেক দূরে পাকিস্তানের ভেতরে দেড়শো-দুশো ফুট উঁচু একটি সীমান্ত পর্যবেক্ষণ পোস্ট ছিল। সেই পোস্টের ওপরে উঠলাম। মনে পড়ে বিদ্যুতের পাইলনের মতো করে তৈরি পোস্টটি। উঁচুতে উঠলে দু'তিন ফুট এদিক-ওদিক করে দোলে—বেশ ভয়ই লাগে। যা হোক শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো। ফিরে এসে পরবর্তী পরিকল্পনা কনফারেন্সে আমি কথাটা তুললাম। জেনারেল ইরশাদ হেসে বললেন, খলিল, এটা পূর্বেই কয়েকবার আলোচিত হয়েছে। একবার উপ-সেনাপ্রধান জেনারেল হামিদ নিজেও সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং অত্যন্ত জোরের সাথে এই কার্যক্রমটি অবশ্যগ্রহণীয় বলে চূড়ান্ত করে গেছেন। অতএব, দ্বিতীয়বার আমার পক্ষে সংশোধনীটি উত্থাপন করা সম্ভব নয়।'

আমি বহুরকমভাবে জে. ইরশাদকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এটা দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপার। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়। এও বললাম যে, আমাদের সামরিক পুঁথিতেও আছে বয়স্ক জেনারেলগণের একটি প্রধান দুর্বলতা এই যে 'তাঁরা পূর্ববর্তী যুদ্ধের পরিকল্পনা দিয়েই নতুন যুদ্ধ পরিচালনা করতে চান।' এতো করেও জে. ইরশাদকে রাজি করাতে পারলাম না। তখন তাঁকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনি নিজে আমার মতটি অনুমোদন করেন কি না?'

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর কনফারেন্সে উপস্থিত অন্য সদস্যদের জিগ্যেস করলেন তাঁদের মতো। সবাই বললেন যে, আমার মতের পক্ষে যুক্তি আছে, হয়তো যথেষ্টই আছে, কিন্তু আর্মির উপপ্রধানের মতের বিরুদ্ধে তর্ক করা কিছুতেই সমীচীন নয়। বুঝলাম উপস্থিত সবাই প্রবীণ অফিসার এবং বর্তমানে 'আর্মির ভাষায়' অতি গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। এঁদের সবারই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। জাতীয়ভাবে যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক এই ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে উপ-প্রধানের সম্ভাব্য বিরক্তির উদ্রেক করার ঝুঁকি নিতে এঁরা কেউ রাজি

নন (আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে পূর্বেই বলেছিলেন যে, আমিও যেন এই ঝুঁকি না নিই)। তখন আমি জে. ইরশাদের দিকে তাকিয়ে তাঁকে বললাম, 'স্যার, এখন আমি যা বলবো তা সাধারণভাবে রীতিবিরুদ্ধ; তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি জে. হামিদকে সরাসরি বলতে চাই যে মতটি একান্ত আমারই, এই কোরের নয়। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে আমাকে অনুমতি দিন জে. হামিদ যেদিন এই পরিকল্পনাটি অনুমোদন করতে আসবেন সেদিন আমি সভাকক্ষে অনুপস্থিত থাকব।'

পূর্বেই বলেছি জে. ইরশাদের সততা মানসিকভাবেও ছিল। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি রাজি হলেন এবং বললেন যে জে. হামিদকে তিনিই বলবেন, আর্মির এই পরিকল্পনার একটি ক্ষুদ্র পয়েন্টে খলিলের নিজস্ব ও একার একটি মন্তব্য আছে। ওর সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনার অনুমতি পেলে মতটি প্রকাশ করতে চায়। মতটিতে কিছু যুক্তি আছে বলেই মনে হয়।

যা হোক উপ-প্রধানের সামনে আমি প্রস্তাবের পক্ষে আমার যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলাম। হয়তো তিনি নিজেই ১৯৬৫ সালের পূর্বেকার এই পরিকল্পনাটির প্রবক্তা ছিলেন বলে বেশ অনেকক্ষণ ধরে যুক্তিতর্ক চলেছিল। শেষে উপ-প্রধান জে. হামিদ জে. ইরশাদকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে, সংশোধনী প্রস্তাবটি যেন সেনাসদরে পাঠিয়ে দেয়া হয়; তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

এর পরপরই আমি মংলা ত্যাগ করে এসেছিলাম বলে সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কি হয়েছে তার কিছুই জানতাম না। জে. ইরশাদের বক্তব্য সেই প্রসঙ্গ নিয়েই। বললাম, 'না স্যার শুনি নি। তবে ভালো খবর স্যার।'

কিন্তু বুঝলাম না খবরটি ওঁর তখনি হঠাৎ করে মনে পড়লো, নাকি এই মুহূর্তে বলার পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। পরে বুঝেছিলাম যে, খবরটি ইচ্ছে করেই বলা। কারণ এরপর তিনি আমাকে যে প্রশ্ন করলেন তার উত্তর আমি এই বলে যেন পাশ কাটিয়ে না যাই যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার আমি কি বুঝবো। ইরশাদ মানুষটি, পূর্বেই বলেছি, বাহ্যত কঠোর হলেও সৎ ও সরল। মানুষকে বিশ্বাস করতে তিনি অভ্যস্ত, কারণ তিনি নিজেও মানুষকে ঠকাতেন না।

ইরশাদ জানালেন যে, নিয়াজি প্রস্তাব করেছেন যে প্রচলিত যুদ্ধনীতি পূর্ব পাকিস্তানে চলবে না। প্রচলিত নীতি হলো শত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণ পথগুলোতে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করে যুদ্ধ আরম্ভ করা। যদি সুবিধামতো পরিস্থিতি আসে তবে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে আক্রমণ চালানো ও শত্রুর বুকের ওপর আঘাত হানা। যদি পরিস্থিতি বিপরীত হয় তবে যুদ্ধ করতে করতেই পশ্চাদপসারণ ও পেছনের কোনো সুবিধাজনক স্থানে নতুন প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা।

শত্রুকে আক্রমণ ও তার দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে অবাস্তব। কারণ যে সৈন্য সরঞ্জাম পূর্ব পাকিস্তানে আছে তা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা অসম্ভব। অতএব, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হবে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা অব্যাহত রাখা, যে পর্যন্ত তাদের শেষ রক্ষাকারী, এক্ষেত্রে চীন ও আমেরিকা, এগিয়ে না আসে এবং ভারতের অগ্রগতিকে নিরস্ত না করে।

যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের যাতায়াত পথ ভালো নয় এবং আমাদের যান্ত্রিক পরিবহন ক্ষমতা নিতান্ত অপ্রতুল সেই হেতু এই প্রচলিত যুদ্ধপদ্ধতি ত্যাগ করে 'দুর্গ প্রতিরক্ষা' অর্থাৎ ফোর্ট্রেস ডিফেন্স পদ্ধতি অনুসরণ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ পাকিস্তান বাহিনী কতোগুলো ফোর্ট্রেসে (দুর্গে) প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করবে। যেমন যশোর, কুষ্টিয়া, হিলি, রংপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ইত্যাদি। এইসব ফোর্ট্রেস যেকোনো মূল্যে হোক সংরক্ষিত রাখতে হবে। শত্রু যদি এর ফাঁক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তবে তাকে সাঁড়াশি আক্রমণ দ্বারা ধ্বংস করতে হবে ও তার অগ্রগতি রোধ করতে হবে। জেনারেল ইরশাদ এই যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে আমার মতামত জিগ্যেস করলেন। আগে থেকেই তাঁর ধারণা ছিল, বেশি উচ্চপদস্থ না হলেও এই রণকৌশল সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে।

আমার মনে পড়লো ইতোপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়াজির রণকৌশল ও সম্ভাব্য যুদ্ধ-পরিকল্পনা নিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিনের সাথে আমার প্রায়শ দীর্ঘ আলোচনা হতো। বলাবাহুল্য, নিয়াজি ভুল রণকৌশল অবলম্বন করুক আমরা মনেপ্রাণে তাই চাইতাম। আমরা জানতাম যে, নিয়াজি যদি শেষ মুহূর্তে তার ষাট সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে ঢাকার চারপাশে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলতে পারে তবে সেটা হবে আমাদের মিত্রবাহিনীর জন্য সবচাইতে মারাত্মক। কারণ ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে তাদের সবদিক দিয়ে বেশি শক্তি নিয়ে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যূহ গুটিয়ে ঢাকার কাছে পৌঁছতে সপ্তাহ কিংবা সপ্তাহ দুয়েক লাগবে। কিন্তু তারপরই প্রায় চার-পাঁচশ' বর্গমাইল ঘিরে একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহের সম্মুখীন হতে হবে। এই প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে তাদের সামনে দুটি বিকল্প থাকবে। একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিমান বাহিনী কিংবা গোলন্দাজ বাহিনীর কামান ব্যবহার করতে হবে। এই কার্যক্রমের ফলে যে সংখ্যায় বেসামরিক লোক হতাহত হবে তা হবে অগ্রহণযোগ্য। আর দ্বিতীয় বিকল্প হলো অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকার চারদিকে অবরোধ বেষ্টনী স্থাপন করা। এর অর্থ হবে ঢাকায় কোনো সরবরাহ আসবে না। বেসামরিক লোকের জন্যও সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ এই সরবরাহ লাইন খুলে দিলেও বেসামরিক জনগণ উপকৃত হবে না, উপকৃত হবে পাকিস্তানের

সেনাবাহিনী। ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে দ্রুত অগ্রগতি কঠিন হয়ে পড়বে, যুদ্ধ হয়ে যাবে স্থবির ও দীর্ঘ।

এদিকে আমেরিকা ও তার মিত্ররা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্ত্রবিরতির বিভিন্ন প্রস্তাব আনবে। বাংলাদেশের পক্ষে একমাত্র মিত্র দেশ সোভিয়েত রাশিয়াই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। অতএব, একমাত্র তারাই আমেরিকার অস্ত্রবিরতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করতে পারে; কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য তা করে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ভারতকে প্রায় প্রতিদিনই রাশিয়ার কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, শিগগিরই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে রাশিয়ার একটি কি দুটো ভেটো প্রয়োগ করার পরই জয় নিশ্চিত হওয়া চাই। এমতাবস্থায় যুদ্ধ প্রলম্বিত করতে পারলে পাকিস্তানের অত্যন্ত বড় লাভ। আর এটাই হবে মিত্রপক্ষের জন্য বড় সমস্যা।

এদিকে নিয়াজি যদি সীমান্তে দশ-বারোটি দুর্গ-সম প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে এবং 'শেষ সৈনিক শেষ গুলি' শপথ নিয়ে যুদ্ধ পরিকল্পনা করে তবে ভারতীয় বাহিনীর জন্য ঢাকা প্রবেশ সহজ হবে। ফোর্ট্রেস অর্থাৎ দুর্গ-প্রায় জায়গাগুলোকে একদিকে যেমন শক্তিশালী বাহিনী দ্বারা আক্রমণ করে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখতে হবে, অন্যদিকে তেমনি দুই দুর্গের ফাঁক দিয়ে কয়েকটি শক্তিশালী কলাম ভেতরে ঢুকবে। এদিকে ভারতের প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত ছত্রীসেনা ঢাকার কাছাকাছি অবতরণ করে নিয়াজির সৈন্যদলের জন্য পিছিয়ে ঢাকায় প্রবেশের পথ বন্ধ করে দেবে। ভারতের সৈন্য সংখ্যার কোনো অভাব নেই। তাদের শক্তিশালী বিমানবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের দুর্বল ও অপ্রতুল বিমানগুলোকে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দু'চারদিনের মধ্যে ধ্বংস করে দেবে, যাতে নিয়াজি দিনের বেলায় তাঁর দুর্গতেই অচল হয়ে আটকে থাকে। কারণ বেরুলেই বিমান থেকে গোলাবৃষ্টি আর রাতে তো মুক্তিবাহিনী আছেই।

পরে বিবৃত হয়েছে, যুদ্ধে পরাজয়ের পর ২০ ডিসেম্বর জেনারেল হামিদ খান আমাদেরকে উদ্দেশ করে তাঁর বক্তৃতায় এই কথাটি বিশেষভাবে বলেছেন যে, ১০ ডিসেম্বর আমরা নিয়াজিকে আদেশ দিলাম যেন তিনি পশ্চাদপসারণ করেন এবং ঢাকায় ফিরে নতুন করে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেন; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, 'তা সম্ভব নয়। কারণ দিনের আলোতে সৈন্যদের পথচলা সম্ভব নয়—ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য এবং রাত্রিতে সৈন্যদের চলা সম্ভব নয় মুক্তিবাহিনীর অ্যামবুশের জন্য।' অতএব, অনতিবিলম্বে ঢাকার পতন হলো, যদিও আমাদের বেশ কয়েকটি ফোর্ট্রেস তখনও অক্ষত ছিল।

জেনারেল ইরশাদের প্রশ্নে আবার আসা যাক। এক মিনিট ভাবলাম। ইরশাদ মানুষ ভালো বটে, কিন্তু তিনি কট্টর মনোভাবাপন্ন একজন পাঞ্জাবিও। বাঙালির বিরুদ্ধে পাঞ্জাবির যে লড়াই চলছে সেখানে পাঞ্জাবির প্রতিরক্ষার

ব্যাপারে সহায়ক কোনো ধরনের সঠিক বক্তব্য প্রদানের প্রশ্ন ওঠে না। বরং মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, ছোটভাবে হলেও একটা সুযোগ এসেছে প্রতিপক্ষকে বিপথে নেয়ার চেষ্টা করার।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থা, ভূমি বৈশিষ্ট্য, নদীনালা ইত্যাদির বিশ্লেষণ করলাম। এসব ব্যাপারে জেনারেল ইরশাদ যে বিশেষ কিছুই জানেন না, সেটা জানতাম। কারণ যে পাকিস্তানিরা ওখানে চাকরি করেছেন তারাও বিশেষ জানেন না যে, প্রত্যেক মৌসুমে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি প্রকৃতির কিরূপ পরিবর্তন হয়। জুলাই-আগস্টে যেখানে ট্যাঙ্ক একশ' গজ এগুলেই মাটিতে দেবে অচল হয়ে যাবে, সেই ভূমিতে আবার ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত যোজন বিস্তৃত 'ট্যাঙ্ক দৌড়' কোনো সমস্যাই নয়। গ্রামের ঘরবাড়িগুলো গাছপালা দ্বারা আবৃত ও ছড়ানো-ছিটানো। পাকিস্তানের বিরান ভূমিতে গুচ্ছ গুচ্ছ করে গড়ে ওঠা গ্রামের সাথে কোনো তুলনাই হয় না। অতএব, এইসব অবান্তর গোছের অনেক কথা অনেকটা বিকৃতভাবে বিশ্লেষণ করে জেনারেল ইরশাদকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, নিয়াজির প্রস্তাবিত ফোর্ট্রেস ডিফেন্স ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিরক্ষা কৌশল পূর্ব পাকিস্তানে কার্যকর হবে না। ইরশাদ এই যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিই তুলে ধরলেন। তবে বাঁচোয়া এই যে, একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা পদ্ধতির শক্তি যে কতো প্রবল এবং অন্যদিকে সর্বস্তরের জনগণ সেখানে কতোটা পাঞ্জাব-বিদ্বেষী তা পাকিস্তানিরা জানতো না। অতএব, সেখানে যুদ্ধ করা কোনো পাঞ্জাবি সৈন্যের পক্ষে যে কতো কঠিন, সেটা পাকিস্তানিরা বুঝতো না। তাদের বোঝার কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ তাদের খবর সরবরাহকারীরা সবাই 'হুকুম বরদার'। মুষ্টিমেয় বাঙালি খবর সরবরাহকারীরা ছিল জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ জাতীয় রাজনৈতিক এতিমরা। কর্তা যা জেনে খুশি হবেন সেসব বলেই তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতেন। আর ছিল বিহারিরা যারা বাঙালিদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো। তারা বাঙালিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা খাটো করে দেখিয়ে পাঞ্জাবিদের উৎসাহ যোগাত। কারণ ঐ একই, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা।

অতএব, ইরশাদ যদিও প্রচলিত রণকৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন, তবুও ফোর্ট্রেস ডিফেন্স নীতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকটা প্রভাবান্বিত হলেন বলে মনে হলো।

তখন রাত প্রায় একটা। আমি ঘড়ি দেখছি। আবার দেখা হবে, আজ এই পর্যন্ত থাকুক বলে ইরশাদ আমাকে বিদায় দিলেন। জেনারেল ইরশাদের সঙ্গে পরে আর দেখা হয় নি।

তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানিদের সীমাহীন অজ্ঞতা

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, লারকানা ষড়যন্ত্রের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সশস্ত্র তৎপরতা চালালে বাঙালিরা বিদ্রোহ করতে পারে এবং ভারতও এ বিদ্রোহ সমর্থন করে প্রয়োজন হলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে এমন সম্ভাবনা পাকিস্তানের সামরিক জান্তা চিন্তাও করে নি। তাই ১৯৭১ সালের মার্চের পরবর্তী সমস্ত ঘটনা অর্থাৎ তাদের ব্যর্থতা, সামরিক জান্তা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখতো। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তখন বিবিসি, আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকা (ভোয়া) ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র না শুনে রাতে ঘুমাতে যেত না বলে পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ইত্যাদি বিদেশি খবর মাধ্যমগুলো শোনা দেশপ্রেমের অভাব বলে বিবেচনা করতো। তাদের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সরকারের ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোনো ভাষ্য শুনতে তারা মানসিকভাবে অভ্যস্ত ছিল না। এজন্যই যখন হঠাৎ তারা শুনতে পেল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, সবাই আমাকে প্রশ্ন করেছে, 'সাব ইয়ে কিয়া হো গিয়া?'

পূর্ব পাকিস্তানে যা দু'চারজন বেসামরিক পাঞ্জাবি ছিলেন তারাও বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বহু দূরে অবস্থান করতেন। সেখানে তাদের আশপাশে কি ঘটছে তার কোনো খবরই রাখতেন না। অন্যদিকে পাকিস্তানের সিনিয়র অফিসারদের মধ্যেও বেশির ভাগ অনুরূপভাবে অজ্ঞ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্বন্ধে। এই রকম দু'একটি ঘটনা এখানে বর্ণনা করলে আমার বক্তব্য আরও পরিষ্কার হবে।

ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মেলের অজ্ঞতা

অক্টোবর মাসের শেষ দিক। ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মেল হুসেন আমার অফিসে এসে হাজির। বললেন, 'বাঙালি, চায়ে পিলাও। তুমি জান যে আমি পূর্ব পাকিস্তানে চাকরির জন্য ভলান্টিয়ার করেছি। শিগগিরই আমার পোস্টিং এসে যাবে। এখন তুমি কি বলো?'

তোজাম্মেল আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু। শুধু ঘনিষ্ঠতাই নয়, আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা মিশ্রিত একটি সম্পর্ক ছিল। আমরা তুর্কি ভাষা শিখতে গিয়ে একসাথে তুরস্কে ছিলাম। তোজাম্মেল ১৯৪৮ সালে ঢাকায় একমাত্র পদাতিক রেজিমেন্ট ৩/৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তাঁর মুখেই শোনা যে, তিনি নাকি কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আলী রেজা সাহেবের এক কন্যার সাথে প্রায় বিবাহবদ্ধ হতে যাচ্ছিলেন। আলী রেজা ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এসে পুরানা পল্টনে বাসা নিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্মৃতি তোজাম্মেলের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের সর্বদাই সমালোচনা করতেন তোজাম্মেল। পরবর্তীকালে তিনি একটি আত্মজীবনী লিখেছেন। সেখানে বাঙালিদের সম্বন্ধে পাঞ্জাবিদের মনোভাব বিষয়ে অতীব তিক্ত সমালোচনা করেছেন। সে প্রসঙ্গ আরও পরে।

তোজাম্মেল জি এইচ কিউতে আমার সহকর্মী ছিলেন, অর্থাৎ তিনিও একজন বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক। তোজাম্মেল তাঁর স্বভাবসুলভ উচ্চ হাসি ও আনন্দের সঙ্গে আমাকে খবরটি দিলেন; কিন্তু আমার মুখ কালো হয়ে গেল। বুঝলাম তোজাম্মেলের প্রতি আমার আলাদা দুর্বলতা রয়েছে। ওঁর অমঙ্গল আমার হৃদয়ে বাজে। সহাস্য তোজাম্মেল আমার বিরূপ অনুভূতি লক্ষ্য করলেন ও জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপার কি?'

'তুমি কি ইচ্ছে করলে তোমার এই পোস্টিং পরিবর্তন করতে পারো না?'

'পারি, কিন্তু কেন? তুমি কি খুশি হও নি যে আমি আমাদের মাতৃভূমি, বিশেষ করে তোমার জন্মভূমি উদ্ধারের সংগ্রামে যাচ্ছি।'

তোজাম্মেলকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম যে অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে। একসময় হয়তো সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান অর্জন সম্ভব ছিল; কিন্তু এখন তাও নেই। এখন যুদ্ধ অনিবার্য এবং যুদ্ধে পাকিস্তান নিশ্চিতভাবেই পরাজিত হবে। তোমার ভবিষ্যৎ কি হবে কেউ জানে না। আমি খুশি হবো তুমি জীবিত থাকলে ও বন্দি হলে। এমতাবস্থায় আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তুমি পূর্ব পাকিস্তানে যেও না। ওখানে যেসব পাকিস্তানি আছে তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। বরং আশা করবো তারা সবাই ধ্বংস হোক; কিন্তু তুমি কেন? তুমি তো কোনো অপরাধ করো নি। তুমি তো মনেপ্রাণে একজন সৎ লোক।

আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব চেষ্টা করলাম তোজাম্মেলকে বোঝাতে। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। উলটো তিনি আমাকে বোঝাতে লাগলেন, 'খলিল, তুমি তো জানো বাঙালিরা কেমন সাচ্চা মুসলমান। আমাদের এই গোমূর্খ পাঞ্জাবিরা ওদেরকে পাকিস্তানের প্রতি বীতস্পৃহ করে ফেলেছে। আমি গিয়ে বোঝাবো যে আসল পাঞ্জাবির কাছে বাঙালিরা কেমন প্রিয়। আমরা ভাই ভাই। খলিল, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে আমি ওঁদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবো। এবং আমরা দু'ভাই মিলে ভারতীয়দের মোকাবিলা করবো। তুমি আমাকে বাধা দিও না।'

এরপর আমি আর ওঁর সাথে তর্ক করি নি। তিনি আমাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। আমি ওঁর যাওয়ার পথের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকলাম।

পরদিন কিংবা হয়তো আর দু-একদিন পর তোজাম্মেল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাসায় এসে হাজির। প্রথমে বুঝতে পারলাম না কেন। পরে মনে হলো হয়তো আমার সঙ্গে আলাপের কথা তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছেন। তাঁর স্ত্রীকে বোধহয় আমার সাথে কথা বলাতে চেয়েছেন।

তাঁর স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরেও আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, এই জটিল সময়ে তোজাম্মেলের স্বেচ্ছায় পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়া কোনোমতেই ঠিক হবে না। বলতে গেলে শেষ রক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে। বেগম তোজাম্মেলও জানতে চাইলেন যে বাঙালিরা পাঞ্জাবিদের ওপর এতোটা বিরূপ কেন? এই কথায় আমার স্ত্রী কিছুটা আপত্তি উত্থাপন করাতে আমাদের আলোচনায় তিক্ততা সৃষ্টি হবে ভেবে আমি দ্রুত সেই প্রসঙ্গের ইতি টেনে দিয়ে বললাম, 'জানো তো আমি ব্যক্তিগতভাবে এই লোকটাকে ভালোবাসি। আমি চাই না উনি পূর্ব পাকিস্তানে যান এই সময়ে। তোমরা ওখানকার পরিস্থিতি জানো না। তোমাদেরকে পরিস্থিতি বলে বোঝানো সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি কেবল অনুরোধ করতে পারি যে তোজাম্মেলের এই পরিস্থিতিতে ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।'

শেষ পর্যন্ত মনে হলো তাঁরা কেউই আমাদের কথায় পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারলেন না। বরং হতে পারে ধরে নিলেন, আমরাও কিছুটা বিপরীত চিন্তার লোক। যাহোক কুশল বিনিময় করে ওঁদেরকে বিদায় দিলাম; কিন্তু মনটা অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠল।

তবে তোজাম্মেলের ঘটনা, এই শেষ নয়। শেষ ইতিহাস পরে।

ক্যাপ্টেন জিলানির অবিশ্বাস্য ধারণা

বিভাগ-পূর্ব ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে কর্নেল জিলানি ছিলেন একজন তথাকথিত 'ইঙ্গ-ভারতীয়' ব্যক্তি। তিনি বিলেতে ইংরেজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সেখানে তাঁদের দু'ছেলের জন্ম হয়। উভয়েই ব্রিটিশ ভারতীয় এবং দু'জনকেই কর্নেল জিলানি পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে ভর্তি করান। প্রথমজন বিমান বাহিনীতে ও দ্বিতীয়জন ক্যাপ্টেন আসগর আলী জিলানি আমাদের সতীর্থ, সেনাবাহিনীতে। ঘটনাক্রমে দু'ভাইয়ের কারোরই চরিত্র বৈশিষ্ট্য সৈনিকসুলভ ছিল না বলে ক্যাপ্টেন পদবির ওপরে ওঠার আগেই তারা পেশা পরিবর্তন করেন।

ক্যাপ্টেন জিলানির চরিত্রে আরও একটি বৈপরীত্য ছিল। তিনি পাঞ্জাবি হয়েও পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবিদের পছন্দ করতেন না। বাঙালিদের সাথে বেশি সমমনস্কতা অনুভব করতেন। সেই কারণে তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান, যদিও পাঞ্জাবের বাহাওয়ালপুরে তাঁর বিপুল পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল। উপরন্তু তিনি ঢাকা বা চাটগাঁর অভিজাত শ্রেণীর সদস্য হিসেবে এখানে থাকেন নি। থেকেছেন চাটগাঁ জেলার সাতকানিয়া থানার বাণীগ্রাম নামে এক অজ পাড়াগাঁয়ে অবস্থিত 'মুমিন সাংগো' চা বাগানের ম্যানেজার হিসেবে। নাম চা বাগান হলেও চায়ের কোনো অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। ছিল অরণ্য আর গাছপালা। গাছ কেটে বিক্রি করে তাই দিয়ে তাঁর জন্য বরাদ্দ পাঁচশ' টাকা ও পাহারাদার ইত্যাদির জন্য যৎসামান্য বেতন-ভাতাদির বন্দোবস্ত তিনি করতেন। তিনি, তাঁর একমাত্র কেরানি ও গোটা দুই পাহারাদার মিলে একটি মেস করেছিলেন। সবাই এক সাথে বসে খেতেন। আমি একবার জিগ্যেস করেছিলাম, 'ওরা সবাই কি খায় সেটা আমি অনুমান করতে পারি; কিন্তু দু'বেলা তুমি কি খাও?'

'দুপুরবেলা খাই রাইস আর ডাল। রাতে খাই পটাটো আর ডাল।'

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে আমি আমার ঝিলাম রোডের বাসার বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ গেটের পাশে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। তাকে শান্ত হওয়ার জন্য ডাক দিলাম। দেখি কুকুরের পেছনে পেছনে আসছেন খাকি জলপাই রঙের প্যান্ট ও শার্ট পরিহিত শীর্ণদেহ এক ভদ্রলোক। ভালো করে তাকিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন আসগর আলী জিলানি। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হ্যাঁ ঠিকই জিলানি। উষ্ণ অভিনন্দন সমাধা করে জিগ্যেস করে জানতে পারলাম তিনি ছুটিতে এসেছেন। কয়েকদিন আমার বাসাতেই থাকবেন।

চা-পর্ব ও গল্পসল্প শেষ হওয়ার পর আমি জিলানিকে জিগ্যেস করলাম, পূর্ব পাকিস্তানের কি অবস্থা? জিলানির উত্তর, কেন? স্বাভাবিক অবস্থা।

‘কোনো রকম গোলমালের খবর তুমি পাও নি?’

‘হ্যাঁ, মার্চ মাসের দিকে ঢাকায় কিছু গোলমাল হয়েছিল। সেসব তো এখন ঠিক হয়ে গেছে। কোনোরূপ আইন বিঘ্নিত হওয়ার মতো ঘটনা তো ঘটে নি। তবে শোনা যায় কিছু দুষ্কৃতকারী নাকি সরকারের বিরুদ্ধে হামলা করে মাঝে মাঝে। সে রকম তো হয়েই থাকে।’

ওর উত্তর শুনে আমি থ মেরে গেলাম। এও কি সম্ভব যে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে কিছুই জানে না এমন লোকও আছে। পরে দেখেছি এমন লোক পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সবাই, দু’চারজন বুদ্ধিজীবী ধরনের ব্যক্তি ছাড়া।

যাহোক আমি ক্যাপ্টেন জিলানিকে পছন্দ করতাম। তাঁকে বললাম, ‘তুমি আর পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেও না। সেখানে বাঙালি ও পাকিস্তানিদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এই সংঘাত শেষের পর্যায়ে উপনীত হলে তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিতভাবেই বিপন্ন হবে।’

কিন্তু জিলানি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। বারবার বলতে লাগলেন যে, ওখানে শান্তি-শৃঙ্খলা পুরোপুরিভাবে অটুট। তখন আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম যে আর কয়েকটা মাস দেরি করে যেন ওখানে যায়। ততোদিনে দেখতে পাবে কিছু একটা ঘটে গেছে। দশ বারোদিন পরে বিদায়কালে তাঁকে এই অনুরোধটিই বারবার জানালাম। কিন্তু পরে শুনলাম জিলানি চাটগাঁর সাতকানিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে ফিরে গেছেন। বোধহয় তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল যে তিনি তো বাঙালিই হয়ে গেছেন, বাঙালিদের দিক থেকে তাঁর কিসের ভয়।

জিলানি সম্বন্ধে পরবর্তী ঘটনা আমাদের বিষয়বস্তুতে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু কিছুটা কৌতুক মিশ্রিত বলে সংক্ষেপে এখানে তা বলে রাখি।

জিলানি ফিরে যাওয়ার পর আমি ধরে নিয়েছিলাম সে আর ফিরবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো—আমরা সবাই বন্দিশিবিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় মার্চ মাসে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখি—জিলানি। নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। দৌড়ে গিয়ে আলিঙ্গন করলাম, ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ, ‘তা হলে তুমি জীবিত?’

‘ও ইয়েস কলী-ল (খলিল), আই অ্যাম এলাইভ।’

‘ফিরলে কি করে? ওখানে যারা জীবিত তারা সবাইতো ভারতের বন্দি-শিবিরে।’ ওঁর কথায় জানতে পারলাম যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বেশ বিপদেই পড়েছিল। স্থানীয় বাঙালিরা ওঁকে চিনতো। তারাই তাঁকে বাঁচিয়েছে। নচেৎ অস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে হত্যা করতো। অবশেষে তিনি ঢাকায় এসে জেনারেল ওসমানীর কাছে হাজির হলেন। ওসমানী পড়লেন বিপদে। এই অদ্ভুত লোককে নিয়ে কী করা যায়? এখানে থাকলে তো ও বাঁচতে

পারবে না। পরে কোনো কূটনৈতিক ব্যক্তির সাহায্যে তাঁকে করাচি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভাবলাম, 'রাখে খোদা মারে কে।'

কথা শেষ করে জিলানি প্রশ্ন করলেন, 'এখন বল খলিল, তুমি এখানে পিণ্ডিতে বসে কি করে জানতে যে ওখানে গোলমাল হবে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে এবং আমি ওখানে বাঁচতে পারবো না?'

আমার হাসি পেল। কথা আর বেশি বাড়ালাম না। উত্তর এড়িয়ে গিয়ে যা বললাম তা তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবে খানদানি ইংরেজ ভদ্রলোকের মতো আর প্রশ্ন করলেন না। জিলানি এখন বাহাওয়ালপুরে পিতার সম্পত্তি দেখাশোনা করছেন। বিয়ে করেছেন সেখানকার গ্রামের এক স্বল্পপড়ুয়া মেয়েকে। চিঠিপত্র লেনদেনের সূত্রে অনুমান করি সুখেই আছেন— পড়াশোনা, লেখা আর গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ানো– এই নিয়ে আছেন।

পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং সেখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে জানার ইচ্ছা, আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি পশ্চিম পাকিস্তানের লোকদের কেমন ছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরা এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্যেই কতক উদাহরণ এখানে দেয়া হয়েছে।

তবে বলে রাখি, এখানে মোটামুটি দুই শ্রেণীর মানুষের মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে উচ্চতম পর্যায়ের নীতিনির্ধারক ও ক্ষমতার লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীদের মনোভাব, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অজ্ঞতা, অনীহা ও তাচ্ছিল্য ইত্যাদি।

পাকিস্তানের সমাজে আরও দুটো শ্রেণী ছিল। প্রথমটি ছিল কিছু উদারমনা, উচ্চ শিক্ষিত ও পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁরা পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমের শোষণ-শাসন সম্বন্ধে তাঁদের লেখা ও কথায় প্রতিবাদ করতেন, তাঁদের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হয় নি। কারণ তাঁরা একেবারে মুষ্টিমেয়সংখ্যক ছিলেন এবং তাঁদের অনেকে আমাদের এখানেও পরিচিত।

আর দ্বিতীয়ত পাকিস্তানের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত জনগণ যারা পুরো জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ, তাদের কথাও বলা হয় নি। তার প্রধান কারণ এই বিরাটসংখ্যক মানুষ পাকিস্তানি সমাজের ভাগ্য নির্ধারণে কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। কারণ হিসেবে মনে রাখতে হবে যে, এই উপমহাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানই একমাত্র দেশ, যেখানে সামন্ততন্ত্র বিদ্যমান ও তা অত্যন্ত দৃঢ় এবং কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই সামন্ততন্ত্রে জমির মালিকানা ক্ষেত্রে প্রজাদের কোনো অধিকার নেই। এরা যখন-তখন মালিকের খেয়ালখুশিমতো উচ্ছেদ হতে পারে বিধায় মালিকের খামখেয়ালির ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। সামন্ত প্রভু তাদের যা জানাবে তাই তারা জানবে, যা শেখাবে তাই তারা শিখবে, যাকে

ভোট দিতে বলবে তাকেই তারা ভোট দেবে। এই দরিদ্র অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত পাকিস্তানিদের মতামতও আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়— নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলেই।

পুনরায় আমাদের মূল বিষয়ে ফেরা যাক।

মেজর মাহমুদ আতাউল্লাহর অজ্ঞতা

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। শুরু করেছিল পাকিস্তানই, অনেকটা মরিয়া হয়ে। এই যুদ্ধারম্ভের পূর্বে নিয়মমাফিক পাকিস্তান সামরিক বাহিনী তাদের 'রিজার্ভ' সৈনিকদের নিয়মিত চাকরিতে যোগদান করার জন্য ডাকলো। একটি নির্ধারিত বয়স পুরো হওয়ার পূর্বে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকই জাতীয় যুদ্ধের প্রয়োজনে চাকরিতে ফেরত আসতে বাধ্য। তাদেরকেই বলা হয় সশস্ত্র বাহিনীর রিজার্ভ।

এই রীতি অনুযায়ী আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের পূর্বতন অফিসার, আমার চাইতেও পাঁচ বছরের সিনিয়র, মেজর মাহমুদ আতাউল্লাহ ডাক পেয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে হাজির হলেন। তবে তাঁকে কোনো দায়িত্ব দেয়া হলো না। যুদ্ধের কয়েকদিন কোনো অফিসার মেসে কাটিয়ে শেষের দিকে এসে উঠলেন আমার বাসায়। আগে থেকে কোনো খবর দেয়া নেই—একদিন বাক্স-প্যাটরা নিয়ে হাজির হলেন।

ইতোপূর্বে আমরা একসাথে চাকরি করেছি। শিয়ালকোটে চাকরির সময় আমরা একটি বড় বাংলোকে দু'ভাগ করে বাস করেছি। ওঁর স্ত্রী বোম্বাইয়ের বোরা মুসলমান সম্প্রদায়ের। পাঞ্জাবিদের কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু সামাজিক প্রথার চাইতে তিনি বাঙালির উদার সমাজে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। অতএব, আমাদের সাথে তাঁর আন্তরিকতা।

তখন পুরোপুরি যুদ্ধ চলছিল, তাই একজন প্রবীণ পাঞ্জাবি অফিসারের বাসায় অবস্থান আমাদের একেবারে অভিপ্রেত ছিল না। কারণ যুদ্ধের অবস্থা দিন দিনই আমাদের পক্ষে যাচ্ছিল। অতএব সারাক্ষণ বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা থেকে সুখবর শুনে কোথায় চেঁচিয়ে আনন্দ করবো ছেলে-পুলে ও আগত বাঙালি বন্ধু-বান্ধবসহ, সেখানে কিনা হঠাৎ করে এই পাঞ্জাবির আবির্ভাব। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলাম পঞ্চাশোর্ধ্ব এই প্রাক্তন সামরিক অফিসার যুদ্ধের কোনো খবরই রাখতেন না। মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্যেস করতেন, 'কি হে খলিল, কি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে? তোমরা মনে হচ্ছে বেশ খুশি। তবে বোধহয় ভারত খুব মার খাচ্ছে ওখানে, তাই না?' অবাক বিস্ময়ে মেজর

সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর কিছু বলা বা করার না পেয়ে চায়ের অর্ডার দিতাম।

প্রাক্তন সুবেদার মেজর/অনারারি ক্যাপ্টেনের অজ্ঞতা

ডিসেম্বরের ১০/১২ তারিখ। আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রাক্তন সুবেদার মেজর এবং অনারারি ক্যাপ্টেন সৈয়দ আসকার হুসেন এসে হাজির। তিনি ছিলেন হিন্দুস্তানি, বর্তমানে পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা। মার্চ মাসের শেষের দিকে যখন জয়দেবপুরে সেকেন্ড বেঙ্গল বিদ্রোহ করে তখন সৈয়দ সাহেবের নাতি, একজন ক্যাপ্টেন নিহত হন। কিন্তু সামরিক বাহিনী তাঁর পরিবারবর্গকে পুরোপুরি জানায় নি, অথচ ক্যাপ্টেনটি নিশ্চিতভাবে নিহত। অতএব, অনারারি ক্যাপ্টেন সাহেব ও পরিবারবর্গ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর চূড়ান্ত বিজয়ের পর ক্যাপ্টেনের ফেরত আসার জন্য অপেক্ষা করছেন। এদিকে কানে আসছে যুদ্ধের অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। তাই নিজের লোক হিসেবে সঠিক খবর পাওয়ার জন্য আমার কাছে ছুটে এসেছেন।

খুব মায়া লাগল এই বৃদ্ধ সৈনিকটির আশাভরা চোখমুখ দেখে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে। তিনি যে মেজর সাহেবের তুলনায় যুদ্ধাবস্থা সম্বন্ধে অনেক বেশি জানেন তাতে অবাক হই নি। ওঁর নাতি এই যুদ্ধে জড়িত, মেজর সাহেবের কেউ জড়িত নয়। আর পূর্ব পাকিস্তান? তার কি হবে? এসব ব্যাপারে দু'জনের কারোরই তেমন আগ্রহ ছিল না।

অনারারি ক্যাপ্টেন সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে যথাসাধ্য আশাপ্রদ ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম। তিনিও খুশি হলেন। শেষে বললেন, 'ধরুন খুদা-না-খাওস্তা যদি এমন কিছু হয়ও তবে তো আমাদের বন্ধু দেশ উত্তর থেকে অর্থাৎ চীন ও আমাদের বন্ধু দেশ দক্ষিণ সমুদ্রে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র তো প্রস্তুতই, তাই না?' যদিও ভালো করে জানতাম যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র মুখে এবং বক্তৃতায় যতো পাকিস্তান সমর্থক ও ভারত তথা বাংলাদেশবিরোধী হোক না কেন, পাকিস্তানের (তাদের তরফ থেকে) 'সামান্য' সমস্যার জন্য রাশিয়ার বিরোধিতা ও একটি সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাময় পদক্ষেপ নিশ্চয় নেবে না। বস্তুত তারা পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে ইতোপূর্বে অনেকবার পরামর্শ দিয়েছে যে এই রাজনৈতিক সমস্যাটি রাজনৈতিকভাবে সমাধা করে ফেলতে, যুদ্ধ অবধি এটাকে গড়াতে না দেয়ার জন্য। অতএব, তারা দু'একটি মৌখিক বাণী ও দূর থেকে কিঞ্চিৎ সচলতা দেখানো ছাড়া অন্য কোনো সাহায্য পাকিস্তানকে দেবে না।

তবে স্বজন হারানো বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে জোর দিয়েই বললাম, 'নিশ্চয় তারা আসবে। হয়তো ইতোমধ্যে পৌঁছেও গেছে।' বৃদ্ধ খুশি মনে বিদায় নিলেন।

একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই প্রকাশ পেল। মেজর সাহেব ও এই অনারারি ক্যাপ্টেন সাহেব মোটেই জানতেন না যে বাঙালির ওপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কি অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে, জানার কৌতূহলও তাঁদের ছিল না।

কর্নেল শিগরির অজ্ঞতা

পূর্বেকার অনুরূপ একটি ঘটনা। অক্টোবর, নভেম্বর মাস হবে। হঠাৎ কর্নেল শিগরি এসে হাজির। তিনি কাশ্মিরের উত্তরের গিলগিট অঞ্চলের শিগার উপত্যকার বাসিন্দা; কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডিতেই মানুষ। বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন জনপ্রিয় অফিসার। বহুদিন রেজিমেন্টে চাকরি করেছেন এবং বিশেষ করে তিনি একজন কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়। একসময় পাকিস্তান ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। প্রথম বেঙ্গল ফুটবল টিম যে গোটা পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সেজন্য শিগরির অবদান সমধিক।

২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক চাটগাঁয় প্রশিক্ষণরত প্রায় সহস্রাধিক নবীন সৈনিককে নিরস্ত্র অবস্থায় অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়, একজন কর্নেলসহ বাঙালি অফিসারদেরও হত্যা করা হয়, তখন কর্নেল শিগরি ওখানে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্তি সম্বন্ধে যে দুর্নাম আছে তা উপেক্ষা করলেও এ কথা মানতেই হবে যে তিনি এই হত্যাযজ্ঞে বাধা না দিয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এইসব খবর আমার ভালোভাবে জানা ছিল। অতএব, কর্নেল শিগরিকে ওই সময় আমার বাসায় অভ্যর্থনা জানানো দূরের কথা, ওর সাথে কোনো কথা বলারও প্রবৃত্তি আমার ছিল না।

কর্নেল শিগরি আমার বাসায় আসার কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন, 'তুমি যদি আমাকে আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে একটু সাহায্য করো তবে আমি কর্নেল থেকে পদোন্নতি পেয়ে ব্রিগেডিয়ার হতে পারি।' কথাটা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারি না।

শিগরি চাকরিতে আমার চেয়ে প্রবীণ হলেও পদোন্নতি পান নি বলে কর্নেলই রয়ে গেছেন। সেনাবাহিনীর নিয়মানুযায়ী তাঁর আর পদোন্নতি হওয়ার কথা নয়। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন শিগরি যা ভেবেছেন, পদোন্নতি হতেও পারে; কথাটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকলো না। শিগরি বললেন, 'দেখ বর্তমানে চাটগাঁর বেঙ্গল রেজিমেন্টের নবীন সৈনিকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে কোনো ব্রিগেডিয়ার নেই। তুমি যদি জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে বলো তবে তিনি সুপারিশ করে আমাকে ওখানে পদোন্নতি দিয়ে নিয়োগ দিতে পারেন।' কারণ হিসেবে শিগরি বললেন, বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার হিসেবে তাঁর দাবি অগ্রগণ্য।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে—অনুরূপ প্রচেষ্টা সফল হলেও হতে পারে। নবীন বাঙালি সৈনিকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রবীণ বেঙ্গল রেজিমেন্ট অফিসারেরই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সেই হিসেবে ইতোপূর্বে পদোন্নতির ব্যাপারে অতিক্রান্ত হলেও, শিগরির ব্যাপারটা বিবেচিত হতে পারতো হয়তো; কিন্তু আমি বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ওঁর প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না।

২৫ মার্চ উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে যে একান্ত কাপুরুষোচিত ও বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল তার হোতা যদি শিগরি না হয়ে থাকেন, তবে সহায়তাকারী নিশ্চয় ছিলেন। ওই দিনই কিংবা তার দু'একদিন পরে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত বাকি পাঁচটি বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকে প্রয়োজনবোধে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে নিরস্ত্র করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সমর বাহিনীর সেই প্রচেষ্টা সফল হয় নি, এ একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পাঁচটি ব্যাটালিয়নই সফলভাবে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল। যে তিনটি বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল তাদেরকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা হয় নি। তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল ও তিনজন বাঙালি লে. কর্নেলই এদের অধিনায়ক ছিলেন।

কিন্তু চাটগাঁয়ে বাঙালি নবীন সৈনিকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আর তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। হত্যাযজ্ঞের পরপরই শিগরিসহ সব অফিসারকে এদিক-ওদিক স্থানান্তরিত করে কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আমি ভেবে পেলাম না, শিগ্রির মতো একজন প্রবীণ অফিসারও এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি রাখতেন না। দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ হচ্ছে, পাকিস্তান সমর বাহিনী চরম পরাজয়ের মুখোমুখি, এ কথাটি কর্নেল পদবির সিনিয়র অফিসার শিগরির মতো পাকিস্তানিদের জানা উচিত; কিন্তু তাঁরা কথাটা কল্পনাও করতে পারতেন না।

এই 'কর্নেল শিগরি-গণ' জানতেন না, তাদের জানার আগ্রহও ছিল না, পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ তাদেরই দেশের অর্ধেক অংশে তাদের সশস্ত্র বাহিনীর পশু সুলভ বর্বরতায় লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে, অসংখ্য নারী ধর্ষণ করেছে, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করেছে।

এই শিগরি-গণ ও পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ এও জানতো না (সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বাস্তবে হয়তো আরও বেশি) '৭১ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই নিহত হয়েছে (আহত অগুণতি) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর :

কর্নেল পদবিসহ অফিসার – ২৩৭ জন

জুনিয়র কমিশন্ড্ অফিসার – ১৩৬ জন

অন্যান্য সৈনিক – ৩৫৫৯ জন

(মেজর জেনারেল শওকত রেজার লিখিত পুস্তক, *পাকিস্তান আর্মি* ১৯৬৪-৭১, ১০৯ পৃষ্ঠা)

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

বাঙালিদের সম্বন্ধে পাকিস্তানি তথা পাঞ্জাবিদের মনোভাব

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কঠোরভাবে কেবল পাকিস্তানি জনগণকে নয়, পাকিস্তানের শিক্ষিত ও অবগত শ্রেণীকেও পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি এবং সেখানকার জনগণের মনোভাব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে জানবার কোনো আগ্রহও পাকিস্তানিদের ছিল না। তারা কেবল একটি কথা জানতো এবং খুশিমনেই জানতো যে, শেখ মুজিব নামক একজন দেশদ্রোহীর চেলা-চামুণ্ডারা কিছু গোলমাল করেছে পূর্ব পাকিস্তানে। তবে দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনী তাদেরকে 'ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা' করে দিয়েছে। বর্তমানে সবকিছু স্বাভাবিক।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাকিস্তানি তথা পাঞ্জাবি, যারা কখনো পূর্ব পাকিস্তানে যায় নি, তাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তান ছিল 'দূরান্তের' এক স্থান। সেখানকার অধিবাসীরা নামে মুসলমান হলেও হতদরিদ্র ও নিচু শ্রেণীর। আর যারা পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছে এবং থেকেছে তারাও সেখানে গিয়েছে পূর্বে-গড়া মানসিকতা নিয়ে। তাদের মনের ছবিটি মোটামুটি এই যে, ওখানকার 'ছোটে ছোটে কালে কালে' মানুষরা নামেমাত্র মুসলমান এবং সংস্কৃতিতে হিন্দুভাবাপন্ন। অতএব, পাকিস্তানি তথা পাঞ্জাবিদের একটি গুরুদায়িত্ব এদেরকে সাচ্চা মুসলমানে পরিণত করা ও শাসন করা।

এ সত্য প্রমাণের জন্য অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। তবে দু'একটি দিলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

ব্রিগেডিয়ার সওয়ার খান ও লে. কর্নেল সায়গল

১৯৭০ সালের শেষের দিক। আমি তখন একদিন মংলার অফিসে বসে কাজ করছি। পরদিন শবেবরাত। হঠাৎ আমার উপরস্থ ব্রিগেডিয়ার সওয়ার খান টেলিফোনে তাঁর অফিসে চা খেতে ডাকলেন। গেলাম। সেখানে ক্যাডেট জীবনে আমার সতীর্থ, বর্তমানে পদোন্নতি না হওয়ায় আমার নিচের পদবিতে অধিষ্ঠিত লে. কর্নেল সায়গল রয়েছেন। ওর সাথে উষ্ণভাবে করমর্দন করে বসার পর সওয়ার খানের প্রশ্ন, 'আচ্ছা খলিল, জানো তো কাল শবেবরাত, তাই না।' আমি হ্যাঁ বলার পর তিনি জানতে চাইলেন শবেবরাত রাতটির তাৎপর্য কি এবং এর গুরুত্ব কোথায়। প্রথমে আমি বুঝি নি ওঁরা দু'জন আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন। তাঁদের সামনে সেদিনকার খবরের কাগজ পড়ে ছিল, শবেবরাতের তাৎপর্য ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধ ওপরের পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছে।

আমি স্বাভাবিক মনে শবেবরাতের ব্যাখ্যা দিলাম এবং এও বললাম যে প্রচলিত বিশ্বাস আছে ওইদিন আমাদের ভাগ্য লেখা হয়, তবে এর কোনো প্রমাণ নেই।

ওঁদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম যখন সওয়ার খান প্রশ্ন করলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা এসব জানে কি না এবং দিনটি পালন করে কি না। হাসতে হাসতে এও বললেন যে, আমি হয়তো এসব জ্ঞান পশ্চিম পাকিস্তানে এসেই লাভ করেছি।

বলাবাহুল্য, ওঁদের সাথে কোনো আলোচনা অর্থহীন।

সেদিনকার পত্রিকা না পড়লে এঁরা শবেবরাত সম্বন্ধে নিজেরাও জানতেন না। পত্রিকা পড়েই তাঁরা আমাকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পদবিতে তফাত হলেও এঁরা বন্ধু। কারণ, হয়তো-বা এঁরা দু'জনই ঝিলাম কিংবা পিণ্ডি জেলার একই প্রত্যন্ত অনুর্বর এলাকার অধিবাসী, সেনাবাহিনীর চাকরি ব্যতীত এঁদের অন্য জীবিকা দুর্লভ।

বলাবাহুল্য, পূর্ব পাকিস্তান ও বাঙালিকে জড়িয়ে এঁরা আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন তাতে একদিকে যেমন নিজেদের ব্যক্তিগত মূর্খতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে বাঙালি মুসলমান তথা বাঙালিদের সম্বন্ধে তাঁদের প্রকট অবজ্ঞা। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ পাকিস্তানি অফিসার অনুরূপ অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতেন বাংলাদেশ ও বাঙালি সম্বন্ধে। তেমনি পর্বত প্রমাণ ছিল তাঁদের অজ্ঞতা।

আমরা বাঙালিরা এও জানতাম, এঁদের এ চরম মূর্খতার অবসান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে গণতন্ত্র আসতে পারে না। হয়তো মার্শাল ল'র অবসানও সম্ভবপর নয়। ইতোপূর্বেকার এরকম আরো অনেক ঘটনার মতো সেদিনও নতুন করে অনুভব করেছিলাম যে, দক্ষিণ এশিয়ার এই পৃথক দু'অংশকে নিয়ে

একটি একক দেশ গঠন ছিল অবাস্তব।

আমি উত্তর না দিয়ে উঠে পড়লাম দেখে সওয়ার খান বললেন, 'খলিল, তুমি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও নি। এছাড়া আমার আরও একটি প্রশ্ন আছে।'

প্রচণ্ড রাগ দমন করে হাসিমুখে বললাম, 'স্যার, শবেবরাত সম্বন্ধে আমি কবে জ্ঞান লাভ করেছি মনে নেই। বাঙালি মুসলমানরা শবেবরাত সম্বন্ধে জানে কি না তাও আমার জানা নেই। তবে আমি আপনাদের একটি প্রশ্ন করবো। কথা দিন 'সত্য' উত্তর দেবেন। কারণ মিথ্যে বললে আমি বুঝতে পারবো এবং এ সম্বন্ধে আরও প্রশ্ন করবো।'

উভয়ে হ্যাঁ-সূচক ভাব প্রকাশ করে মাথা নাড়ার পর জিগ্যেস করলাম, 'আপনারা দু'জনে কি আজ আপনাদের সামনে পড়ে থাকা পত্রিকাটি পড়ার পূর্বে জানতেন শবেবরাত বাস্তবপক্ষে কি? কিংবা এই দফতরে যতো পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার আছেন তাঁদের কেউ কি শবেবরাতের সত্যিকার অর্থ জানেন? আপনাদের উত্তর কিন্তু সত্যি হতে হবে।' বলাবাহুল্য, দু'জনের ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল। উত্তর দিলেন না কেউই।

সওয়ার খান অনেকটা লজ্জার সাথে বললেন, 'খলিল, দু'মিনিটের জন্য বসো।' বসলাম। তিনি বললেন, 'আমি দুঃখিত যে প্রশ্নটা করা আমার ঠিক হয় নি। সত্যি বলতে কি, আমি শবেবরাতের সঠিক ইতিহাস ও তাৎপর্য জানতাম না। তুমি কিছু মনে করো না। তবে আমার আরও একটি প্রশ্ন আছে। এই কর্নেল সায়গল পূর্ব পাকিস্তানে বরিশাল জেলায় মার্শাল ল'র সময় কাজ করেছে। সে বলছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মশিক্ষা অর্থাৎ দ্বীনিয়াত শিক্ষা দেয়ার জন্য মুসলমান শিক্ষকের অভাব। তাই সেখানে বেশিরভাগ স্কুলে হিন্দু শিক্ষকরাই ইসলাম ও দীনিয়াত পড়ায়। ও নাকি নিজে দেখেছে। তাই না সায়গল?' সায়গল সায় দিলেন, 'আমি দু'একটা স্কুলে তাই দেখেছি।'

আমার রাগের মাত্রা আর এক ধাপ চড়ে গেল। তবে শান্ত সুরেই বললাম, 'সায়গল, তুমি সেনাবাহিনীতে আমার সতীর্থ। সেনা শিক্ষা স্কুলে যেটুকু তোমাকে যা দেখেছি তাতে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তুমি সেনাবাহিনীতে মনোনীত হলে কি করে। তোমার মধ্যে প্রয়োজনীয় নিম্নতম যোগ্যতাও দেখি নি। আজ আবার আশ্চর্য হচ্ছি, তুমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদ পর্যন্ত উঠতে পেরেছো দেখে। সে যাই হোক, তুমি কি করে বুঝলে যে শিক্ষকটি হিন্দু না মুসলমান? আর এটা কি করে বুঝলে যে তিনি ধর্ম পড়াচ্ছিলেন নাকি ইতিহাস? এতোটা বোঝার মতো বাংলা জ্ঞান তো তোমার নেই?'

সওয়ার খানের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এই আমার উত্তর। এবার অনুমতি করুন আমি যাই।' বলে চলে এলাম। তবে আসার পূর্বে এই কথাটা বলতে বলতে এলাম যে, সায়গলের মতো অফিসার যে সেনাবাহিনীতে আছে, সেই সেনাবাহিনী

দেশ শাসন করছে। তাই আমার সংশয় এ দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়।

উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে পরিস্ফুট হবে যে, পাকিস্তানি মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর অফিসাররা, যতো মূর্খ বা জ্ঞানী হোক না কেন, বাঙালিদের সম্বন্ধে কতোগুলো পূর্ব ধারণার ক্ষেত্রে একান্তভাবেই সমমনা ছিল। প্রথমত, বাঙালি যেমন মুসলমান হোক না কেন, কোনোভাবে তারা পাকিস্তানি তথা পাঞ্জাবি মুসলমানদের সমকক্ষ নয়। দ্বিতীয়ত, জাতিগতভাবে তারা নিচু শ্রেণী থেকে আগত। তৃতীয়ত, তারা দরিদ্র। অতএব, স্বাভাবিক চিন্তা ও ন্যায়শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বাঙালিরা পাঞ্জাবি সামরিকতন্ত্রের পোষ্য। সামরিকতন্ত্রের অন্যতম দায়িত্ব বাঙালি মুসলমানদেরকে ভারতীয় হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ থেকে সার্বক্ষণিক প্রতিরক্ষা প্রদান করা। পাঞ্জাবিদের দ্বারা কাঁধে তুলে নেয়া এই অসামান্য দায়িত্ববোধের বিনিময়ে বাঙালি মুসলমানদের কর্তব্য একদিকে যেমন সাচ্চা মুসলমান হওয়া, অন্যদিকে তেমনি পাঞ্জাবি মুসলমানদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও চির অনুগত থাকা।

পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঠিক এই মনোভাবের বিরুদ্ধেই বাঙালি সোচ্চার হয়েছে বারবার এবং পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। সোচ্চার হয়েছে ১৯৪৮ সালে, মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সেই ঘোষণার প্রতিবাদে যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ১৯৫৪ সালে ভোটের মাধ্যমে প্রতিবাদ করলো মুসলিম লীগ সরকারের পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে। বাঙালির অধিকার আদায়ে সমগ্র বাঙালি জাতি রুখে দাঁড়িয়েছে ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে।

বিভাগ-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অর্থাৎ পাকিস্তান অর্জনের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কেও এই মধ্যবিত্ত ও অর্ধশিক্ষিত সামরিক এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রের তেমন কিছু জানা ছিল না। অন্যদিকে এ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা কিছু জ্ঞান থাকলেও এই সংগ্রামে বাঙালির ভূমিকার চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিজেদের ভূমিকা বেশি উজ্জ্বল ভাবার প্রবণতা প্রকট ছিল। এদেরকে মনে করিয়ে দিতে হতো যে, নেহায়েত অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তান চেয়েছিল এবং এজন্য সংগ্রামও করেছে, এর পক্ষে সামগ্রিকভাবে ভোট দিয়েছে। পাকিস্তানে একমাত্র সিন্ধু প্রদেশের জনগণ ও সরকার ব্যতীত পাকিস্তানের পক্ষে প্রাথমিক স্তরে কোনো মুসলমান-প্রধান প্রদেশ ছিল না।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় এবং ইতিহাসের পরম কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণ করার পর, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কেউ কেউ স্বীকার করতে শুরু করেছে যে তাঁরা নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পশুসুলভ অত্যাচার চালিয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মেলের মন্তব্য

এ ক্ষেত্রে জলজ্যান্ত এক উদাহরণ হচ্ছে ১৯৭১ সালে হিলি সেক্টরের ব্রিগেড কমান্ডার (পরে মেজর জেনারেল) তোজাম্মেল হুসেনের মন্তব্য। পূর্বেই বলা হয়েছে এই ব্যক্তি আমার বন্ধু। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে যুদ্ধের জন্য যাওয়ার পূর্বে আমি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলাম, 'তুমি ওখানে যেও না। কারণ ওখানে সব শেষ হয়ে গেছে।' কিন্তু তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'না সব শেষ হয় নি। আমি বাঙালিদের জানি। তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ইমানদার মুসলমান। তারা পাকিস্তানি কমান্ডারদের কাছ থেকে সুনেতৃত্ব পেলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাধ্য নেই আমাদেরকে পরাজিত করে। আমি সেই নেতৃত্বই সেখানে দিতে চাই।' আমি আর ওকে বলতে পারি নি যে ভারতীয় বাহিনী তোমার শত্রু ঠিকই; কিন্তু তাদের চাইতেও ভয়ঙ্কর শত্রু বাঙালি এবং মুসলমানরা। এমন ঘৃণ্য কাজ তোমরা করেছ ওখানে যে গোটা বাঙালি জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রাণপণ যুদ্ধে লিপ্ত।

এই তোজাম্মেলই যুদ্ধের পর তাঁর রচিত বইয়ে খোলাখুলি অনেক কথা লিখেছেন। সম্প্রতি পাকিস্তান সেনাবাহিনী সমর্থিত *ডিফেন্স জার্নাল* মাসিক পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২০০১ সংখ্যায় লিখেছেন, 'ওখানে (বাংলাদেশে) বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে এনে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করতো ও তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতো।' তিনি আরও লিখেছেন, 'মোটামুটি সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে নজিরবিহীন কাপুরুষতার সাথে আত্মসমর্পণ করেছে—উদ্দেশ্য একটিই, নিজের পৈতৃক জানটি বাঁচানো।' তোজাম্মেল আরও বলেছেন যে, তারা ছিল মার্সিনারি অর্থাৎ ভাড়াটে সৈনিক। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এখানে তাঁর বক্তব্যের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'তখন (১৯৭১ সালের পূর্বে) প্রায় সব সিনিয়র ব্রিগেডিয়ার ও জেনারেলদের আসল পেশা হয়ে উঠেছিল, অর্থের ও স্বার্থের বিনিময়ে যুদ্ধ অর্থাৎ মার্সিনারি ঐতিহ্যে যুদ্ধ। অতএব তারা (পূর্ব পাকিস্তানে) যুদ্ধ করেছিলেন তাদের ইহজাগতিক স্বার্থের জন্য। ১৬ ডিসেম্বর '৭১-এ যখন এই আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটে তখন পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিল চারজন জেনারেল, একজন নৌবাহিনীর এডমিরাল এবং প্রায় ৩০ জন ব্রিগেডিয়ার। এরা সবাই মিলে নিয়াজীকে আত্মসমর্পণে বাধা দিতে পারতো; কিন্তু তাদের সেই নৈতিক সাহস ছিল না।'

পাকিস্তানি ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালিদের প্রতি মুক্তিবাহিনীর বর্বরোচিত কার্যক্রম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তোজাম্মেল বলেন, 'জেনারেল টিক্কা খান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল (তখন ব্রিগেডিয়ার) আরবাব নিজেদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কসাই হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। ঠিক এদের মতো অনেক

জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারও অনুরূপ বর্বরোচিত কার্যে লিপ্ত ছিল। এই কার্যক্রমের প্রতিশোধ হিসেবে মুক্তিবাহিনীও হয়তো অনুরূপ বর্বরোচিত প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হতে পারে; কিন্তু পাকিস্তানিদের বর্বরতার অনুপাতে তা ছিল নিতান্তই নগণ্য।'

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তোজাম্মেল আন্তরিকভাবে একজন সাহসী ও সৎ সৈনিক ছিলেন এবং বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীলও ছিলেন। কিন্তু ওই প্রবন্ধে তাঁর আরেকটি মন্তব্য বাঙালি সম্বন্ধে সাধারণ পাঞ্জাবি মধ্যবিত্ত মানসিকতার অপর একটি দিকও অত্যন্ত প্রোজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। তিনি যখন ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করেন তখন পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য কোনো অফিসার রাজি হতেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বদলি করলে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হতেন। সেক্ষেত্রে তিনি এই অসময়ে যাওয়ার জন্য এতো উদগ্রীব ছিলেন কেন? এ সম্বন্ধে জিগ্যেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, '(ভারতীয়) আগ্রাসনের ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা আমাদের পূর্ব পাকিস্তানকে তো মুসলিম ইতিহাসের স্পেন হতে দিতে পারি না।'

সকল পাকিস্তানি বাঙালিকে ঘৃণা করতো তা ঠিক নয়। কিংবা তাদেরকে তারা অপছন্দ করতো তাও ঠিক নয়। তাদের বেশিরভাগেরই একটা বন্ধুসুলভ মনোভাব ছিল বাঙালি সম্বন্ধে। কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হতো অন্য এক জায়গায়। পাকিস্তানিরা জাতিগত, গোষ্ঠীগত ও কৃষ্টিগতভাবে বাঙালিকে কিছুতেই তার সমকক্ষ ভাবতে পারতো না। বাঙালির যে নিজস্ব একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সত্তা আছে সেটা তারা ভেবেও দেখতো না, জানতেও চেষ্টা করতো না। এমনি মনোভাব স্বয়ংসিদ্ধভাবে গড়ে উঠেছিল তাদের মনে। তাই সৎ, সাহসী ও সহানুভূতিশীল হয়েও তোজাম্মেল ধরে নিয়েছিলেন যে, বাঙালি নিরাশ্রয়, অসহায়। অতএব, তাদেরকে রক্ষা করা একজন মুসলিম হিসেবে তাঁর ইমানের অঙ্গ।

এই সহানুভূতিশীল তোজাম্মেল সংশ্লিষ্ট আরও দুটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করলে তাঁর ও তাঁর মতো অন্য পাকিস্তানির মনমানসিকতা আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

১৯৬৩ সালে আমরা একসাথে তুরস্কে তুর্কি ভাষা শিখি ও দু'জনে এক সময় একই বাসা ভাড়া করে অন্য চারজন ছাত্র থেকে আলাদা থাকি। সেই সময়কার একটি ঘটনা। আমরা সবাই ক্লাসে একত্র হয়েছি। দু'ক্লাসের মাঝখানে চায়ের বিরতি। কে একজন জানালো যে আজকের পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে চারটি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল স্থাপন করার জন্য পাকিস্তান বহির্দেশ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছে। আমাদের মধ্যে আমি একাই বাঙালি এবং সবাই মেজর পদবির। একজন বললেন, 'এই চারটি হোটেলের দুটি নিশ্চয়ই পশ্চিম

পাকিস্তানে হবে আর দুটি হবে পূর্ব পাকিস্তানে। খলিল, তোমার কি মনে হয়? আমার তো মনে হয় একটি ডাকায় অন্যটি চাটগাঁয় হবে। কি বলো।' আমি উত্তর দিলাম না। বাঙালির প্রতি সহানুভূতিশীল প্রতিবাদী কণ্ঠ, তোজাম্মেল হেসে হেসেই বললেন, 'খলিল কি বলবে? সরকারের ইচ্ছে হবে চারটেই পশ্চিম পাকিস্তানে, করাচি, লাহোর, পিণ্ডি ও পেশাওয়ারে হোক। কিন্তু ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে মনে করে হয়তো একটা ঢাকায় হতেও পারে। পেশাওয়ার বাদ যাবে? খলিল কি বলো?'

বাংলাদেশের ওপর যে অবিচার হচ্ছে এটা তোজাম্মেলের কথায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেত। কিন্তু এই তোজাম্মেলও মনেপ্রাণে বাংলা ও পাঞ্জাবির সমকক্ষতা মেনে নিতে পারতেন না। একদিন কথায় কথায় বললেন, 'হ্যাঁ, বাংলা ভাষা আমাদের শেখা উচিত।' তারপর একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে ঠাট্টার সুরে বললেন, 'তবে খলিল আমি এ জীবনে ওই হিন্দুর ভাষা, বাম থেকে ডান দিকে লেখা অক্ষর আমার কলমে লিখতে পারবো না।' কথাগুলো তিনি আমাকে ইংরেজিতেই বলছিলেন এবং কথাগুলো যদি লিখতেন তবে বাম থেকে ডান দিকেই লিখে যেতেন। এখানে হয়তো আইয়ুব খানের লেখা ও সমগ্র পাকিস্তানে জোর করে সবাইকে পড়ানো, ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স বইটির কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। সেখানে আইয়ুব খান অত্যন্ত পরিষ্কার করে লিখেছেন যে, বাঙালি একটি ভিন্ন জাত ও নিচু জাত।

লে. জেনারেল হামিদ গুল

বাঙালির প্রতি পাকিস্তানি মনোভাব সম্বন্ধে লে. জেনারেল হামিদ গুলের মন্তব্যও আমাদের উক্ত ধারণার পক্ষে আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল হামিদ গুল (পাঠান) ২০০১ সালের ১৪ জানুয়ারি পাকিস্তানের উর্দু *দৈনিক* জং-এর সাময়িকী বিভাগে নিজস্ব মতাদর্শ প্রকাশ করে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। উর্দু ভাষার সাক্ষাৎকারটির কিয়দংশ বাংলা অনুবাদ করে জাফর আলম *দৈনিক জনকণ্ঠ* ৯ এপ্রিল ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন।

গুল তাঁর প্রশ্নোত্তরে এক জায়গায় বলেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে যখন বন্যা হলো, লোক মারা গেল, পশ্চিম পাকিস্তানিদের ধারণা সেখানে কিছু পোকামাকড় মারা গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কারও সহানুভূতি ছিল না।'

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'আমি সে সময়ও (১৯৭১) বলেছি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আমাদের যে অনুভূতি ও সহানুভূতি থাকা উচিত ছিল তা সমগ্র জাতিতে ছিল না। আমরা তাদেরকে পৃথক জাতি মনে করতাম।'

পাঞ্জাবি মেজর আতাউল্লাহ

এবার পুনরায় আমার মেহমান পাঞ্জাবি মেজর মাহমুদ আতাউল্লাহর প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ১৬ ডিসেম্বর '৭১-এর বিজয় দিবসের ঘটনার কয়েক দিন আগে তিনি এসে হাজির। আমার বাসায় বেশ কয়েকজন বাঙালি আসতেন, আড্ডা দিতে ও যুদ্ধের খোঁজখবর নিয়ে আনন্দ করতে। মাহমুদ আতাউল্লাহর আগমনের পর সে আড্ডাটিই বন্ধ হয়ে গেল। অনেকটা নিম্নগ্রামে হলেও বিজয় উপলক্ষে আনন্দ-উল্লাস করবো, ভালো খাওয়া-দাওয়া করবো—সেটাও বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকে চাকরিতে বদলি হয়েছে– সেই স্থানান্তরের নিয়োগপত্র নিয়ে বাঙালি লেফটেন্যান্ট কর্নেল জলিল ওই সময়ই এসে হাজির। শহরে ব্ল্যাকআউট অর্থাৎ সব অন্ধকার। পথে বেরুনো নিরাপদও নয়। বাসায় বসেই আড্ডা জমতো। আগেই বলেছি, যুদ্ধ কেমন চলছে সে সম্বন্ধে মেজর মাহমুদের কোনো ধারণা ছিল না, জানার ইচ্ছেও তেমন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ ১৬ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের অজেয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চরম পরাজয় ও পূর্ব পাকিস্তানে নব্বই হাজার দেশপ্রেমিক সাহসী সৈনিকের আত্মসমর্পণ মেজর মাহমুদকে হতভম্ব করে দিলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খলিল, ইয়ে কেয়া হো গেয়া?' চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত। এই দেখে আমরা কোথায় আনন্দ-উল্লাস করবো, তার পরিবর্তে মেজর মাহমুদকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য মুখে বিষণ্ণতার ভাব এনে বসে রইলাম।

অতি কষ্ট করে হলেও আমি মাহমুদের মনে আঘাত দেয়া থেকে বিরত থাকতাম; কিন্তু বিকেলে চা পর্ব থেকে শুরু করে রাতের খাওয়া পর্যন্ত লম্বা আলোচনায় যখন যুদ্ধ সম্বন্ধে কথা উঠতো, তখন অনেক সময় জলিল ক্ষোভে ফেটে পড়তেন। ফেটে পড়ার কারণও ছিল। সেই সময়ে তাঁকেও একেবারে বিনাদোষে বন্দি করে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তিনি বলতে চাইতেন পূর্ব পাকিস্তানে কি কি ঘটেছে। কিন্তু মাহমুদ অনেকটা আশ্চর্যান্বিত মুখভাব নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতেন যে, ওখানে তো শুনেছি আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা বিহারিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল এবং তাই থামাতে গিয়ে পাকিস্তান বাহিনীকে কিছুটা অ্যাকশন নিতে হয়েছে। তারপর তো শুনেছি সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জলিল যখন তাঁকে উত্তপ্ত স্বরে বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে ওখানে পাকবাহিনী ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করেছে। মাহমুদ চরম অবিশ্বাস নিয়ে উত্তপ্ত স্বরে বলতেন যে, কই এসব তো তিনি শোনেন নি। এসব নিশ্চয়ই ভারতীয়রা প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্যে প্রচার করেছে এবং প্রবাসী বাঙালিরা সব ভুল তথ্য পেয়েছে।

এই ছিল পাকিস্তানিদের মাইন্ড-সেট।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা

ডিসেম্বর মাসে আমার বাসায় কয়েকদিন অবস্থানের পর জলিল ও তারপর মেজর মাহমুদ চলে গিয়েছিলেন। এর কয়েকদিন পর এলেন বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এবং তারও কয়েকদিন পর এলেন কর্নেল ইয়াসিন। এরা দু'জনেই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলার সাক্ষী ছিলেন।

এই মামলার বিশদ বিবরণ না দিলে বর্তমান কাহিনী অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। তাছাড়া, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকার আয়োজিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে মামলা ও সেজন্য সাক্ষী-সাবুদ তৈরির গোপন ইতিহাস সবারই জানা প্রয়োজন। মামলার শুনানি হয়েছিল লায়ালপুর জেলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। লায়ালপুর পাঞ্জাবের একটি জেলা শহর। লাহোরের দক্ষিণ দিকে ঊষর ও অত্যন্ত গরম আবহাওয়ার জন্য কুখ্যাত একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। কয়েদির নিরাপত্তা ও তার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টির বিবেচনায় উপযুক্ত স্থান।

১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে সামরিক প্রশাসন স্থির করলো, শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরতরে ঠাণ্ডা করে দেয়া যাবে এবং এভাবে বাঙালিদের কবজায় রাখতে হবে। সংখ্যাধিক্যের ভোট মারফত প্রদত্ত রায় তলিয়ে যাবে শেখ মুজিবের কবরে।

কিন্তু একটি আন্তর্জাতিক সমস্যাও ছিল। সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে শেখ মুজিব পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করেন। আন্তর্জাতিক ও গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী নিঃসন্দেহে শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা এবং পাঞ্জাবি আধিপত্যাধীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য ব্যারাকে ফিরে যাওয়াই ছিল একমাত্র পথ। কিন্তু তা না করে পাকিস্তান সেনাপ্রশাসক দেশের বৈধ ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে বন্দি করলো। তাই পৃথিবীর সমস্ত অগ্রসর দেশের পক্ষ থেকে দাবি

উঠতে লাগলো, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হোক এবং পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন চালু করা হোক। এই শক্ত আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ছিল পাকিস্তানের সামরিক শাসক।

এ কারণেও সামরিক শাসক ভাবলো যতো অবিশ্বাস্যই হোক, কোনোরকম প্রহসনমূলক বিচারে মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করে যদি মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকর করা যায় তারপর আন্তর্জাতিক বিরোধিতাও ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়বে। কারণ যার জন্য এই দাবি সেই ব্যক্তিই তো মৃত। আরও বড় কথা, আমেরিকা ও চীন নিজেদের জাতীয় স্বার্থে পাকিস্তানকে সমর্থন যুগিয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতি তো স্রেফ নীতি কথা, জাতীয় স্বার্থের অনেক নিচে তার স্থান।

অতএব, সিদ্ধান্ত হলো শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা সাজাতে হবে এবং তাঁকে অপরাধী প্রমাণ করে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে। সেই অনুসারে স্থির হলো যে, লায়ালপুর জেলে একটি কোর্ট মার্শাল গোছের বিশেষ আদালত কেবল এই জন্যই স্থাপন করা হবে। কোর্টের প্রেসিডেন্ট হবেন একজন ব্রিগেডিয়ার, নাম রহিমউদ্দিন। রহিম ছিলেন পাঠান, চাকরিতে আমার বছরখানেক জ্যেষ্ঠ।

শেখ মুজিবকে জিগ্যেস করা হলো তিনি যে উকিলই চান ডিফেন্স কাউন্সিল হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হবে। ব্যয়ভার সরকারের। বলাবাহুল্য, মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে মুজিব উত্তর দিলেন যে, তিনি পাকিস্তানিদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক আদালতকে কোনো আদালত বলে মানেন না। ইয়াহিয়া খানকে যেন বলা হয় যে, সে যা খুশি তাই করতে পারে, মুজিবকে যদি হত্যা করতে চায়— তা সে স্বচ্ছন্দে করতে পারে। বিচারের নামে কোনো প্রহসন করতে হবে না। মুজিব এই প্রহসনের আদালতকে কোনোভাবে স্বীকৃতি দেয় না; কিন্তু আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে সামরিক সরকার সিন্ধুর প্রখ্যাত আইনজীবী এ কে ব্রোহিকে ডিফেন্স কাউন্সিলর নিযুক্ত করে। তবে মুজিব ব্রোহির সাথে কথা বলা দূরের কথা, তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়েও দেখেন নি।

একাত্তর সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এই প্রহসনের বিচার শুরু করা হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তিকে দিয়ে সাক্ষ্য দেয়ানো হয়েছিল। কিন্তু আসল সাক্ষী ছিলেন তিনজন সেনা অফিসার—ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার, লে. কর্নেল মুহাম্মদ ইয়াসিন ও লে. কর্নেল মাসুদুল হুসেন খান। মামলাটি দাঁড় করানো হয়েছিল বাঙালি সেনা অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত একটি ষড়যন্ত্র ঘিরে। তথাকথিত ষড়যন্ত্রটি হয়েছিল জয়দেবপুর রাজপ্রাসাদে, ১৯৭১ সালের প্রথমদিকে। সেখানে তখন মোতায়েন ছিল দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট। তার অধিনায়ক ছিলেন কর্নেল মাসুদ। ষড়যন্ত্রটিতে জেনারেল ওসমানী, মজুমদারসহ সব বাঙালি সিনিয়র

অফিসার জড়িত ছিলেন। ষড়যন্ত্রের কথিত সিদ্ধান্ত ছিল যে, সমস্ত বাঙালি সৈনিক অতর্কিতে পাকিস্তান সেনাছাউনিতে পাঞ্জাবি সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আক্রমণ করবে ও তাদের অস্ত্রাগার দখল করে নেবে। এরপরে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় থাকবে না, অতএব পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে।

এই অর্বাচীন যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো মতামত দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এই ষড়যন্ত্রের আদেশদানকারী ছিলেন শেখ মুজিব। অতএব, বিদ্রোহের মূল নেতা শেখ মুজিব। দেশদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কথা-কাহিনীটি পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের মস্তিষ্ক নির্গত এবং খুব সম্ভব ১৯৭১ সালের মে-জুন মাসের দিকে গড়া। গোটা পরিকল্পনা অবশ্য ইয়াহিয়া খান দ্বারা অনুমোদিত।

কিন্তু মামলাটি যতো হাস্যকর হোক না কেন, এটি সাক্ষীদের জন্য ছিল বিধাতার দেয়া চরমতম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এই মিথ্যে মামলার সাক্ষ্য তৈরি করার জন্য যে অবিশ্বাস্য রকমের অমানবিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ পরে দেয়া হয়েছে— প্রত্যেক সাক্ষীর ওপর পরিচালিত নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরে। যাই হোক, কোনো ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটুক আর নাই ঘটুক সামরিক শাসকের পরিকল্পনা অনুযায়ী লায়ালপুর জেলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হলো এবং যতো দূর শুনেছি তাঁর মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হলো।

এই বিচারের ব্যাপারটি খুব অল্পসংখ্যক পাকিস্তানি অফিসারই জানতো। তাদেরকে সব খবর বিশেষ জানতেও দেয়া হতো না। তবে আমার অনুসন্ধিৎসা স্বভাবত ছিল প্রবল। কিছু জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের মাধ্যমে, কিছু অন্তরঙ্গ পাকিস্তানি অফিসারদের মাধ্যমে, কিছু আমার চাইতে স্বল্প-প্রবীণ ব্রিগেডিয়ার রহিমউদ্দিনের (তিনিই ছিলেন বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি) বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনে ভাসা ভাসা খবর রাখতাম। জেনারেল ওয়াসি, বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজিদুল হক ও আমার গৃহ অতিথি ব্রিগেডিয়ার কুদ্দুসের সাথেও এ-বিষয়ে আলোচনা করতাম। আসল খবর জানতে প্রাণপণ চেষ্টা করতাম।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বন্দিজীবন ও নির্যাতন

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আনীত মামলা সংক্রান্ত খবরাখবর জানতে আমার ঔৎসুক্য ছিল। তাই ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সাথে দেখা হওয়ার পর 'ঘোড়ার মুখ থেকেই' ঘটনাটি শোনার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলো; কিন্তু মজুমদার তখনও শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তবে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পর তাঁর ভগ্ন মন নতুনভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বিশেষ আনন্দে কাটছে আমাদের সময়।

তাহলেও আমি সাক্ষী দেয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপনের মতো সাহস কিংবা হৃদয়হীনতার কাজটি করে উঠতে পারি নি।

একদিন কর্নেল এমদাদ (ডাক্তার) তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে গল্প করতে এসেছেন আমার বাসায়। বিকেলের চায়ের সময়। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারও আছেন। এমদাদের স্ত্রী, ডাকনাম কলি, ছেলেবেলা থেকেই আমার শ্বশুরবাড়ির প্রতিবেশী। দুই পরিবার ছিল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। আমি যখন কলিকে দেখি তখন তার বছর দশেক বয়স। আমার স্ত্রীকে আপা ডাকতেন এবং ছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। এঁরা দু'জন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারেরও পূর্ব-পরিচিত। তিনজনই সিলেট অঞ্চলের লোক বলে হয়তো-বা আত্মীয়ও।

কলিই অবতারণা করলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বন্দিজীবনের প্রসঙ্গ। একটু পরে মজুমদার সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'কলি, তোমরা যখন শুনতে চাচ্ছ তখন আজ গোটা কাহিনী তোমাদের শোনাবো। ভাবি, আরো এক কাপ চা দিন, আর ফায়ার প্লেসে আরো কয়লা দিতে বলুন।'

১৯৭১-এর মার্চ মাসে তিনি ছিলেন চট্টগ্রামস্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ই বি আর সি)-এর কমান্ডান্ট (অধিনায়ক)। আটটি বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পাকিস্তানের অন্যান্য কোরের জন্য, অর্থাৎ সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য যতো নবীন বাঙালি সৈনিক ভর্তি করা হতো তাদের সকলের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এখানেই হতো। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল কারো ছ' মাস, কারো ন' মাস, আবার কারো ক্ষেত্রে বছর পর্যন্ত। বছরের সকল সময়ে এই রিক্রুট সংখ্যা কয়েক হাজার থাকতো।

তখন ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন অর্থাৎ মার্শাল ল চলছে। চট্টগ্রামের মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (এম এল এ) ছিলেন ঢাকার মেজর জেনারেল আনসারী। স্থানীয়ভাবে চট্টগ্রামে থাকতেন ডেপুটি এম এল এ। জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ডি এম এল এ হন মার্চের ৪ তারিখে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয়ার পর বঙ্গবন্ধুর ডাকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার কার্যত শেখ মুজিবের নিজের হাতে তুলে নেয়ার পর দেশ ও রাজনীতি অবর্ণনীয়ভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। সেই সময় চট্টগ্রামে বিহারি ও বাঙালিদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে। সেই দাঙ্গা ঘটে মজুমদারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার আগেই। কিন্তু মজুমদার স্বয়ং দেখেছেন ও জেনেছেন যে সেই দাঙ্গায় বিহারিদের চাইতে বাঙালিরা বেশি হতাহত হয়েছে। বস্তুত, দাঙ্গা বিহারিরাই শুরু করে।

দায়িত্ব নেয়ার পর মজুমদারকে আদেশ দেয়া হয় এই দাঙ্গা সম্বন্ধে ঢাকায় তাঁর প্রতিবেদন পাঠাতে। মজুমদার ঘটনার সত্য বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেদন পাঠান;

কিন্তু ঢাকার কর্তৃপক্ষ তো সত্য শুনতে চায় নি। অতএব, প্রতিবেদনটি তাদের মনোমত হয় নি। তারা লিখে পাঠালো যে, প্রতিবেদনটি একপেশে। এই সময় কুখ্যাত 'সোয়াত' জাহাজ পাকিস্তান থেকে সামরিক সরঞ্জাম বহন করে এনে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সামরিক আঘাত হানা ব্যতীত বাঙালিদের পাকিস্তানের শাসক হওয়ার মতো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ দমন করা যাবে না— এ সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়েছিল। এই কাহিনীতে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্ত লারকানা ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৭১-এর ১০ ফেব্রুয়ারি নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সামরিক আঘাত হানার জন্য যথেষ্ট সৈন্যবল ও সামরিক সরঞ্জাম পূর্ব পাকিস্তানে মজুদ ছিল না। তাই স্থির হলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় সৈন্য ও সরঞ্জাম ঢাকায় প্রেরণ করা হবে। এই খবরটি জেনারেল ওয়াসি তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে (বাঙালি) দিয়ে জেনারেল ওসমানীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরপরই। অতএব, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পাকিস্তান সামরিক শাসকের পরিকল্পনা সম্পর্কে আগে থেকেই জেনেছিলেন।

সোয়াত জাহাজ সম্বন্ধে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন ছিল। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নিখুঁতভাবে সামরিক শৃঙ্খলা অনুসরণের ব্যাপারে মজুমদার যে একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন তা নয়। বাঙালির প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণে পাঞ্জাবিদের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন না, এমন কেউ তখন ছিলেন না বললে অত্যুক্তি হবে না।

আর এক্ষেত্রে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের মনোভাব নিয়ে তো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি ছিলেন একজন উন্নত চেতনার গর্বিত বাঙালি, প্রবীণ সামরিক কর্মকর্তা। তাঁর পক্ষে এই অত্যাচারী পাঞ্জাবিদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নই আসে না। অতএব, তিনি সোয়াত জাহাজ থেকে ওই অস্ত্র নামাতে সাহায্য করবেন, যা তাঁর নিরীহ ও নিরস্ত্র দেশবাসীর বুকে আঘাত করবে, সেটা হতে পারে না। বস্তুত, তিনি নিজে আগ্রহ করে এই সাহায্য পাকিস্তানিদের করেন নি। তবে তাঁর এই অনাগ্রহ যথাসম্ভব বাইরেও প্রকাশ পায় নি। কিন্তু এটাকে তখন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা মজুমদারের অনীহা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কর্নেল সিদ্দিক সালেকের '*উইটনেস টু সারেন্ডার*' বইতেও পাকিস্তানিদের এই মনোভাব পরিষ্কারভাবে বিধৃত হয়েছে।

অতএব মজুমদারকে অতি ধূর্ততার সাথে মিথ্যা বলে ২০ মার্চ ঢাকায় এনে গৃহবন্দি করা হয়। উদ্দেশ্য চট্টগ্রামে অবস্থিত বাঙালি সৈনিকদের নির্বিঘ্নে নিরস্ত্র করা, প্রয়োজনবোধে হত্যা করা যেন সহজ হয়। সিদ্দিক সালেকের বইয়ে 'অপারেশন সার্চলাইট' (পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আঘাত হানার পরিকল্পনার ছদ্মনাম)-এর লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মজুমদারকে ঢাকায় এনে

অন্তরীণ করা হবে এবং সেখানকার বাঙালি লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীকে প্রথম রাতেই (২৫ মার্চ) বন্দি করা হবে (বস্তুত তাঁকে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে)।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২৪ মার্চ মজুমদারকে বলা হলো, ঢাকার জয়দেবপুরে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বাঙালি অধিনায়কের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে অন্য একজন বাঙালি লে. কর্নেল রকিবকে। অতএব, সিনিয়র হিসেবে মজুমদারের সেখানে থাকা দরকার। এই বলে মজুমদারকে এক বস্ত্রে আনা হলো ঢাকায়। আনার কাজটি করলেন পাঞ্জাবি জেনারেল আনসারী।

ঢাকায় এসে মজুমদার বুঝতে পারলেন তিনি বন্দি। তাঁর পরিবারের সদস্যদের পরে ঢাকায় আনানো হলো। এরপর এপ্রিলের প্রথম দিকে তাঁকে সপরিবারে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে লাহোর। সেখানেই তিনি দেখেন যে লে. কর্নেল মাসুদুল হুসেন খানও ওই বিমানে এসেছেন। এঁদের সবাইকে লাহোর থেকে পিণ্ডির পথে ঝিলাম থেকে প্রায় মাইল বিশেক দূরে 'বান্নি' নামক একটি স্থানে সড়ক বিভাগের রেস্ট হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। রেস্ট হাউজটি যেমনি পুরনো, রাত্রিবাসের ব্যবস্থা তেমনি নিম্নমানের। ওপরের কামরা দুটোতে থাকতে দেয়া হলো মজুমদার ও তাঁর পরিবারকে। সিঁড়ির নিচে অতি ক্ষুদ্র একটি কামরাতে থাকতে দেয়া হলো কর্নেল মাসুদকে। মাসুদ একা, তাঁর পরিবার ঢাকা সেনাছাউনিতে।

দু'একদিন পরই মজুমদার বুঝতে পারলেন, কেন তাঁকে এখানে আনা হয়েছে এবং পাকবাহিনীর উদ্দেশ্য কি। এতোদিন পর্যন্ত তাঁকে মোটামুটি ব্রিগেডিয়ারের না হোক, অফিসারের সম্মান দেয়া হতো। বান্নিতে এনে তাঁর সাথে সাধারণ অপরাধী কয়েদির মতো আচরণ করা শুরু হয়। তাঁকে বলা হয়, হয় তিনি কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন, নয়তো শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে সত্য জবাব আদায় করা হবে।

এরপর তাঁকে জয়দেবপুর ষড়যন্ত্র (যা ঘটেই নি এবং যার সবটাই কল্পনা) সম্বন্ধে জিগ্যেস করা হলো। 'জানি না', উত্তর পেয়ে তাঁকে নির্যাতনের প্রথম স্তর হিসেবে বান্নি রেস্ট হাউজের সামনের লনে সারারাত দাঁড় করিয়ে রাখা হলো।

এরপর থেকে তাঁকে ও মাসুদকে আরও পেশাদার গোয়েন্দাদের দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য প্রতিদিন নিয়ে যাওয়া হতো নিকটবর্তী ঝিলাম সেনাছাউনিতে। সেখানে দৈহিক নির্যাতন না হলেও মানসিক নির্যাতনের অন্ত ছিল না। মজুমদার ও মাসুদকে কিন্তু একসাথে এবং এক জায়গায় নেয়া হতো না। তাঁরা জানতেনও না যে অন্যকেও প্রশ্ন করা হচ্ছে (আমিও ওঁদের দু'জনকে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে এ সম্পর্কে জেনেছি)। এই পর্ব চলে প্রায় দু' মাস। তবে সঠিক দিন-তারিখ মনে রাখার অবস্থা কয়েদিদের কারোরই ছিল না।

মজুমদার তাঁর ওপর অত্যাচারের যেসব বর্ণনা দিলেন, তাতে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছিল যে, ওই পরিস্থিতিতে তখন পর্যন্ত তাঁর দৈহিক নির্যাতনের চেয়ে মানসিক যাতনাই ছিল সমধিক ও অসহ্য। তিনি প্রথম জীবনে চাকরি করতেন পাঞ্জাব রেজিমেন্টে। পাঞ্জাবি সৈনিকরা তাঁকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাসা দেখাতো। আর এরাই আজ তাঁকে সাধারণ কয়েদির মতো 'তুই তুকারি' করছে। অথচ তিনি একজন ব্রিগেডিয়ার। তাঁর সাথে বেয়াদবি তো কল্পনাতীত, যাঁর উপস্থিতির কথা শুনলে সৈনিকরা সেই তল্লাটও মাড়াতো না।

ঝিলামের নিকট বান্নি রেস্ট হাউজে আনা পর্যন্ত মজুমদারকে ব্রিগেডিয়ারের প্রাপ্য সম্মানটুকু মোটামুটি দেয়া হচ্ছিল। এখানে এসে যেই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শুরু হলো তখন থেকেই সিপাহি, নায়েক, হাবিলদারদের সুর হঠাৎ করে বদলে গেল। জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল সামরিক অফিসার দ্বারা, কিন্তু শাস্তি পালিত হচ্ছে কিনা তার তদারকির ভার ছিল সিপাহিদের ওপর। এ তদারকির সময় সেই পাঞ্জাবি সিপাহিদের আচরণ মজুমদারের কল্পনারও অতীত ছিল। বান্নিতে আসার পর তাঁকে যখন রাতের খাবার পরিবেশন করা হতো তখন এইসব সিপাহি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে 'সাব' 'সাব' করে কথায় কথায় 'অ্যাটেনশন' হয়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করছিল, সেই সিপাহিদের আচরণে পরদিনই আমূল পরিবর্তন ছিল কল্পনাতীত।

'খলিল তুমি ভাবতে পারবে না, এই সিপাইগুলো যাদের আমি বিশেষ স্নেহ করতাম, যারা আমাকে পিতার মতো মান্য করতো, তারাই এসে আমাকে কর্কশ কণ্ঠে, দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগলো, 'ব্রিগেডিয়ার সাব, বাহার নিকলো। ইস্ জাগা খাড়ে হো যাও'। আমি তো অবাক। এরা বলে কি।'

'এর মধ্যেই একজন গর্জে উঠলো, 'বিরগেডিয়ার, দেখ্ কিয়া রাহে হো—ইধার খাড়ে হো যাও।' নিমেষে মনে পড়লো যেদিন কমিশন্ড অফিসার হিসেবে মনোনয়ন পরীক্ষায় পাস করলাম—সেদিন কি আনন্দ, কি অহঙ্কার। আর যেদিন ব্রিগেডিয়ার হিসেবে পদোন্নতির কথা শুনলাম সেদিন তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। খলিল, বিনা দোষে এই অসম্মান। চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো।'

'এদিকে আর এক তর্জন, 'কিয়া সোচ্‌তে হো, অ্যাটেনশন হোকে খাড়ে হো যাও', বলেই আমার হাত ধরতে গেল। আমি সাত তাড়াতাড়ি ওর কথামতো দাঁড়ালাম। সারারাত আমাকে বাইরে 'লনে' দাঁড় করিয়ে রাখলো। সেদিন আমার চোখের পানি ঝরা থামে নি। আর এ চিন্তাও মন থেকে যায় নি যে কোন্ দোষে আমার এমন চরম অপমান? এর চাইতে ক্ষেতমজুরি ও কুলিগিরি করে খাওয়াও স্বর্গতুল্য মনে হতে লাগলো।'

বান্নি রেস্ট হাউজে জিজ্ঞাসাবাদে মজুমদারের কাছ থেকে গোয়েন্দাদের

কাঙ্ক্ষিত জবাব পাওয়া গেল না। পাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না, কারণ ঘটনাটিই ঘটে নি। অতএব, কয়েক সপ্তাহ পর তাকে নেয়া হলো ঝিলাম ছাউনিতে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ পরিচালনা করে গোয়েন্দা অফিসাররা। এরাও মজুমদারের পরিচিত, কিন্তু অনেক জুনিয়র। অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতি বাক্যে দু'তিনবার করে তারা একসময় 'স্যার স্যার' করতো, অথচ এখন তাদেরই কী ব্যবহার!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ চলতো। এক অফিসার পরিশ্রান্ত হয়ে গেলে যোগ দিতো আর একজন। এই দৈহিক ও মানসিক কষ্টে কাটলো মাস দেড়েক।

তবে জিজ্ঞাসাবাদের ফলাফল একই। 'এরূপ কোনো ঘটনা ঘটেই নি, অতএব ওখানে কি কি সিদ্ধান্ত ও ষড়যন্ত্র হয়েছিল তা বলার প্রশ্নই ওঠে না,' এই ছিল জবাব। এছাড়া অনেক আজেবাজে প্রশ্নও করা হতো, যাতে মজুমদার ভেঙে পড়ে। সেগুলোর উত্তর বারবার করে দিতে হতো। তারপর বলা হতো বাকি দু'জন বন্দি অর্থাৎ কর্নেল ইয়াসিন ও কর্নেল মাসুদ বলেছে যে, তুমি ওইদিন ওখানে ছিলে, সেখানে ছিলে, এই কথা বলেছো, ওই কথা বলেছো ইত্যাদি। মজুমদার বললেন, 'ইয়াসিনকে আন আমার সামনে, আমি তাঁকে প্রশ্ন করবো।' বলা বাহুল্য, তাকে মজুমদারের সামনে আনা হতো না নানা বাহানা করে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, সঙ্গী ভাঙানোর এটি একটি উত্তম উপায়—এক সঙ্গীকে অন্য সঙ্গীর দেয়া সাক্ষ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। মজুমদারকে বলা হতো, ইয়াসিন বলেছে তুমি ঐ ঐ দিন ওখানে ওখানে ওঁর ওঁর সাথে এই এই কথা বলেছো। কথাগুলো ছিল সর্বৈব মিথ্যে। আসলে কথাগুলো পাক গোয়েন্দাদের বানানো। উদ্দেশ্য মজুমদারকে রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ করে দেয়া, যাতে তিনি ভেঙে পড়েন।

মনের ওই দুর্বল অবস্থায় মজুমদার সেগুলো বিশ্বাস করেছেন। প্রয়াত ইয়াসিনের ওপর মজুমদারের এই প্রচণ্ড রাগ ও ক্ষোভ আজ অবধি বিদ্যমান আছে।

এদিকে কর্নেল ইয়াসিনের কথা, 'খলিল, তুমি কি কল্পনা করতে পার যে এই ব্রিগেডিয়ার মজুমদার কতো বড়ো মিথ্যাবাদী? আমি ভাবতেও পারি নি যে একজন সিনিয়র অফিসার, আমার সাথে তেমন জানাশুনোও নেই, একজন বাঙালি হয়ে আর একজন বাঙালির বিরুদ্ধে এ রকম ডাহা মিথ্যে কথা বলতে পারে?'

আমি যতোই তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, দেখুন ইয়াসিন ভাই (ইয়াসিন আমার চেয়ে বয়সে ও চাকরির দৈর্ঘ্যে প্রবীণ ছিলেন), এসব কথা পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের বানানো—সর্বৈব মিথ্যে। কিন্তু তাঁরও মনের আঘাত এমনি ছিল যে তিনি আমার কথা পুরো না শুনেই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'খলিল, তুমি ওই মজুমদার লোকটিকে চেন না।'

আমি একান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করতাম, কেমন অসহায়

অবস্থা হলে, ভূত-ভবিষ্যৎ কতোটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে জন্ম-মৃত্যু-জীবন অর্থহীন মনে হয় এবং মানুষের এই সব সাধারণ সত্যগুলো উপলব্ধির শক্তি লোপ পায়। চরম অমানবিক নির্যাতনের ফলে এই দু'জন পরিপক্ব, শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ অফিসারের মনের অবস্থা এরকমই দাঁড়ায়।

জুলাইয়ের শেষে কিংবা আগস্টের গোড়ায় মজুমদারকে নিয়ে যাওয়া হলো লাহোর ফোর্টে অবস্থিত পুলিশের বিশেষ নির্যাতন সেলে। এই পুলিশ সেলটি বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার ও পীড়নমূলক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত।

পরিবার থেকে আলাদা করে মজুমদারকে আনা হলো লাহোর ফোর্টের নির্যাতন সেলে। জেরা শুরু হলো। জয়দেবপুরের ষড়যন্ত্র। প্রশ্নকারী প্রায় ছ'ফুট লম্বা, পেশিবহুল এক পুলিশ কর্মকর্তা। প্রথমে সে মজুমদারকে 'সাব, আপনি বলুন ওখানে কে কে ছিলেন, কে কি বক্তব্য দিলেন ও কি কি পরিকল্পনা নেয়া হলো', এই ভাষাতেই প্রশ্ন করতে লাগলো। মজুমদার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, প্রথমত, তাঁর জানামতে এ ধরনের কোনো বৈঠক জয়দেবপুরে হয় নি। দ্বিতীয়ত, যদি হয়েও থাকে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। প্রশ্নকারী বিশ্বাস করলো না। পুনরায় প্রশ্ন করলো, 'আমরা জানি, আমাদের নিকট রেকর্ড আছে যে ওই বৈঠক জয়দেবপুরে অমুক মাসে হয়েছে। আর এও জানি যে আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতএব, কি পরিকল্পনা হয়েছে বলুন। আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি কেবল সত্যি কথাগুলো বলে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন। এরপর সসম্মানে আপনাকে সেনাবাহিনীতে পূর্বপদে বহাল করা হবে।'

মজুমদারের বিনীত উত্তর একই, তিনি এসবের কিছুই জানেন না। ঠিক তখনই প্রশ্নকারী মজুমদারের গালে এমন প্রচণ্ড চড় কষালো যে তিনি কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এ রকম একতরফা শারীরিক আঘাত? তাও আবার এই বয়সে, এমন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার হিসেবে? মজুমদার প্রথমে স্তব্ধ ও পরে জ্ঞানশূন্য। পরে যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন তখন অপমানে ও ক্ষোভে চোখ ফেটে পানি। খোদা, এও কি সম্ভব?

পরদিন দ্বিতীয় রকম শাস্তি। প্রশ্ন একই। তাদের বক্তব্য হলো এটা নির্যাতনের মাত্রায় ক্রমিক নং দুই। এই রকম একুশটি মাত্রার নির্যাতন রয়েছে। দিনে দিনে কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকবে। যতো ইস্পাতদৃঢ় মনের অধিকারী কয়েদিই হোক না কেন, নয়/দশ নম্বরের পরে আর কেউ টেকে না, ভেঙে পড়বেই। তাই তারা মজুমদারকে উপদেশ দিলো যে, এই পর্যায়েই সত্য কথা বলে দিলে ভবিষ্যৎ কঠোর শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে। যখন বলতেই হবে তখন অযথা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে লাভ কি? সারা

জীবন পঙ্গুত্ব নিয়ে চলতে হবে। এই নির্যাতনগুলো ঠিক ক্রমিক নম্বর হিসেবে মজুমদার আমাদেরকে বলেন নি বা বলতে পারেন নি। আমাদেরও মনের অবস্থা এমন ছিল যে বিস্তারিত জিগ্যেস করতে পারি নি। তবে পরে কর্নেল মাসুদের কথা থেকে বিস্তারিত শুনেছি—মাসুদের নির্যাতন কাহিনীর সাথে পরে তা বর্ণিত হয়েছে।

কয়েকদিন পরে দেয়া হলো বৈদ্যুতিক 'শক'। মজুমদার বললেন, 'সব বন্দিই বলে যে তাদেরকে বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়েছে। আমি একথা মানতে নারাজ। তারা কি বলতে পারবেন এই 'শক' কিভাবে দেয়া হয়। পারবেন না। ভাবী, আমি বলছি আপনাদেরকে। আমাকে নেয়া হলো উঠোনে, একটি খাটিয়ার ওপর শোয়ানো হলো। উঠোনটি দোতলায় আমাদের ক্ষুদ্রাকার সেলগুলোর সামনে। দোতলার ছাদে ছিল উঁচু প্রাচীর ঘেরা উঠোন। নির্যাতন ওখানেই হতো।'

'খাটিয়ার ওপর আমাকে শুইয়ে হাত-পা চারটি পায়ার সাথে টান টান করে বাঁধা হলো। এর আগে আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করা হয়েছে। হাতের ও পায়ের কবজিতে প্রথমে রাবারের পাত দিয়ে মোড়া হলো, তার ওপর রশি দিয়ে বাঁধা হলো, যাতে হাতে-পায়ে আঘাতের ক্ষত না হয়। তারপর মাথায় ক্লিপ সাঁটা তিনটি তার আনা হলো। ক্লিপগুলোর দুটো আটকানো হলো আমার বুকের বোঁটায়। আর তৃতীয়টি আটকানো হলো (কিছুক্ষণ ইতস্তত করে), বলেই ফেলি, আমার যৌনাঙ্গে। তিনটি তারের অপর মাথাগুলো এক সাথে বাঁধা হলো একটা বৈদ্যুতিক সুইচের সাথে। অতঃপর সুইচটি লাগানো হলো একটি প্লাগে। প্লাগটি আবার লাগানো ছিল একটি কাঠের ছোট চাকার সাথে। চাকাটির ব্যাস হবে ইঞ্চি দশেক। তার সাথে লাগানো একটি ছোট হাতল। হাতলটি চাকাটিকে ঘোরানোর জন্য। ইফতারের সময় কিংবা যুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণ ঘোষণা করার জন্য যে সাইরেন বাজানো হয় জিনিসটা অনেকটা সেই রকম। ওই হাতলটি হাতে ঘোরানো হয়। ঘোরানো হলেই বিদ্যুৎ প্রস্তুত হয় এবং তিনটি তারের মাধ্যমে তা শরীরের অসংখ্য স্নায়ুকে আঘাত করে।'

'ভাবী, কি বলবো। যখন ঘোরানো হয় ও আস্তে আস্তে তার গতি বাড়ানো হয়, তখন মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ ব্লেড দিয়ে আমার শরীরের প্রতিটি অংশকে মোরব্বা বানানোর মতো করে ঘনঘন ফালি ফালি করে কাটা হচ্ছে। মিনিট খানেকও জ্ঞান থাকে না। বেহুঁশ হয়ে গেলে চাকা ঘোরানো বন্ধ করা হয় ও জ্ঞান ফেরানো হয়। জ্ঞান ফিরলে পুনরায় চলে একই পদ্ধতি। দু'তিন বার আমার জ্ঞান ফিরেছিল। তারপর জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি বিছানায় শুয়ে।'

এই পর্যায়ে আমি বললাম, 'মজুমদার, ভাই তুমি যখন জানই যে এদের মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই, আর যে শেখ মুজিবের জন্য সাক্ষ্য তাঁকে তারা যেভাবেই

হোক হত্যা করবেই, তখন তুমি বললে না কেন যে 'আমাকে যা বলতে বল আমি বলবো। সেগুলো সব একটি কাগজে লিখে আন, আমি বলবো,' এ কথা কেন বলো নি?'

মজুমদার বলল, 'খলিল, কি বলছো? কতোবার বলেছি এ কথা। বলেছি তোমরা আমাকে দিয়ে কি বলাতে চাও বলো। ওদের উত্তর একটাই, 'বিরগেডিয়ার সাব, আমরা তো সব কিছু জানি-ই। লেকেন ও সব হাম তুমহারা সোনেরি মু' সে সুননা চাহতে হ্যাঁয়। অতএব যে পর্যন্ত তুমি তা না বলবে ততোক্ষণ পর্যন্ত এ নির্যাতন চলবেই।' শুনে কেবলি ভাবতাম, কি গুনাহ্ করেছি আমি? ওদের পায়েও ধরেছি। কিন্তু বুঝলাম 'ওপরের' অর্থাৎ সেনাবাহিনীর হুকুম। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করতেই হবে।'

এ পর্যায়ে আমাদের এই নৃশংস কাহিনী শোনার ইচ্ছে লোপ পেল। আমাদের আর সহ্য হচ্ছিল না। মজুমদারকে থামতে বললাম। মজুমদার থামলেন না। ইশারায় চুপ করতে বলে বললেন, 'ভাবি, আরও শুনুন। নির্যাতনের ক্রমিক নম্বর নয়, দশ, এগারো ছাড়িয়ে গিয়ে পৌঁছল চৌদ্দতে। চৌদ্দ নম্বর নির্যাতনের ব্যবস্থা হলো।'

'দোতলার খোলা উঠোন। আগস্ট মাস। প্রচণ্ড গরম। উত্তাপ ১১৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। সূর্যতাপে মনে হচ্ছে যেন মগজ গলে যাবে। দুটি টেবিল রাখা হলো পাশাপাশি। মাঝে ৫/৬ ফুট ফাঁক। আমাকে শোয়ানো হলো ছাদে। আমার হাত-পা এক সাথে বাঁধা হলো একটা মোটা রশি দিয়ে। কবজিগুলোর ওপর দেয়া হলো রাবারের আচ্ছাদন রশির অভ্যন্তরে। তারপর আমার বুকের কাছ দিয়ে একটি মোটা বাঁশ দু হাত ও দু'পায়ের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এক পাশে আমার শরীর, অন্য পাশে আমার চার হাত-পা একসাথে গিঁট দিয়ে বাঁধা। এরপর বাঁশটির দু'মাথা দু'জনে ধরে ওপরে তুললো। জবাই করা শেষে চার পা বাঁধা গরু/খাসিকে যেমনভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়া হয় ঠিক সেভাবে আমাকে তোলা হলো এবং বাঁশের দুই মাথা টেবিলে রাখা হলো। আমি জবাই করা পশুর মতো ঝুলে থাকলাম। তখন বেলা দশটা। কিছুক্ষণ পর আমার মাথা ঝুলে পড়লো। আরও কিছুক্ষণ পর আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। আবার কি করে জানি না হুঁশ ফিরে এলো। হয়তো ওরাই পানি ছিটিয়ে থাকবে। আবার বেহুঁশ, আবার হুঁশ। এইভাবে বেলা দু'টা (সময়টা অবশ্য পরে জেনেছিলাম)। তখন আমাকে নামানো হলো একটি খাটিয়ার ওপর। ওদের একজন বিদ্রূপের স্বরে প্রশ্ন করলো, 'বিরগেডিয়ার সাব, আভি কিয়া মাঙ্গতে হো?' মুখ থেকে কথা বেরুলো না। অতি ক্ষীণ স্বরে বললাম, একটু পানি। তখন পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। এক ফোঁটা পানির বিনিময়ে আমি সর্বস্ব দিতে রাজি। ওদের একজন হো-হো করে হেসে উঠলো। বললো,

'সাব পানি মাঙ্গতা হ্যায়। উসকো পানি পিলাও।' আমি উৎসুক হয়ে তাকালাম। পুলিশটি বললো, 'ঠিক হ্যায়, মু খোলো।' এই বলে আমার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে সে তার প্যান্টের বোতাম খুলতে লাগলো। ভাবি হ্যাঁ, প্যান্টের.বোতাম।'

এই কথাটুকু বলতে বলতেই মজুমদার সহ্যের সীমানা অতিক্রম করে গেলেন। তিনি ভেঙে পড়লেন। হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে উপুড় হয়ে পড়লেন। মুখটি দু'হাত দিয়ে ঢাকার চেষ্টা। কান্না থামে না। বরং বাড়তে লাগলো। মনে হলো বাঁধ হঠাৎ ভেঙে পড়েছে। সমস্ত অন্তর গুমরে গুমরে উঠছে অসহনীয় যন্ত্রণায়। মানবতার অপমানবোধে ও ভাগ্যের বিবর্তনে। আমরা থ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। কান্না থামে না। একটু পরে শরীরের কাঁপুনি কমে এলো। এই ফাঁকে আমি বললাম, 'মজুমদার, তুমি থাম। আমরা আর শুনতে চাই না।' কলি ও আমার স্ত্রী তো মজুমদারকে জাপটে ধরলেন, 'ভাই আপনি থামুন। আপনার দুটি পায়ে পড়ছি, আপনি থামুন।'

কথাগুলো বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এমনিতেই মজুমদারের আর শক্তি ছিল না কিছু বলার। সবাই চুপ—অনেকক্ষণ কাটলো। তারপর মহিলারা বললেন, 'ভাই, এক কাপ চা খান।' মজুমদার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

কর্নেল মাসুদের বন্দিজীবন ও নির্যাতন

লে. কর্নেল মাসুদুল হুসেন খান ছিলেন জয়দেবপুর রাজপ্রাসাদে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক। রেজিমেন্ট ঢাকা ব্রিগেডের অংশ। এই ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন ঢাকার কসাই বলে খ্যাত ব্রিগেডিয়ার জাহান যে আরবাব। এই লোকটির মতো ধূর্ত, কুকর্মে উৎসাহী, নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত পশুসুলভ অফিসার পাক সামরিক বাহিনীতেও খুব বেশি ছিল না। এই আরবাবই আরেকজন লে. কর্নেলের (নামটি মনে নেই) সাথে ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি কোর্ট মার্শালে অভিযুক্ত হয়েছিলেন বগুড়ার স্টেট ব্যাংক লুট করার অপরাধে। শোনা যায় উপরস্থ অনেকেই ভাগ পেয়েছিলেন, তাই নানা বাহানা করে সেই কোর্ট মার্শালের রায় কার্যকরি করা হয় নি। পূর্ব পাকিস্তানের পতন যখন অবশ্যম্ভাবী বলে জানা গেল, তখন এই আরবাব এখান থেকে বদলি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত হন। যেহেতু আরবাবের চরিত্রের মতো গুণাধিকারী ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের প্রিয় ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে মেজর জেনারেল ও পরে লে. জেনারেল পদে উন্নতি পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি। ১৯ মার্চ আরবাব তাঁর পাঞ্জাবি সৈন্য ও অস্ত্রসহ জয়দেবপুর গিয়েছিলেন দ্বিতীয় বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করতে। সেখানে গিয়ে তিনি, তার পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও পাঞ্জাবি

গোলন্দাজ বাহিনী বুঝতে পারে যে, কাজটিকে যতো সহজ ভাবা হয়েছিল বাস্তবে তা নয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রত্যেক সৈনিকই ছিল তার ব্যক্তিগত গুলি ভরা অস্ত্রে সুসজ্জিত। একেতো এই অভিজ্ঞ ও চৌকস সৈনিকরা জানতো যে তাদেরকে নিরস্ত্র করার পরিকল্পনা করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত, তখনকার সময় এইরূপ আদেশও ছিল যে আইন-শৃঙ্খলা মোকাবিলার জন্য সৈনিকদের সর্বদা সশস্ত্র থাকতে হবে।

অতএব, আরবারের সাহস হয় নি এসব সৈনিকের অস্ত্রাগারের দিকে অগ্রসর হতে। কিন্তু তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন জয়দেবপুরের সাধারণ মানুষ সড়কের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রেললাইনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি মালবাহী গাড়ির বগি ফেলে দিয়ে সড়কপথ বন্ধ করে দিলো। জয়দেবপুর স্টেশনের নিকট এই রেলক্রসিংটি অবস্থিত ছিল বলে আশপাশে পড়ে থাকা মালগাড়ির অভাব ছিল না।

ব্যর্থতার ক্ষোভ ও অর্পিত কাজটি না করতে পারার কারণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নাখোশ হবেন, অতএব চাকরিতে ক্ষতি হবে, এই আশঙ্কায় আরবাব ছিলেন ক্ষুব্ধ। তিনি উচ্চস্বরে কর্নেল মাসুদকে আদেশ করলেন যেন সড়ক-বন্ধক এই মুহূর্তেই সরানো হয়। মাসুদও সৈন্যদেরকে সেই আদেশ দিলেন এবং সৈনিকরা আদেশ মেনে গাড়িগুলোকে সরাতে লাগলো। কিন্তু আরবাবের চিৎকার শোনা গেল, 'গুলি কর, গুলি কর এক্ষুণি।' মাসুদ বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এই অগ্নিঝড়া সময়ে জনতার ওপর গুলি চালানো ও বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করা একই কথা। তবুও চিৎকার, 'গুলি কর।' অগত্যা মাসুদ গুলির হুকুম দিলেন। কিন্তু তাঁর অধস্তন অফিসার জনতার মাথার ওপর দিয়ে বেশির ভাগ গুলি করলেন। এই দেখে আরবাব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন; কিন্তু ততোক্ষণে সড়ক-বন্ধক সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আরবাব ঢাকা ফিরলেন। তবে দিনটি মাসুদের জন্য ভালো যায় নি।

দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট সশস্ত্র থাকার কারণে তাদের নিরস্ত্র করা গেল না এবং রেল ক্রসিংয়ে বাঙালির দ্বারা গুলি চালিয়ে বাঙালিদের হত্যা করা গেল না, এই ক্ষোভ আরবাবের মন থেকে মুছে যাওয়ার কথা নয়। এসব ব্যর্থতার জন্য মাসুদই দায়ী। অতএব, তাঁকে ২৩ মার্চ ঢাকায় ডেকে এনে বন্দি করা হলো। তাঁর স্থলে আর একজন বাঙালি লে. কর্নেল রকিবকে দ্বিতীয় বেঙ্গলের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হলো। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে দিয়ে রকিবের কাছে চার্জ হস্তান্তর করার প্রহসনও ঠিকমতো করা হলো। কিন্তু রকিবকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট গ্রহণ না করে ২৮ মার্চ বিদ্রোহ করে সমস্ত যুদ্ধ সরঞ্জামাদিসহ ময়মনসিংহ চলে গিয়ে মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলো। বলা বাহুল্য, এই বিদ্রোহের দায়ভারও 'বাঁধা মুরগি' কর্নেল মাসুদের ওপর চাপানো হলো। ২৮ মার্চ তাঁকে ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কোয়ার্টার গার্ডের এক কামরায় বন্দি করা হয়।

মাসুদ ২৫/২৬ মার্চ রাতে ঢাকার হত্যাযজ্ঞের প্রচণ্ড গোলাগুলি বিস্ফোরণের শব্দ নিজেই শুনলেন ও ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণাও শুনলেন।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, রেজিমেন্টাল কোয়ার্টার গার্ডে অন্তরীণ হয় কেবল সিপাহি পদবির সৈনিকরা। এর চাইতে উচ্চপদস্থ, এমনকি হাবিলদার ও সুবেদারদেরও কোয়ার্টার গার্ডে অন্তরীণ হওয়ার নিয়ম নেই। তারা বন্দি হলে তাদের ওপরস্থ গার্ড দিয়ে তাদের কামরাতেই বন্দি অবস্থায় রাখতে হবে।

ভাগ্যের পরিহাস, কয়েকদিন পর মেজর মান্নান (পরে মন্ত্রী এবং বর্তমানে বিকল্প ধারার নেতা), কর্নেল রকিব (দ্বিতীয় বেঙ্গলের অধিনায়ক) এলেন এই কোয়ার্টার গার্ডের পাশের কামরা দুটোতে। পরে তাদেরকে পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসাররা এসে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মাসুদ ওখানেই থেকে গেলেন।

এপ্রিল মাসের ৭ কি ৮ তারিখে মাসুদকে পেছন-মোড়া করে হাতকড়া পরানো হলো ও বিমানে কলম্বো হয়ে করাচি নেয়া হলো। তবে মাসুদ এ সময় একটি কারণে স্রষ্টার প্রতি হাজার শুকুর প্রকাশ করেন যে, শেষ মুহূর্তে ১৪ ডিভিশনের কর্নেল স্টাফ সাদুল্লাহ তাঁকে বিমানে দেখতে পান এবং হুকুম দেন যে মাসুদের হাতকড়াটা পেছন মুড়ে না দিয়ে হাত দুটো সামনে রেখে দেয়া হোক। বিমানযাত্রায় এইরকমভাবে দু'হাতে কড়া পরা অবস্থায় মাসুদ বাথরুমে যাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সারতেন।

হাতকড়া পরা অবস্থায় মাসুদ করাচি পৌঁছেন ও ৬৬ মিডিয়াস কামান বাহিনীর কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হয়। পুনরায় বিধাতার নিকট মাসুদের হাজার শুকরিয়া, তাঁকে কোয়ার্টার গার্ডে একজন পাঞ্জাবি সুবেদার চিনতে পারেন ও তাঁর হাতকড়া খুলে দেন। মাসুদ অনেক দিন পর রাতে দু'হাত খোলা অবস্থায় থাকতে পেরে একেবারে মরার মতো ঘুমোন।

পরদিন ওই কামান বাহিনীর রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট মাসুদকে কোয়ার্টার গার্ডে দেখতে এসে তাঁর কবজির ঘড়িটি খুলে নিয়ে বলে, 'তুমি একজন গাদ্দার ও বিহারিদের কসাই। তোমার হাতে ঘড়ি শোভা পায় না।' পরে ঘড়িটি অ্যাডজুট্যান্টের হাতের শোভা বর্ধন করেছিল।

এর দু'তিন দিন পর মাসুদকে নেয়া হলো বিমানবন্দরে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের দেখা। তাঁরা একসাথে লাহোর গেলেন। লাহোর থেকে তাঁদের নেয়া হলো ঝিলাম শহর থেকে প্রায় মাইল বিশেষ দূরে এক জায়গায়। খারিয়ান নামের ছাউনির কাছে, বান্নি হাইওয়েজের এক ভাঙাচোরা রেস্ট হাউজে। মাসুদকে রাখা হলো সিঁড়ির নিচে ভৃত্যদের জন্য তৈরি একটি কামরায় আর পরিবারসহ মজুমদারকে রাখা হলো ওপরের তলায় দু'কামরাতে। তবে তাঁদের কাউকেও বলা হয় নি যে, অপরজনও এখানে আছেন। কিন্তু তাঁরা

জানতে পেরেছিলেন কথাটা। ওখানে তাঁদেরকে কোনো পত্রিকা দেয়া হতো না, রেডিওর তো প্রশ্নই ওঠে না।

জুন-জুলাই মাসে মাসুদকে নিয়ে যাওয়া হলো ঝিলাম সেনাছাউনিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। প্রশ্নের ধরন একই। মাসুদ নিজের নাম করে জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো একদিন সিনিয়র বাঙালি অফিসারদের, যেমন (অব.) মেজর জেনারেল মজিদ, (অব.) কর্নেল ওসমানী, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার প্রমুখকে জয়দেবপুর রাজপ্রাসাদে তাঁর রেজিমেন্টাল মেসে দাওয়াত করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করার পরিকল্পনা পেশ করেন। পরিকল্পনাটি কি তা মাসুদের মুখে শুনতে হবে। মজুমদারের মতো, মাসুদও চেষ্টা করতেন এটা বোঝাতে যে এই 'পিকনিক' ব্যাপারটিই বাস্তব নয়, কখনো ঘটে নি, সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাই কোনো পরিকল্পনার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু প্রশ্নকারীরাও নাছোড়বান্দা— ওপর থেকে আদেশ, এই পরিকল্পনাটির বিস্তারিত বিবরণ মাসুদের মুখ থেকে শুনতে হবে।

মজুমদারের তুলনায় মাসুদ আর একটি ব্যাপারে অভাগা ছিলেন। তাঁর পরিবার ছিল ঢাকায়। তাঁকে পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে একা। তাছাড়া তিনি পদেও ব্রিগেডিয়ারের চেয়ে নিচে। যদিও পৃথিবীর সমস্ত দেশেই লে. কর্নেলকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি/সম্রাট নিজ দস্তখতে চিঠি লিখে তাঁর হাতে 'স্বাধীন'ভাবে একটি রেজিমেন্টের দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। অতএব, কয়েদি হিসেবেও তাঁর প্রাপ্য সম্মান ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। দুনিয়ার সমস্ত দেশ মিলে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে যে 'জেনেভা চুক্তি' প্রণয়ন করেছে, সেই অনুযায়ী তাঁকে কিছুতেই সিপাহিদের সাথে কোয়ার্টার গার্ডে রাখা যায় না। কিন্তু এই কর্মগুলো সাধিত হয়েছে পাকিস্তান নামক দেশের 'অপরাজেয়' সামরিক বাহিনী দ্বারা। এই সেনাবাহিনী ইতোপূর্বে আর একজন বাঙালি লে. কর্নেল মুশতাককে ১৪ ডিভিশন সদর দফতরে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। মুশতাকের দোষ ছিল যে, তিনি নিজে না হলেও তাঁর জাতিভাই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক গুণ্ডারা পাকিস্তানের 'আপন ভাই' বিহারিদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। অতএব, শাস্তি ভোগ করতে হবে মুশতাককে।

হাতকড়া পরে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে কলম্বো হয়ে করাচি আসা একজন লে. কর্নেল রাতে শোয়ার জন্য জায়গা পেলেন করাচির একটি রেজিমেন্টের কোয়ার্টার গার্ডের মেঝেতে। তাঁর খাওয়ার পানীয় জল ও শৌচকর্মের জন্য একমাত্র সম্বল একটি এলুমিনিয়ামের মগ। অতএব মজুমদারের মতে, তাঁরও মনে প্রশ্ন ওঠার কথা, কোন গুনাহার জন্য তিনি পাকিস্তান নামক দেশটির প্রতিরক্ষায় নিজের প্রাণ বাজি রেখে পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন।

রাজনীতি তো তিনি কখনো করেন নি। রাজনীতি তিনি বুঝতেনও না। রাজনীতি তো বাস্তব পক্ষে করেছেন সেই জেনারেল, যিনি ইয়াহিয়ার একান্তজন ছিলেন এবং যিনি '৭১ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গভবনে এক ভূরিভোজের পরে প্রশ্নোত্তরকালে বলেছিলেন, 'তোমরা চিন্তা করো না। আমরা কিছুতেই এই কৃষ্ণচর্ম হারামিদের (বাঙালিদের) হাতে পাকিস্তানের শাসনভার তুলে দেবো না (কর্নেল সিদ্দিক সালেক, 'উইটনেস টু সারেন্ডার', ২৭ পৃষ্ঠা)।

কোনো অপরাধ প্রমাণ হওয়ার আগেই এমন অমানবিক শাস্তি ভোগকালে কর্নেল মাসুদের চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হওয়ারই কথা। এমন সময় মাসুদ দেখলেন যে, ঝিলাম ছাউনিতে তাঁর প্রশ্নকর্তা তাঁর বন্ধু/পূর্বপরিচিত কর্নেল আনজুম নামক এক পাঞ্জাবি অফিসার। মাসুদের বিধ্বস্ত মনেও আশার সঞ্চার হলো যে, হয়তো এই পুরনো বন্ধু তাঁর কথা ও তাঁর অবস্থা বুঝতে পারবে; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। আনজুম মাসুদের স্বগোত্রীয় নয়। গায়ের রঙ আনজুমের চাইতে ফর্সা হলেও মাসুদ কৃষ্ণচর্ম বাঙালি হারামিদের একজন বৈ তো নয়। তাছাড়া আনজুমের ওপর পরিষ্কার আদেশ, রাষ্ট্রদ্রোহী শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কয়েকজন সিনিয়র বাঙালি অফিসারের সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে হবে। অতএব বন্ধুত্ব পরে, চাকরি ও জাতিগত আনুগত্য তার আগে। তাই আনজুমের জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব, অন্য পাঞ্জাবি অফিসারের জেরার চাইতে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী হয় নি। বেচারা মাসুদ!

অবশেষে আগস্ট মাসে হুকুম এলো, সেই অনুযায়ী মাসুদকেও লাহোর কোর্টের স্পেশাল ইন্টারোগেশন সেল অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদের পশুসুলভ সেলে নিয়ে যাওয়া হলো।

মজুমদার তো ক্রমিক নম্বর অনুসারে নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে যেভাবে যা মনে আসে বলে যাচ্ছিলেন। মাসুদ অনেকটা নিখুঁতভাবেই ক্রমিক নম্বরগুলো মনে রেখেছিলেন।

প্রথম দিন স্বাভাবিক ব্যবহারের পরে যখন মাসুদ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু জানেন না বললেন তখন ইন্সপেক্টর দুররানি, ইন্সপেক্টর সরওয়ার ও ইন্সপেক্টর ইসলাম নামে তিন পশুর একজন তাঁকে প্রচণ্ড জোরে থাবা মারলো। মাসুদ কেবল ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলেন না, জ্ঞানও হারালেন। মজুমদার ছিলেন খেলাধুলো করা পেশিবান শক্তসামর্থ্য লোক। তাঁর সহ্যশক্তি ছিল গড়পড়তা বাঙালির চাইতে অধিক; কিন্তু মাসুদের শারীরিক গঠন ছিল অনেকটা নাজুক। দ্বিতীয় দিনের নির্যাতন ভিন্নরূপ : মাসুদের পা দুটো একটি দড়ির সাথে বেঁধে 'পুলির' সাহায্যে ওপর দিকে টেনে তোলা হলো। পা রইলো ওপরে, মাথা নিচে। ঝুলবার জন্য নির্মিত লোহার বারের সাথে যুক্ত 'পুলি' দিয়ে তাঁকে ঝুলিয়ে রাখা হলো কতোক্ষণ তা মাসুদ জানেন না; কারণ তিনি কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিনের নির্যাতন। একটি বরফের চাঁই (Slab) মাটিতে রাখা হলো। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ছ'ফুট এবং প্রস্থ ফুট তিনেক। তিনজন পুলিশ অফিসার মাসুদকে ধরে ওই বরফের ওপর শুইয়ে দিয়ে চেপে ধরে রাখলো। অতঃপর পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রশ্ন, 'কিয়া কর্নেল সাহাব, কুছ ঠাণ্ডা লাগ রাহা হ্যায়?' মাসুদ উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। একই কৌতুকের সুরে উপদেশ, 'ফের কর্নেল সাহাব উস্ দিন যো যো বাতেঁ হুয়ি, ও সাচ বাতা দো।' মাসুদের অনুরোধ, 'আপনারা আমাকে যা বলতে বলবেন আমি তাই বলবো। আপনারা একটি কাগজে লিখে দিন। আমার একটাই অনুরোধ, আমাকে আর নির্যাতন করার প্রয়োজন নেই।' ওদেরও একই উত্তর, 'জি না। তোমার সোনা মুখ থেকে কথাগুলো আমরা শুনতে চাই।' এখানেই ট্রাজেডি, ঘটনাটি ঘটেই নি অথচ সেখানে কি হয়েছিল তাই বলতে হবে সবিস্তারে।

মাসুদের কাকুতি-মিনতি খুব লম্বা সময় ধরে চলে নি। বিধাতা হয়তো একেবারে নির্দয় নন। মাসুদের শরীর পেশিবহুল ছিল না, তাই জ্ঞান হারাতেও তাঁর খুব বেশি সময় লাগে নি। যখন জ্ঞান ফিরলো ততোক্ষণে তিনি তাঁর খাটিয়ার বিছানায়।

চতুর্থ দিন। প্রশ্ন একই। জেরাকালে প্রশ্নকারীরা তাদের জ্বলন্ত সিগারেট মাসুদের শরীরে চেপে ধরে। নিবু নিবু অবস্থায় সিগারেটে আবার দু'চার টান। এরপর আবার মাসুদের গায়ে সিগারেট নিভানো। সেই সঙ্গে প্রশ্ন। ওই একই প্রশ্ন। আর মাসুদেরও একই অনুরোধ।

পঞ্চম দিন। মাসুদকে উলঙ্গ করা হলো। একটি তপ্ত লোহার ডাণ্ডা তার পশ্চাদ্দেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চললো। মাসুদের চিৎকার, কিন্তু পুলিশদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের একই প্রশ্ন। মাসুদের একই অনুরোধ। প্রথম লৌহ ডাণ্ডাটি কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে দ্বিতীয় তপ্তডাণ্ডা আনা হলো। মাসুদের পশ্চাদ্দেশ জ্বলে গেল। পরে তা দগদগে ঘায়ে পরিণত হয়। জ্ঞান হারানোর পরই মাসুদ সেদিনের মতো নিষ্কৃতি পায়।

পরের দিন এবং তার পরের দিন পুনরায় চলে জিজ্ঞাসাবাদ। প্রশ্ন একই; কিন্তু নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণ বেশি— নির্যাতনের রূপ পশুসুলভ বললে কম বলা হয়। এবার আসে বৈদ্যুতিক শক। এই বৈদ্যুতিক শক মজুমদারকে যে পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছিল তারই অনুরূপ। তবে মাসুদকে একাধিকবার দেয়া হয়েছিল। হয়তো মজুমদারকেও একাধিকবার; কিন্তু তিনি বিস্তারিত বলেন নি। তাঁর হৃদয়-বিদারক নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে মজুমদার ভেঙে পড়েছিলেন। তবে মাসুদ যেহেতু ঘটনার অনেক দিন পরে বর্ণনাগুলো যতোদূর মনে করতে পেরেছেন বলেছেন, তাই অনেকটা আবেগবিহীনভাবে দিতে পেরেছিলেন।

মাসুদকে দেয়া বৈদ্যুতিক শকের তারগুলোর একটি ছিল তার পশ্চাদ্দেশে।

পূর্বেই সেখানটায় ঘা হয়ে গিয়েছিল। শকের ফলে এখন ঘা এতোটা পেকে যায় যে তাঁকে ডাক্তারি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হয় জেরাকারীরা। কিন্তু নাজুক পেশিহীন শরীরের অধিকারী মাসুদের জন্য এই শকগুলো সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ইতোপূর্বে তাঁকে পরপর আর একটি অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে। প্রশ্নকারী তাঁকে একটি বেঞ্চে বসালো। তার এক হাতে একটি ধারালো সুচ, অন্য হাত দিয়ে সে মাসুদের একটি হাত ধরলো। সুচটির অগ্রভাগ মাসুদের আঙুলের নখের নিচে ধরে বললো, 'কর্নেল সাহাব, বলবে কি জয়দেবপুরের ষড়যন্ত্রে কি পরিকল্পনা করেছিলে, না কি সুচটি বসিয়ে দেব নখের নিচে?' মাসুদের একই উত্তর, যে ঘটনা ঘটেই নি, সেটা সম্বন্ধে কী বলবেন? তার চাইতে 'আপনারা যা লিখে দেবেন আমি তাই বলবো।'

মাসুদের কথা শেষ হওয়ার আগেই সুচের অনেকটা ঢুকে গেছে তাঁর নখের ঠিক পেছনের মাংসে, প্রচণ্ড চিৎকার করে মাসুদ বাঁকা হয়ে গেলেন অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়। ব্যথা যে এমন প্রচণ্ড হতে পারে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। মাসুদ চেষ্টা করলেন আঙুল সরিয়ে নিতে, কিন্তু শক্ত করে ধরা তাঁর হাত, কিছুই করার উপায় নেই। পুনরায় একই প্রশ্ন, কি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উত্তর দেয়া দূরের কথা, মাসুদের চিন্তাশক্তিও লোপ পাচ্ছিল। অতএব, সুচ বেঁধাবার পরের কথাটি পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার আগেই মাসুদ জ্ঞানহীন, বিছানায় শুয়ে। জ্ঞান ফেরার পর মাসুদের মনে পড়লো ১৯৪৮ সালের সেই দিনটির কথা— যেদিন সামরিক বাহিনীর নির্বাচনী বোর্ড তাঁকে কমিশন্ড অফিসার হওয়ার যোগ্য ঘোষণা করে সম্মানিত করে। সাফল্যের গর্বে মাসুদের বুক উঁচু হয়েছিল সেদিন। আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন তিনি। বিধাতার অশেষ রহমত যে, মাসুদকে ভবিষ্যৎ জানবার শক্তি তিনি দেন নি। দিলে মাসুদ সেদিন ওই গর্বিত ও আনন্দিত মুহূর্তটি উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হতেন।

বলা হয়ে থাকে দুর্ভাগ্য একা আসে না। অন্তত মাসুদের বেলায় আসে নি। যখন মাসুদের পশ্চাদ্দেশে দগদগে ঘা, হাতের আঙুল দিয়ে কিছু ছুঁতে পারেন না, তখন খবর এলো যে, ঢাকায় তাঁর ছোট ছেলে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত এবং সে বর্তমানে (DI List-ভুক্ত বিপজ্জনক রোগী) অর্থাৎ যেকোনো দিন জীবনাবসান হতে পারে। সামরিক বাহিনীর বিধান অনুসারে কেউ DI List-এ থাকলে তার Next of Kin-কে জানাতেই হবে। অতএব, ছেলের পিতা মাসুদকে জানাতে হলো। মাসুদ প্রথম শোনেন তাঁর পুত্রের অসুস্থতার কথা, পরে খবর পেলেন যে তার পুত্র বেশ আগে থেকেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। দিনের পর দিন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। সিএমএইচে নেয়া হয়েছিল। পাঞ্জাবি ডাক্তার বলেছেন, 'কী? গাদ্দারের (বিশ্বাসঘাতকের) বাচ্চার চিকিৎসা?

আমার দ্বারা কিংবা সি এম এইচ দ্বারা হবে না।' যদিও ডাক্তার ভালো করেই জানতো যে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আহত বন্দিকেও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা অপরাধ।

মাসুদের মনের অবস্থা অকল্পনীয়। ছেলের অবস্থা যখন এতোটাই খারাপ যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, কেবল তখনই অন্য একজন পাকিস্তানি ডাক্তার তাকে ভর্তি করলো সি এম এইচে এবং মাসুদকে আনুষ্ঠানিকভাবে খবর দিলো।

মাসুদের এই অবস্থায় লাহোর ফোর্টের বিশেষ জেরাকারীরা তাঁকে তৃতীয় বাঙালি সাথি লে. কর্নেল এ. বি. এম. ইয়াসিনের লিখিত স্বীকৃতিমূলক জবানবন্দি এনে পড়ে শোনান। মাসুদের কথায়, তিনি তা শোনেন নি, শোনার ইচ্ছেও ছিল না, শোনার দরকারও মনে হয় নি। অবাধ, মুক্ত ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের ফলে সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী দলের নেতা শেখ মুজিবকে জীবিত রেখে বাংলাদেশে পাঞ্জাবের ক্ষমতা দখল বেশি রকম বেখাপ্পা দেখাবে, অতএব মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী কিংবা অন্য অপরাধে, কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় হত্যা করতেই হবে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, লে. কর্নেল ইয়াসিন ও লে. কর্নেল মাসুদ— এই তিনজন বাঙালি অফিসার পরিস্থিতির বলির পাঁঠা বৈ তো আর কিছু নয়। অতএব মাসুদ সেদিন অযথা নির্যাতন থেকে মুক্তির সম্ভাবনায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে দস্তখত করেছিলেন।

এরপর মাসুদকে লায়ালপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয় ও পুত্রের অসুস্থতা সম্বন্ধে খবর দিয়ে বলা হয় যে, ছেলের অবস্থা উন্নতির দিকে। হয়তো এ যাত্রা বেঁচেই যাবে। অতএব তাঁকে আদেশ করা হলো, ওই কয়েক পৃষ্ঠা টাইপ করা জবানবন্দি অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করতে। মাসুদ তাই করতে লাগলেন।

সেপ্টেম্বরের ৩ কি ৪ তারিখে শেখ সাহেবের ক্যাঙারু বিচার শুরু হলো লায়ালপুর জেলে। আদালতটি একটি সামরিক আদালত। ব্রিগেডিয়ার রহিম (প্রাক্তন বালুচ রেজিমেন্টের) আদালতের প্রেসিডেন্ট আর রয়েছে চারজন সদস্য। এই চার সদস্যের তিনজন সামরিক অফিসার এবং একজন বেসামরিক।

মাসুদ আদেশমতো বিচারকক্ষে উপস্থিত হলেন সামরিক উর্দি পরে। তিনি সেখানে দেখলেন শেখ মুজিবকে পাইপ মুখে, নির্বিকার, বরং কিঞ্চিৎ হাসি হাসি মুখ।

মাসুদকে তিনি চিনতে পারলেন। সেই ১৯৪৪ সালের কলকাতা বেকার হোস্টেলের মাসুদ। শেখ সাহেবকে দেখে মাসুদের মাথাও নত হয়ে এলো। শেখ সাহেবও তাঁর দিকে তাকিয়ে, মুখে মৃদু হাসি।

বিচার শুরু হলো। মাসুদের সবচাইতে বড় ভয় ছিল ব্যারিস্টার ব্রোহির জেরা। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেয়া লিখিত জবানবন্দি তাঁর মুখস্থই ছিল; কিন্তু

তিনি তো অনেক কিছুই জানতেন না। যেমন শেখ সাহেবের ধানমণ্ডির বাড়ি ইত্যাদি সম্বন্ধে। এসব ব্যাপারে বিবাদি পক্ষের আইনজীবীর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলে মাসুদ বেসামাল হয়ে পড়তেন ও মিথ্যাবাদী সাক্ষী প্রমাণিত হতেন। অতএব, ব্রোহির ভয়ে তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। কিন্তু ভাগ্য ভালো, ব্রোহি কোনো জেরাই করলেন না।

মাসুদের জান বাঁচলো। তবে মাসুদ ভেবে পেলেন না, ব্রোহি শেখ সাহেবের ডিফেন্স ল ইয়ার হয়েও বাদিপক্ষের সাক্ষী কর্নেল মাসুদকে কোনো প্রশ্নই করলেন না—জেরা করা তো দূরে থাক। মাসুদ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী, তিনি জেরা করলে তো উপায় থাকতো না!

বরং প্রিসাইডিং বিচারক ব্রিগেডিয়ার রহিমই কয়েকটা প্রশ্ন করলেন মাসুদকে। শেখ সাহেবের বাড়ির কোন কামরায় শেখ সাহেবের সঙ্গে মাসুদের দেখা, একদা একটি মিছিলে মতিয়া চৌধুরী (তখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা, পরে আওয়ামী লীগের কৃষিমন্ত্রী) কি একটা আপত্তিকর বক্তৃতা দিয়েছেন সেই সব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। মাসুদ দেখি নাই, জানি না বলে উত্তর দিলেন। রহিম আর প্রশ্ন করেন নি।

মাসুদ এই বিচারকক্ষে আনুমানিক আধ ঘণ্টা ছিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর বন্দি সেলে। এর কয়েক দিন পরে তাঁকে শোনানো হয় যে তাঁর অসুস্থ ছেলেকে দেখার জন্য তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হবে। মাসুদের মনে ভয়— ছেলে বেঁচে আছে তো? যা হোক মাসুদকে ঢাকায় পাঠানো হলো ৭ অক্টোবর, ১৯৭১।

কর্নেল মুহাম্মদ ইয়াসিনের ওপর নির্যাতন

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও লে. কর্নেল মাসুদ ছিলেন পদাতিক বাহিনীর অফিসার। ১৯৭১ সালে তাঁরা দু'জনেই ছিলেন সৈনিকদের কমান্ডার। হয়তো বলার প্রয়োজন নেই যে, পদাতিক বাহিনী প্রধানত যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকে ও সম্মুখ সমরে যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হয়। এদিকে কর্নেল ইয়াসিন ছিলেন সাপ্লাই কোরের অর্থাৎ যেসব সৈনিক পশ্চাতে থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ ও সরঞ্জাম পাঠায়, তাদের অফিসার। ১৯৭১ সালে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সম্ভাব্য বিদ্রোহের ব্যাপারে তাঁর কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়। তবুও ১৯৭১ সালের মার্চের পরপরই কর্নেল ইয়াসিনকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য মার্চ মাসে কর্নেল ডা. আবদুল হাই এবং অন্য অনেক বাঙালিকে তাঁদের অফিসে উর্দি পরা অবস্থাতেই গুলি করে খুন করা হয়েছিল। অতএব, কর্নেল ইয়াসিনের গ্রেফতার এমন আলাদা কোনো ব্যাপার ছিল না।

কর্নেল ইয়াসিন ঢাকায় পাকবাহিনীর দ্বারা আটক হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। বিভিন্ন প্রকারের বারুদ, বিস্ফোরক ইত্যাদি আলাদা করে রাখার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক ডজন কুঠুরি করা হয় ঢাকা অ্যামুনিশন ডিপোতে। এই কুঠুরিগুলো ফুট আটেক লম্বা ও ফুট চারেক চওড়া। ওপরে ছাদের নিকট দেয়ালে এক বর্গফুট খানেক খোলা—যে রকম পায়খানায় থাকে—দুর্গন্ধ বের হয়ে যাওয়ার জন্য। ঢাকার সেনাছাউনির অ্যামুনিশন ডিপোতে এই কুঠুরিগুলোর একটিতে রাখা হয়েছিল কর্নেল ইয়াসিনকে। এসব কুঠুরিতে আরও কয়েকজন লে. কর্নেল এবং মেজর পদবির অফিসারকে রাখা হয়। তাছাড়া ঢাকায় যে অনেক বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ব্যক্তিদের বন্দি করা হয়েছিল তাঁদেরকেও রাখা হয়েছিল এই কুঠুরিগুলোতে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে এই ক্ষুদ্র কুঠুরিগুলো এমন তেতে উঠতো যে, তাতে কোনো পশুও অসুস্থ না হয়ে পারতো না; কিন্তু বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি মানুষ। মানুষ যেমন চরম নারকীয় অবস্থায়ও বেঁচে থাকে, আবার এই নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবকে আটক করে রাখে অপর কিছু মানুষরূপী শয়তানই। অথচ এসব দুর্ভাগার কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তেমনভাবে স্থান পায় নি। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এঁদের কথা হয়তো শোনেও নি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এঁদের ইতিহাস জানবে কি না তা ভবিষ্যৎই জানে। তবে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের তখনকার জনগণ কল্পনাও করে নি যে নির্দোষ বাঙালিদের ওপর তাঁদের বিশ্ববিজয়ী সোনার সৈন্যরা কিরূপ অমানবিক জন্তুর আচরণ করেছে। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তো আর জানবে না এই সত্যগুলো।

এই কুঠুরিগুলো দিনের বেলা খোলা হতো কেবল বন্দিদের অনুরোধে, প্রকৃতির ডাকে তাদের সাড়া দেয়ার জন্য। সঙিন উঁচিয়ে পাহারাদার পেছন পেছন যেত। সন্ধ্যার পর বাইরে থেকে তালা দিয়ে ঘরগুলো বন্ধ করে দেয়া হতো। এরপর প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে সেজন্য ছিল একটা টিনের পাত্র। পেট খারাপ হলেও এর ব্যতিক্রম হতো না।

দু'বেলা খাবার দেয়া হতো সামরিক বাহিনীতে ব্যবহৃত 'মেস টিন' বলে দু'ইঞ্চি তিন ইঞ্চি মাপের একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে। দু'বেলাই ভাত আর ডাল। ভাতে কাঁকর ও ডাল পানির মতো। এই মেস টিনটি দরজা না খুলেই দরজার নিচ দিয়ে চালান করে দেয়া হতো।

প্রহরীর কাছে কোনোরূপ অনুরোধ ও নালিশ করলে ছিল একই জবাব, 'দেখ গাদ্দার (বিশ্বাসঘাতক), চুপরাহ। খানা হায় তো খা, না হো তো জাহান্নামে যা।' কর্নেল সাহেব তাঁরই অধস্তন সিপাহির মুখে কখনো এমনি বাণী শুনবেন, তা নিশ্চিতভাবেই কল্পনাও করতে পারেন নি।

কর্নেল ইয়াসিন ছিলেন সরল স্বভাবের লোক। যেসব লোক বিপদের চিন্তা না করেই যা বিশ্বাস করেন তাই খোলাখুলি বলে থাকেন, কর্নেল ইয়াসিন ছিলেন তাঁদের একজন। ১৯৭০ সালের দিকে অনেক 'বিচক্ষণ' গোছের লোক বাঙালি জাতির অধিকারগুলোর কথা খোলাখুলিভাবে বলতেন না; কিন্তু ইয়াসিন বলতে দ্বিধা করতেন না। অতএব তাঁর পাকিস্তানি সহযোগী ও ঊর্ধ্বতন অফিসাররা জানতো যে, ইয়াসিন মনেপ্রাণে একজন বাঙালি। অন্য আর যে বাহানাই দেখানো হোক না কেন, ইয়াসিনকে ১৯৭১ সালের মার্চের পর বন্দিশালার অন্ধ কুঠুরিতে নিক্ষেপ করার আসল কারণ এটিই ছিল। তিনি বাঙালি, তিনি মনেপ্রাণে বাঙালির অধিকারের পক্ষে। অতএব, তিনি 'বাঙালি-পাঞ্জাবি' সংগ্রামে পাঞ্জাবের পক্ষে কাজ করবেন না—এটাই তাঁর অপরাধ, এটাই তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা। হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ছিলেন একজন সৎ পাকিস্তানি; কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ইয়াসিনকে হতে হবে একজন সত্যিকারের পাঞ্জাবি-ভক্ত অফিসার—তাতে যদি পাকিস্তানের অনিষ্ট হয় তবুও।

অতএব, ইয়াসিন পাঞ্জাবি প্রভাবিত পাকবাহিনীর বন্দি। পরে এপ্রিল/মে মাসের দিকে পরিকল্পনা করা হলো যে, দেশদ্রোহিতার দায়ে শেখ মুজিবের প্রহসনমূলক বিচার করে ফাঁসি দেয়া হবে। এই মামলার জন্য সাক্ষী দরকার। সাক্ষী পাওয়া খুব কঠিন নয়, জামায়াতে ইসলামীর মতো বহু পাঞ্জাবি-ভক্ত সাক্ষী পাওয়া সম্ভব; কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের দাম কম। কারণ মামলাটি একটি সামরিক ষড়যন্ত্র ঘিরে। প্রমাণ করতে হবে যে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল, যাতে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের হঠাৎ আক্রমণ করে নিরস্ত্র করা হবে। কাজটি করবে বাঙালি সৈনিকরা এবং এর নেতৃত্ব দেবেন কিছু প্রবীণ বাঙালি অফিসার। অতঃপর সহজেই পাঞ্জাবি সৈন্যরা বন্দি হবে পূর্ব পাকিস্তান বাঙালি সৈন্যদের কমান্ডে এসে যাবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।

শেখ মুজিবের বিচারকারী আদালতের কাছে এই কল্পকাহিনীর পক্ষে তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সম্পৃক্ত অফিসারগণ নিজ মুখে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেবেন। অতএব, পদলেহী বেসামরিক বাঙালি দ্বারা কাজ হবে না, কিছু প্রবীণ বাঙালি সেনা অফিসারকে অত্যাচারে বিপর্যস্ত করে সাক্ষী বানাতে হবে।

মজুমদার ও মাসুদকে তো পাওয়াই গেছে। প্রবীণ অফিসার লে. কর্নেল ইয়াসিনকে পেলে মামলাটি খাড়া করা যায়। অতএব, ইয়াসিনকে নিয়ে যাওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রথমে পাকবাহিনীর গোয়েন্দা অফিসার দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ। পরে মজুমদার ও মাসুদের সাথে লাহোর ফোর্টে অবস্থিত স্পেশাল ইন্টারোগেশন সেলের ওই মনুষ্যরূপী পশুর দল অর্থাৎ ইন্সপেক্টর দুররানি, ইন্সপেক্টর সরওয়ার ও ইন্সপেক্টর ইসলামের হাতে তুলে দেয়া হলো।

প্রচণ্ড চড়, মারপিট, নখের নিচের সুচ, পায়খানার রাস্তায় তপ্ত ডাণ্ডা ঢোকানো থেকে বৈদ্যুতিক শক সবই দেয়া হলো। এ যাত্রায়ও সবচাইতে বড় ট্রাজেডি ও অসহায়ত্ব ছিল একই—ইয়াসিন যতোই বলেন কী বলতে হবে বলো—আমি সবই বলবো, লিখেও দেবো। কিন্তু ওদের একই উত্তর, 'নেহি জি, কর্নেল সাহাব। হাম তেরা সোনেরি (সোনালি) মু সে সুননা চাহতে হ্যাঁয় কিয়া কিয়া হুয়া।'

নিশ্চয়ই সকল মানুষের প্রার্থনা হবে যে, বিধাতা যেন পরম শত্রুকেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে না ফেলেন।

এখানে বলে রাখা দরকার, যখন এই তিন হতভাগ্যের ওপর এমনি চরম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তখন দু'একদিন পরপরই কোনো পাকিস্তানি সিনিয়র অফিসার এই জিজ্ঞাসাবাদ সেলে আসতো ও জেরার অগ্রগতি সম্বন্ধে অবগত হতো। অতএব, অমানুষের তালিকায় কেবল দুররানি, সরওয়ার ও ইসলাম প্রমুখ ছিল না– এদের পরিচালক ছিল পাকিস্তানি সামরিক অফিসার। এদের উচ্চতম পর্যায়ে ছিল একজন ব্রিগেডিয়ার। ব্রিগেডিয়ারের নামটি ছিল রফিক (সঠিক নামটির ব্যাপারে আমার ভুলও হতে পারে)।

অবশেষে একটি কাগজে টাইপ করা চার-পাঁচ পৃষ্ঠা লম্বা স্বীকারোক্তি এনে হাজির করা হলো ইয়াসিনের সামনে। ইয়াসিন ছিলেন সরল স্বভাবের। কাগজটা পড়ে দেখলেন সর্বৈব মিথ্যে কথা। এই মিথ্যেতে স্বাক্ষর দিতে তাঁর মন সেই অন্তিম মুহূর্তেও সায় দিচ্ছিল না। অথচ এইরূপ একটি কাগজের ওপর দস্তখত করার জন্য ইতোপূর্বে কতো না তিনি অনুরোধ করেছেন। এখন তো অনেক স্বস্তির সাথেই দস্তখত করার কথা। স্বস্তি যে তিনি পান নি তা নয়। তবে বিবেকের দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা শারীরিক নির্যাতনের চেয়ে খুব কম ছিল না। ইয়াসিন দস্তখত করে দিলেন। তাঁকে বলা হলো কাগজটার বয়ান মুখস্থ করতে। সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তরগুলো ইয়াসিন মুখস্থ করতে শুরু করলেন। ঢাকায় অবস্থিত ইয়াসিনের স্ত্রী ও তিন পুত্র-কন্যার মুখ নতুন করে ভেসে উঠলো তাঁর স্মৃতিতে।

এর দু'একদিন পর লাহোর ফোর্টে এলেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার। ইয়াসিনকে নিয়ে যাওয়া হলো ব্রিগেডিয়ারের সামনে। ব্রিগেডিয়ার নিজের পরিচয় দিলেন যে, তিনি পাকবাহিনীর ডেপুটি অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল। কোর্ট মার্শাল ও অন্যান্য আইন-আদালত বিভাগ সামরিক বাহিনীর এই শাখাটির অধীনস্থ। অতএব, শেখ মুজিবের মামলার ভারও তাঁর ওপর বর্তিয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার ইয়াসিনকে বললেন, 'তুমি তো এই কাগজটায় দস্তখত করেছো। অতএব, তুমি যে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলে তা তুমি স্বীকার করেছো। এর অর্থ এই যেকোনোদিন তোমাকে এই ষড়যন্ত্রের অপরাধে কোর্ট মার্শাল করে ফাঁসির আদেশ দেয়া যেতে পারে। তুমি কি তা ভালোভাবে উপলব্ধি করো?'

সত্যি বলতে কি কাগজে দস্তখত করায় যে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে ইয়াসিন

তা কখনো ভেবে দেখে নি। এ কয়দিন কাগজটি মুখস্থ করার ব্যাপারে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ফাঁকে ফাঁকে মনে হতো ঢাকায় তাঁর পরিবারবর্গকে হয়তো আবার দেখতে পাবেন।

ইয়াসিন ঢোক গিলে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

'আমরা অবশ্য তোমার প্রতি অতোটা নির্দয় হবো না। তবে শর্ত এই যে, যে কাগজটিতে তুমি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছো তার প্রতিটি অক্ষর লায়ালপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকার করে সই দিয়ে আসতে হবে। কয়েকদিনের মধ্যে তোমাকে লায়ালপুরের ওই ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হবে। সেখানে তুমি এই কাগজে যা লেখা আছে হুবহু তাই জবানবন্দি হিসেবে বলবে, ঠিক আছে?' ব্রিগেডিয়ার বললেন।

'ঠিক আছে স্যার', পুনরায় ঢোক গিলে ইয়াসিন বললেন।

ইয়াসিন জবানবন্দিটি মুখস্থ করছিলেন। এক জায়গায় দেখলেন যে লেখা আছে—অমুক দিন শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাড়িতে একটি ঘরে মিটিং হচ্ছিল। সেখানে কর্নেল ইয়াসিন উপস্থিত ছিলেন।

ইয়াসিন পড়লেন বিপদে। শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির ৩২ নং সড়কের বাড়িতে কখনো যান নি, বাড়িটি তিনি দেখেনও নি। এদিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ব্রোহি হয়েছেন বিবাদি অর্থাৎ শেখ মুজিবের আইনজ্ঞ। তিনি নিশ্চয় জিগ্যেস করবেন মুজিবের বাড়ির কোন্ কামরায় সভাটি হয়েছিল। উত্তরটি অন্য সাক্ষীদের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে দেখবেন। অতএব, ইয়াসিন তাঁর এই সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষকে বললেন ও কর্তৃপক্ষের কাছে শেখ মুজিবের বাড়ির একটি নকশা চাইলেন।

কয়েকদিন পর নকশা এলো। নকশাটি শেখ সাহেবের বাড়ির ভেতরের বিভিন্ন কামরার বিন্যাসের নকশা নয়, এটি ৩২ নং সড়কের নকশা ও সেখানে সারিবদ্ধ সবগুলো বাড়ির মধ্যে শেখ মুজিবের বাড়িটি চিহ্নিত করা। ইয়াসিন কর্তৃপক্ষকে পুনরায় বোঝালেন যে তিনি জানতে চান, শেখ মুজিবের বাড়ির কামরাগুলোর কোনটা কোথায়। বৈঠকখানায় যেতে হলে গেট থেকে কিভাবে কোন্ কামরা পার হয়ে যেতে হয়। বৈঠকখানার পরিধি কতোটা ইত্যাদি।

কর্তৃপক্ষ আবার নকশাটি ফেরত নিয়ে গেল। দু'একদিন পরে একজন এসে ইয়াসিনকে বললো যে, ইয়াসিনের এতোটা দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। ব্রোহি বলেছেন যে তিনি এ প্রশ্ন ইয়াসিনকে জিগ্যেস করবেন না।

উত্তর শুনে ইয়াসিন বাকরুদ্ধ। এমন বিখ্যাত ও বিদ্বান আইনজীবী ব্রোহিও এই সামরিক বাহিনীর দলে! অথচ তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক শেখ মুজিবের আইনজীবী নিযুক্ত হয়েছেন। সেজন্য নিয়মিত উচ্চভাতাও নিশ্চয় পাচ্ছেন। অথচ কাজ করছেন মুজিবের প্রতিপক্ষ সামরিক বাহিনীর হয়ে মুজিবকে ফাঁসিকাষ্ঠে

ঝোলানোর বন্দোবস্ত করতে?

ইয়াসিন ছিলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিপ্রাপ্ত। বলা যেতে পারে বিদ্বান ব্যক্তি। অথচ ব্রোহি ছিলেন আরও অনেক বিদ্বান। অতো বড় বিদ্বান এমন চরিত্রহীন! সামান্য অর্থের জন্য এতোটা নিচে নামতে পারেন!

সরলমনা ইয়াসিন বিশ্বাস করতেন যে, বিদ্যা ও চরিত্র সর্বদাই একসাথে অবস্থান করে। তিনি জানতেন না যে, চরিত্রের ওপর বিদ্যার প্রভাব নেহায়েৎই ভাসা ভাসা। ব্রোহি বিদ্বান হতে পারেন, কিন্তু লোভ-লালসার ব্যাপারে পদলেহী পশুর ওপরে নয়। এমন চরিত্রের লোকের ওপর বিদ্যার পাহাড় চাপিয়ে দিলেও তার মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন হয় না।

অবশেষে বিচারপর্ব শুরু হলো। ব্রোহি বলতে গেলে কোনো জেরাই কাউকে করলেন না। দু'একটা প্রশ্ন বরং ব্রিগেডিয়ার রহিম, যিনি ছিলেন প্রিসাইডিং বিচারক, তিনিই করলেন। মানবেতিহাসের হাস্যকর এই বিচারকার্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রয়োজনও ছিল না।

কর্নেল মাসুদকে তো বিপদাপন্নভাবে অসুস্থ ছেলেকে দেখার জন্য ঢাকায় তাঁর পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মজুমদার ও ইয়াসিন, যাঁদের দু'জনেরই পরিবার ছিল ঢাকায়, তাঁদেরকে পরে আমাদের সাথে বন্দিশিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে ১৬ ডিসেম্বর '৭১ থেকে মধ্য ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তাঁরা মুক্তই ছিলেন। তখনই তাঁদের মুখে এই নির্যাতন কাহিনীগুলো আমার শোনা।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর একদিন ইয়াসিন আমার বাসায় এসে হাজির। এসে অভিনন্দন ও কুশল বিনিময়ের আগে তিনি আমাদের বুকে পিন দিয়ে কাগজের একটি ক্ষুদ্র ব্যাজ সেঁটে দিলেন। ব্যাজটি ছিল বাংলাদেশের পতাকার ছবি— হাতে আঁকা। প্রতিটি ব্যাজ ইয়াসিন নিজের হাতে এঁকেছেন এবং সবুজ, লাল ও হলুদ রঙ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। লাল রঙটি সূর্যের, আর হলুদের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের মানচিত্র চিহ্নিত। সবাই জানেন যে পরে আমাদের পতাকা থেকে বাংলাদেশের মানচিত্রটি অপসৃত হয়।

ইয়াসিন আনন্দে আত্মহারা। অত্যুৎসাহী ধরনের লোক। কয়েকদিন আমরা গর্বের সাথে ব্যাজটি বুকে ধারণ করেছিলাম।

এরপর ১০ জানুয়ারি '৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ঢাকা থেকে সেই ঘটনা রেডিও সরাসরি সম্প্রচার করছিল। খুব ভালোভাবে না হলেও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল ভাষ্যকারের মন্তব্য। বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে, বিমানবন্দর থেকে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ লোক। তারপর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বিশাল জনসভা। রেডিওতে কান লাগিয়ে সবাই

শুনছিলাম। কর্নেল ইয়াসিনও ছিলেন।

শেখ সাহেবের বক্তৃতা শুরু হলো। প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছিলাম। শেষের দিকে শেখ সাহেব বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে প্রহসনের মামলায় কয়েকজন বাঙালি মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছেন। তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে না।'

সেদিনের সেই আনন্দের মুহূর্তে এমন একটি কথা শুনবো আমরা কেউ কল্পনা করি নি। কি অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এই 'মিথ্যে' সাক্ষীগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সে সম্পর্কে কিছু জানানো হয় নি।

ইয়াসিনের মুখের দিকে সেই মুহূর্তে তাকাতে পারে নি কেউ। বিনা কারণে এতো বড় শাস্তি ভোগ করার পরও এঁরা সবাই ভাবছিলেন নবীন স্বাধীন দেশে ছোটো-বড় যাই হোক কোনো কাজে আসবেন তাঁরা। দু'বেলা খাওয়ার জন্য কোনো কাজের প্রয়োজন এঁদের কারোরই ছিল না। তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সামান্য হলেও কোনো অবদান রাখবেন স্বাধীন কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। সবাই জানতেন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের নিদারুণ অভাব হবে সদ্য স্বাধীন দেশে। দেশের স্বাধীনতার জন্য অমানুষিক নির্যাতন তাঁরা সহ্য করেছেন, আজ স্বাধীনতার আনন্দে সে নির্যাতনও ভুলতে চেষ্টা করছেন, অথচ তাঁদের কপালে জুটলো এই কলঙ্কের টিপ। কেঁদে ফেললেন কর্নেল ইয়াসিন। আমাদেরও চোখ ভিজে উঠলো।

তবে স্বস্তির কথা বঙ্গবন্ধু পরে সঠিক তথ্য জানতে পেরেছিলেন এবং এই তথাকথিত 'মিথ্যে' সাক্ষীগণকে সাদরে রাষ্ট্রের কাজে লাগিয়েছিলেন।

কিন্তু ইতোমধ্যে কর্নেল ইয়াসিনের আর একটি ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। সে ক্ষতি ছিল অপূরণীয় ও চিরদিনের জন্য। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় ইয়াসিনের ৮/৯ বছরের ফুটফুটে ছেলেটি তার খালাতো ভাইয়ের সাথে গিয়েছিল পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের কাছাকাছি পৌঁছানো এই শিশুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। লক্ষ লক্ষ লোক। এক বছর নানা অত্যাচার সহ্য করেছে এই জনগণ। আজ তারা স্বাধীন। ঢাকার জনতা আনন্দে আত্মহারা। ওরই মধ্যে দূর থেকে হলেও এই শিশুটি দেখতে গিয়েছিল আত্মসমর্পণ। কিন্তু কোথা থেকে এলোপাতাড়ি গুলি, গুলি বিদ্ধ হলো শিশুটির বুকে। মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি, যেদিন ইয়াসিনের জন্য এই 'মিথ্যে' সাক্ষী দেয়ার কলঙ্ক ঘোষণা করা হচ্ছিল, সেদিন তিনি তাঁর এই ক্ষতিটির খবর জানতেন না। তাঁকে জানতে দেয়া হয় নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাকিস্তানের পরাজয় ও নতুন পরিস্থিতিতে ক্ষমতার লড়াই

আমাদের গৃহবন্দি জীবন

১৬ ডিসেম্বর '৭১ ঘটে পাকিস্তানের পরাজয় ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। আমরা প্রায় ১১০০ সামরিক অফিসার এবং ৩০ হাজার সৈনিক তখন পাকিস্তানে। এছাড়া সরকারি দফতরে বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারী ছিলেন আরো অনেক। আইনত এরপর সপ্তাহখানেকের মধ্যে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আমাদের কাছ থেকে আনুগত্য ফর্ম্ সই করে নেয়ার কথা এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারীদের দেশে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা। আমাদের মতামত নেয়ার পর একটি তালিকা প্রস্তুত হয়। সেই তালিকা অনুযায়ী আমাদের সরকারি কিংবা আন্তর্জাতিক রেডক্রসের খরচে দেশে পাঠানোর কথা। ক্রম-তালিকায় নাম ওঠার আগেই যদি আমরা কেউ কেউ নিজ ব্যবস্থায় বাংলাদেশে যেতে চাইতাম তাঁদেরকে ইচ্ছেমতো যেতে দেয়াও উচিত ছিল। যে কোনো সভ্য দেশে তাই করা হতো; কিন্তু দেশটি পাকিস্তান—কোনো সভ্য দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়।

তাই যা ঘটবার কথা ছিল হলো তার অন্যরূপ। আমাদের আনুগত্য প্রকাশের ফর্ম্ পূরণ করানো হলো ৩/৪ মাস পরে। এরপর নিয়মানুযায়ী আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়ার কথা; কিন্তু তার পরিবর্তে আরও ৩/৪ মাস পর আমাদের সবাইকে একত্র করে বিভিন্ন বন্দিশালায় পাঠানো হলো। এই বন্দিশালাগুলো সামরিক বন্দিশালা তো নয়ই, বরং উপচে পড়া সাধারণ কয়েদখানার চেয়েও অনেক খারাপ ও অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা সংবলিত। এটাই ছিল আমাদের আনুষ্ঠানিক বন্দিজীবন। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় আমাদের এই জীবন।

তবে আমাদেরকে প্রথমে নজরবন্দি ও পরে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল

১৯৭১ সালের মাঝামাঝি থেকে। এই অদ্ভুত অব্যবস্থাগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা না দিলে পুরো ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাবে না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই অনুকূল সুযোগ-সুবিধায় অবস্থিত অফিসাররা ভারতের মধ্য দিয়ে পলায়ন করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে শুরু করলো। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে মার্চ মাসেই বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ সদস্যরা বিদ্রোহ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ পাকিস্তানিদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে সব বাঙালি সৈনিক মনে-প্রাণে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবলভাবে পোষণ করে। তখন থেকেই বাঙালিদেরকে নজরবন্দি করে রাখা শুরু হলো।

সিনিয়রদের বাড়ির চারদিকে বেসামরিক পোশাকে গোয়েন্দা গার্ড রেখে কার্যত তাঁদেরকে গৃহবন্দি করা হয়। বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল না, তবে একটি টিকটিকি গাড়ি সবসময় তাঁদের গাড়ির পেছন পেছন যেত। এক শহর থেকে আর এক শহরে গেলেও ওই গোয়েন্দা গাড়িটি নীরবে অনুসরণ করতো। অফিসের কাজে যুক্ত থাকায় কোনো নিষেধ ছিল না। তবে বাঙালি সিনিয়র অফিসারদের উপস্থিতিতে যুদ্ধঘটিত কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হতো না। বাঙালিদের পাসপোর্টও নিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাঁদের দপ্তর ঠিকই ছিল; কিন্তু ব্যক্তিগত স্টাফ ছাড়া অধস্তন কোনো অফিসার ছিল না। তাঁদের কাজও ছিল না। কাজগুলো অন্য পাকিস্তানি অফিসারদের দিয়ে করানো হতো।

ক্ষমতার লড়াই

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই আমাদের অপশন অর্থাৎ আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারটা সম্ভব হলো না। কারণ পাকিস্তানে তখন চলছে ক্ষমতার তীব্র লড়াই। এতোদিন পাকিস্তানে ছিল জেনারেল ইয়াহিয়ার অনুগত সামরিক শাসন। ইয়াহিয়া যুদ্ধে পরাজিত। পরাজিত একনায়ককে ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হবে কি না এই নিয়ে দ্বন্দ্ব। অতএব, কে ক্ষমতা দখল করবে তাই নিয়ে তুমুল লড়াই ও ষড়যন্ত্র। এসব চরম সিদ্ধান্তকর প্রশ্নের তুলনায় আমাদের বন্দিত্বের ব্যাপার কিছুই নয়। তাই ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বিবরণই প্রথমে দেয়া প্রয়োজন।

ক্ষমতার লড়াইয়ে ছিল তিনটি গ্রুপ।

প্রথমটি ইয়াহিয়া গ্রুপ অর্থাৎ ইয়াহিয়া ও তাঁর ব্যক্তিগত চেলাচামুণ্ডা সমন্বিত গোষ্ঠী।

দ্বিতীয়টি জেনারেল হামিদ গ্রুপ। ইয়াহিয়ার দু'নম্বর জেনারেল আবদুল হামিদ খানের নেতৃত্বে ইয়াহিয়ার সাবেক পরামর্শদাতাকারী জেনারেল, যাঁরা 'ছয় চক্রান্তকারী' বলে কুখ্যাত ছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই অর্থাৎ সর্বজেনারেল পীরজাদা, ওমর, আবু বকর মিঠা, খুদা বখশ প্রমুখ একত্র হলেন জেনারেল হামিদের নেতৃত্বে। এদেরকে পাঞ্জাবি গ্রুপও বলা হতো।

তৃতীয় আর এক গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াহিয়ার তিন নম্বর জেনারেল, সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান খান। সঙ্গে ছিলেন বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল আবদুর রহিম খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভুট্টো ছিলেন ইয়াহিয়ার চাকরিতে, জাতিসংঘে পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতি করতে ব্যস্ত। জাতিসংঘে ইয়াহিয়ার দূত হিসেবে শেষ ভাষণ দেয়ার পর জেনারেল গুল হাসান গংদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তানে ফেরত আসার পথে রোমে অপেক্ষায় ছিলেন। পরিকল্পনা ছিল যে সময় হলেই ভুট্টোকে ইতালি থেকে নিয়ে আসার জন্য রহিম খান বিমানবাহিনীর বিমান পাঠাবেন। ভুট্টো পৌঁছবেন রাওয়ালপিণ্ডি এবং ক্রান্তিলগ্নটির জন্য পাঞ্জাব হাউজে অপেক্ষমাণ থাকবেন।

এই ছিল ক্ষমতার লড়াইয়ে তিন সামরিক প্রতিপক্ষের অবস্থান। এদিকে দেশের সাধারণ জনগণের অবস্থান ও মনোভাব ছিল একেবারেই ভিন্ন এবং বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

১৬ ডিসেম্বর কৃত আত্মসমর্পণে পাকিস্তান অর্থাৎ পাঞ্জাবের জনগোষ্ঠী ছিল চরমভাবে ক্ষুব্ধ, অপমানবোধে পাগল-প্রায়। কারণ তাদের পরমবীর পাঞ্জাবি যোদ্ধারা চরম অযোদ্ধা ভারতীয়দের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। আরও অপমানকর এই যে, পরাজয়টি পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। কেবল তাই নয় পূর্ব পাকিস্তানে ৯৩ হাজার পরমবীর, পৃথিবীতে অপরাজেয়, পাকিস্তানি সৈনিক, 'শেষ সৈনিক শেষ গুলি' পর্যন্ত লড়াইয়ের পরিবর্তে চরম কাপুরুষতার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছে এবং জান বাঁচিয়ে বন্দি হয়েছে।

এসব অচিন্তনীয় ও অসহ্য অপমানকর পরিস্থিতির জন্য স্বাভাবিকভাবে সমস্ত দোষ এসে বর্তায় সৈন্যদের, বিশেষ করে অফিসারদের ওপর। তারা তখন জনগণের কাছে ঘৃণার পাত্র। একটি উদাহরণ দিলে তাদের মনোভাব পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

শিয়ালকোট হচ্ছে কাশ্মির ও ভারত সীমানা সংলগ্ন একটি জেলা। শেষ সিদ্ধান্তবাহী ট্যাঙ্ক যুদ্ধটি, যেখানে এক রাতে পাকিস্তানের ১০০টি ট্যাঙ্ক ভারতীয়দের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে, তা এখানেই ঘটেছে। সেইদিনই ইয়াহিয়া খান বেতারে ঘোষণা করলেন, 'আমরা ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রস্তাবিত যুদ্ধ বন্ধ অর্থাৎ সিজ ফায়ার প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম।'

এই শিয়ালকোট থেকে পিণ্ডি যাওয়ার সড়কপথ গুজরানওয়ালা জেলা শহর হয়ে। এক বাঙালি ক্যাপ্টেন শরীফ (পরে ব্রিগেডিয়ার) একটি জিপে করে বাঙালি ড্রাইভারকে নিয়ে পিণ্ডি আসছিলেন। ক্যাপ্টেন শরীফ বেশ দীর্ঘদেহী ও গঠন অনেকটা পাঞ্জাবিদের মতো। এদিকে ড্রাইভারের ছোটোখাটো চেহারা দেখেই বোঝা যায় সে বাঙালি।

গুজরানওয়ালা শহরে অন্য সব জায়গার মতো চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। চলছে সৈনিক দেখলেই অপমান করা ইত্যাদি। সেখানে পৌঁছানোর পর ক্যাপ্টেন শরীফের জিপটি ঘেরাও করা হলো। শরীফ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে নামানো হলো। শরীফ প্রাণভয়ে অস্থির। তাঁকে হুকুম দেয়া হলো গাড়ির বনেটের ওপর দাঁড়াতে। শরীফ তাই করলেন। তারপর জনতার পক্ষ থেকে হুকুম এল, 'আভি তুছি লেচ্কার করো।' কি লেকচার করবে তাও বলে দিয়েছে কেউ কেউ প্রচণ্ড চিৎকার করে। বলতে হবে কিভাবে জনগণের রক্ত দিয়ে অর্জিত অর্থে কেনা অস্ত্রশস্ত্র ওরা চরম কাপুরুষতার সঙ্গে ভারতীয়দের হাতে তুলে দিলো। কেউ কেউ চিৎকার করে বলে, বলো তুমি কী রকম কাপুরুষ ইত্যাদি। এই সময় কয়েকজন এসে ড্রাইভারটিকেও হুকুম দিলো সেও যেন নেমে উক্ত রূপ লেকচার দেয়। কিন্তু বাকি লোকেরা তাদেরকে নিষেধ করলো, 'নেহি নেহি। ওঁ লোগ তো 'দালের' (বীর) লোগ হ্যায়। নিজ দেশের জন্য কেমন সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। ওকে লেকচার করতে হবে না। ওকে তো চা খাওয়ানো উচিত।' তখন নিতান্ত সাহস করে ড্রাইভার বললো যে, আমাদের সাহেবও তো বাঙালি, পাঞ্জাবি নয়। শুনে জনতা হঠাৎই থেমে গেল এবং বললো, ওদেরকে যেতে দাও। পাঞ্জাবি হারামিদেরকে ধর।

এই ছিল মোটামুটিভাবে পাঞ্জাবের জনগণের মনোভাব। এদিকে পাঞ্জাব মানেই পাকিস্তান। এহেন পরিস্থিতিতে কোনো জেনারেলের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা ছিল সুকঠিন। সেই বিবেচনায় ভুট্টো ভাগ্যবান। তার বুদ্ধিও ক্ষুরধার। চরম ধূর্ততাও এই সময় কাজে লাগালেন। এদিকে তাঁর ষড়যন্ত্র-সঙ্গীদ্বয়ও অন্য দুই প্রতিপক্ষের তুলনায় অধিক দক্ষ ও করিতকর্মা প্রমাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের পরিকল্পনা এমনই ছিল যে, এই ক্ষমতার লড়াই যেদিকে মোড় নিক না কেন পরিস্থিতি মোকাবিলার বন্দোবস্ত পরিকল্পনার মধ্যেই থাকবে।

প্রথম গ্রুপ অর্থাৎ ইয়াহিয়া খানকে দমন করা বিশেষ কষ্টকর হবে না। প্রথমত, যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও কোনো একনায়ক রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ তার পূর্বপদে বহাল থেকেছেন, এমন উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। নেই বললেই চলে। ইয়াহিয়ার চেলা-চামুণ্ডারা জানতো, ইয়াহিয়ার প্রতি সামরিক-বেসামরিক কোনো পক্ষের সমর্থন বিশেষ ছিল না। তবুও শেষ চেষ্টা। তবে এঁদেরকে নিরস্ত করার জন্য এয়ার মার্শাল রহিম খান বন্দোবস্ত রেখেছিলেন যে, প্রয়োজনবোধে

ইয়াহিয়াকে বিমান বাহিনী দ্বারা প্রাণের ভয় দেখানো হবে।

এরপর রইলো হামিদ গ্রুপ। হামিদের প্রচেষ্টা হবে, ইয়াহিয়ার উত্তরসূরি হিসেবে সামরিক অফিসারদের সমর্থন নিয়ে ক্যুর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এ প্রচেষ্টার সফলতার সম্ভাবনা স্বল্প। কারণ সাধারণ সৈনিক ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর আস্থা জেনারেলদের ওপর ছিল না বললেই চলে। তবুও যদি হামিদ সফল হয়ে যায় তবে গুল হাসানের বিশ্বস্ত সেনাগোষ্ঠী শক্তি প্রয়োগ এবং রক্তপাতের মাধ্যমে তা প্রতিহত করতে হবে। অতএব, ক্ষমতায় আসার জন্য গুল হাসানকে যে প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হবে তার আকৃতি ও প্রকৃতিও ক্যুর আকার ধারণ করতে বাধ্য। বস্তুত হয়েও ছিল তাই। যাই হোক, গুল হাসান-ভুট্টোর পরিকল্পনা ছিল একেবারে নিশ্ছিদ্র।

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, ধূর্ত ভুট্টোর ক্ষেত্রে এবং গুল হাসান—রহিমের জন্য, এই ষড়যন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু অভিন্ন ছিল না। ভুট্টো সঠিকভাবে উপলব্ধি করতেন যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যেমন জেনারেলদের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়, তেমনি আবার জেনারেলদের অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর সমর্থন ব্যতীতও ক্ষমতা দখল ও প্রাথমিকভাবে তা কবজায় রাখা সম্ভব নয়। অতএব ভুট্টো জানতেন যে, এই ক্ষমতার লড়াইয়ে প্রাথমিকভাবে একজন বেসামরিক নেতাকেই, প্রতিভূ হিসেবে হলেও, সামনে রেখে জেনারেলদের অগ্রসর হতে হবে। আর অনুমান করা কঠিন নয় যে, গুল হাসান ও রহিম খানও জানতেন প্রাথমিক পর্যায়ে ভুট্টোকেই সামনে রাখতে হবে। পরে সময়মতো ভুট্টোকে গুম করে দিলে ল্যাঠা চুকে যাবে।

হামিদ গ্রুপের পরাজয়

ক্ষমতার এই লড়াই ১৬ ডিসেম্বরের পর একেবারেই চরম পর্যায়ে পৌঁছে। তিন পক্ষ তৈরি। গুল হাসান তাঁর সুপরিকল্পিত পদক্ষেপগুলো আগে থেকে নিয়ে রেখেছিলেন, তবে তা ছিল অদৃশ্য। দৃশ্যত প্রথম ও খোলাখুলি পদক্ষেপ নিলেন হামিদ খান। তাঁরই আদেশ অনুযায়ী ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সকাল দশটায় রাওয়ালপিণ্ডিতে যতো অফিসার ছিলেন তাঁদের মধ্যে মেজর ও তদোর্ধ্ব পদবির সবাইকে আইয়ুব হল অর্থাৎ এক সময় যা পাকিস্তান পার্লামেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত, সেখানে একত্র হতে বলা হলো। হলটি সেনাসদরের পাশে অবস্থিত। তখনো জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রপতি। নীরবে নিজ প্রাসাদেই আছেন। তদুপরি তাঁর ব্যাপারে সর্বজনবিদিত বদনাম ছিল যে, তিনি প্রায় সর্বদাই নেশাগ্রস্ত থাকেন। অতএব হামিদই সর্বেসর্বা।

এই সমাবেশে হাজির হলেন প্রায় সাতশ' অফিসার। আদেশকারী জেনারেল হামিদ খান। উদ্দেশ্য, ভারত বিজয় তো হলো না, এখন নিজেদের দেশটাকে বিজয়। প্রথম দুই-তিন সারিতে উপবিষ্ট প্রায় শ'খানেক অফিসার, যাদের কোর্টের কলারে লাল ট্যাব, অর্থাৎ তাঁরা কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার ও জেনারেল পদমর্যাদার। বাকি সবাই লে. কর্নেল ও মেজর। বলা যায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসারদের বৃহৎ অংশ। এঁদের সমর্থন পেলে গোটা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সমর্থন পেতে কিংবা তাদেরকে দমিত রাখতে কষ্ট হবে না।

ভুট্টো, জেনারেল গুল হাসান ও এয়ার মার্শাল রহিম খান— এই তিনজন পাক-ভারত যুদ্ধের আগে থেকেই আলোচনা অর্থাৎ ষড়যন্ত্র করে চলেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, ভুট্টো তো ইয়াহিয়াকে দিয়ে শেখ মুজিব ও তাঁর বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বের করে দেয়ার বন্দোবস্ত ১৯৭১ সালের শুরুতেই করে রেখেছিলেন। অগণতান্ত্রিকভাবে হলেও পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করাতে পারলে সেক্ষেত্রে ভুট্টোই থাকবেন পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম দল। দুই পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেলে তো কথাই নেই। ভুট্টো তখন থাকবেন পাকিস্তানের একমাত্র রাজনৈতিক নেতা। অতএব, ভুট্টোই হবেন ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে সর্বপ্রকারে উপকৃত। ১৯৭১ সালের শেষের দিকে যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই, তখন ভুট্টো ইয়াহিয়াকে পরিত্যাগ করে অন্য জেনারেল খুঁজতে লাগলেন ষড়যন্ত্রের জন্য।

১৯৭১ সালে জেনারেলদের মধ্যে ছিল সুস্পষ্ট দুটো ভাগ। প্রথমটি ছিল, আগেই বর্ণিত, 'ছয় চক্রান্তকারী' কিংবা পাঞ্জাবি জেনারেলদের গ্রুপ নামে খ্যাত হামিদ খানের গ্রুপ। হামিদ ছিলেন ক্ষমতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে এবং ইয়াহিয়ার সম্ভাব্য উত্তরসূরি। অন্য গ্রুপটি ছিল ক্ষমতার দিক দিয়ে তৃতীয় এবং পাঠান জেনারেল গুল হাসানের নেতৃত্বাধীন। ইয়াহিয়ার উত্তরসূরি হওয়ার উচ্চাভিলাষ গুল হাসানেরও ছিল। অতএব, পাঞ্জাবি হামিদ খানের সঙ্গে কোনোদিন হাসানের বনিবনা ছিল না, বরং অত্যন্ত প্রকট বৈরিতা ছিল। মিথ্যাচারে ঠাসা গুল হাসানের লেখা বইটিতেও এই বৈরিতার কথা লেখক অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

হামিদ খান ছিলেন ভুট্টোর প্রধান প্রতিপক্ষ। অতএব, ভুট্টো গুল হাসানকে বেছে নিয়েছিলেন। ইয়াহিয়ার পরে যদি সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতায় আসার কথা হামিদ খানের, ভুট্টো কিংবা গুল হাসানের নয়। এদিকে দেশে যদি বেসামরিক শাসন ফিরে আসে তবে ক্ষমতায় আসার কথা ভুট্টোর।

হামিদ খানের এই অফিসার সমাবেশের বিপরীতে গুল হাসানের কার্যক্রমও

শুরু হলো। ইয়াহিয়াকে দমানোর জন্য রহিম খানের বিমানবাহিনীর জঙ্গি বিমান রাষ্ট্রপতির প্রাসাদকে বায্ (Buzz) করতে আরম্ভ করলো অর্থাৎ বিমানগুলো অত্যন্ত নিচু দিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে উড়ে আবার ওপরে উঠে যাচ্ছিল। এই বাযিং-এর উদ্দেশ্য ইয়াহিয়াকে পরিষ্কারভাবে বোঝানো, 'আক্রমণ করলেই সব শেষ, অতএব প্রতিরোধ করো না এবং তোমার দিক থেকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই।' গুল হাসান ও রহিম খান গ্রুপ নিশ্চিত হলো যে, ইয়াহিয়ার পক্ষে কেউ নেই।

এরপর হামিদ খানের সাথে মোকাবিলা। গুল হাসান পিণ্ডি থেকে ৬৮ মাইল দূরে খারিয়ানে অবস্থিত তাঁর একান্ত অনুগত আর্মার্ড ডিভিশনের একটি বড় অংশ পিণ্ডিতে মার্চ করালেন। ২০ ডিসেম্বর আইয়ুব হলে আয়োজিত সমাবেশের আগেই সকালবেলা আমার সঙ্গে দেখা হলো মিলিটারি একাডেমির এককালের সহপাঠী কর্নেল জাভেদ ইকবালের সাথে। তিনি খারিয়ান ডিভিশনের স্টাফ প্রধান অর্থাৎ ক্ষমতার দিক দিয়ে ডিভিশন অধিনায়কের পরেই তাঁর স্থান। ডিভিশনের জিওসি ছিলেন একজন বাঙালি, জেনারেল ইসকান্দরুল করিম। জাভেদ ছিলেন যুদ্ধসাজে সজ্জিত। আমি হেসে হেসেই প্রশ্ন করলাম, কোথায় যুদ্ধে যাচ্ছো জাভেদ? জাভেদ আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, চল যাই, তোমার বাসায় একসাথে দুপুরে খাওয়া হয়ে যাক। তখন অনেক অনেক খবর শোনাবো তোমাকে। জাভেদের মুখে শুনলাম যে, আজ খারিয়ান ডিভিশনকে এখানে আনা হয়েছে। উদ্দেশ্য পিণ্ডিকে ঘেরাও করা, যাতে হামিদ গ্রুপ ক্ষমতা দখল করতে না পারে, বরং গুল হাসানের হাতে বন্দি হয়। বস্তুত সেদিনই গুল হাসান ও রহিম খান তথা ভুট্টোর জয় সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

এবারে জেনারেল হামিদের সমাবেশে ফিরে আসা যাক। হামিদ তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। ঢাকায় ২৫ মার্চের রাতের ঘটনা, তথা পূর্ব পাকিস্তানে সেই কালরাতে সুসজ্জিত পাকসেনাদল নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর যে পশুসুলভ হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মানবেতিহাসের সেই নিকৃষ্টতম ঘটনা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। ওই ঘটনাবলি কিছু কিছু ছুঁয়ে এসে গেলেন ডিসেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধে। বললেন, ৩ ডিসেম্বর হঠাৎ করেই ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করে বসলো (আসল সত্যটা উলটো)। তারপর যুদ্ধ শুরু হলো। অপরাজেয় পাকিস্তানি অর্থাৎ পাঞ্জাবি সৈনিকরা অসম সাহসে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু ভারতীয়দের সমরাস্ত্র উন্নতমানের এবং সংখ্যায় তারা প্রচুর। তাই পাকিস্তান বাহিনী সুবিধা করতে পারলো না। হামিদ খান অনেক বিস্তারিতভাবে কথাটি বললেন।

এরপর তিনি এলেন পূর্ব পাকিস্তানের রণাঙ্গনে। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, জেনারেল নিয়াজির যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল ফোর্ট্রেস প্রতিরোধ। অর্থাৎ সারাদেশের সীমান্তে কতোগুলো দুর্গ বা ফোর্ট্রেস গড়ে তোলা হবে। দুশমন এগুলো পাশ

কাটিয়ে এগিয়ে গেলে তাদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করা হবে। অতএব, তাদের অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ফোর্ট্রেসগুলো হবে খুলনা, যশোর, বগুড়া, হিলি, কুমিল্লা ইত্যাদি সামরিক ঘাঁটিগুলোতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের চারদিক ঘিরে থাকবে। কিন্তু শত্রু করলো কি, প্রথমেই আমাদের দুর্বল বিমানবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিলো। আকাশে তাদেরকে বাধা দেয়ার মতো কেউ থাকলো না। এরপরই প্যারাসুট দিয়ে সৈন্যদল নামাতে আরম্ভ করলো ঢাকার চারদিকে। বড় নদীগুলো যুদ্ধ করে পার না হয়ে নদীর অপরপারে প্যারাসুটের সাহায্যে নামতে আরম্ভ করলো। তখন যুদ্ধের সাতদিন গত হয়েছে অর্থাৎ ডিসেম্বরের ১০ তারিখ। আমি নিয়াজিকে আদেশ দিলাম সীমান্তের 'দুর্গ প্রতিরক্ষা' পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে সমস্ত সৈন্যদল ঢাকায় একত্র করতে। যতোদিন ঢাকা ও ঢাকা বেতার পাকিস্তানের দখলে থাকবে ততোদিন পর্যন্ত বহির্বিশ্বকে বোঝানো যাবে পূর্ব পাকিস্তানের পতন হয় নি। আর ইতোমধ্যেই পূর্বেকার সমঝোতা ও পরিকল্পনামতো বিশ্বের দুই পরাক্রমশালী শক্তি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। চীন আসবে উত্তর থেকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অজেয় নৌ-বাহিনী আসবে দক্ষিণ থেকে। এদের সামনে ভারত টিকতে পারবে না— সন্ধি করবে। বহাল হবে স্ট্যাটাস কো অ্যান্টি (পূর্বাবস্থা) অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের পুনরুদ্ধার, শেখ মুজিব জেলে (ঠিক এই ভাষায় তা বলেন নি হামিদ খান, যা বলছিলেন তার মর্মটি ছিল এই)।

কিন্তু এখানে বাদ সাধলো পূর্ব পাকিস্তানে নিয়াজির অভিমত, হামিদ বললেন। নিয়াজির বক্তব্য ছিল, সীমান্ত থেকে সৈন্য ঢাকায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়। কারণ দিনের বেলায় সৈন্য দেখলেই ভারতীয় বিমান ছোঁ মেরে নামে যেন খোলা উঠোনে একলা মুরগির বাচ্চাটি ধরবে। আবার রাতের অন্ধকারে সৈন্য নড়ানো অসম্ভব; কারণ মুক্তিরা (হামিদ খান মুক্তি কথাটিই ব্যবহার করলেন) ওঁৎ পেতে আছে সর্বত্র। অতএব এ আদেশ মান্য করা সম্ভব নয়, এই ছিল নিয়াজির উত্তর।

দশ ডিসেম্বর গেল, এগারো গেল, বারো চলে যাচ্ছে কিন্তু দুই পরাশক্তির সৈন্য ও নৌবাহিনী নিয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসার নাম-নিশানা নেই। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন-কিসিঞ্জার গংয়ের প্ররোচনায় সিকিউরিটি কাউন্সিল যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব পাস করার চেষ্টা চালায় প্রায় প্রতিদিনই। কিন্তু প্রতিবারই তা নাকচ করে দেয় সোভিয়েত রাশিয়া একাই ভেটো দিয়ে। আমরা প্রমাদ গুণলাম। অতএব, পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ জয় ছাড়া অন্য উপায় নেই।

আইয়ুবের আমল থেকে অবিসম্বাদিতভাবে স্থিরকৃত পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নীতি ছিল যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হলে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে,' অর্থাৎ ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান

আক্রমণ করে তবে, একথা ঠিক যে, একেবারে প্রতিরক্ষাবিহীন পূর্ব পাকিস্তানের পতন অনিবার্য এবং দু'একদিনের মধ্যেই, তখন আমরা পাঞ্জাবিরা পৌঁছে যাব দিল্লিতে। তারপর ভারত 'বাপ' 'বাপ' করে সন্ধির প্রস্তাব দেবে। এই নীতি অনুসরণ করে বর্তমান যুদ্ধও চলছিল, হামিদ বললেন।

কিন্তু দিন-দশেক যুদ্ধের পর পশ্চিম সীমান্তে পরিস্থিতি যা দাঁড়ালো তাতে আমরা প্রমাদ গুণলাম। পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করা তো দূরের কথা, এদিকে ভারত যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে লাহোর পৌঁছতে তাদের বেশি দেরি হবে না। অতএব, পাঞ্জাবের মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে আমরা পশ্চিমে আমাদের যুদ্ধ আরও জোরদার করলাম; কিন্তু আমরা ভারতে প্রবেশ করার পরিবর্তে ভারতই শিয়ালকোটের প্রায় অর্ধেক দখল করে নিয়েছে। অবস্থা চরম। ওদিকে পূর্ব পাকিস্তান প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ভারতের হাতে অর্থাৎ স্বাধীন। এমন সময় কপাল জোরে পুনরায় ইন্দিরা গান্ধী রেডিওতে ঘোষণা জানালেন, 'আমরা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করছি। বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়ে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধের বিপর্যয় বিবেচনা করে, তোমরাও নিজেদের মঙ্গলের জন্য তা মেনে নাও।'

সেদিন ১৪/১৫ ডিসেম্বরের রাত, হামিদ বললেন, আমাদের একটি পুরো আর্মার্ড ব্রিগেড অক্ষত অবস্থায় শিয়ালকোটের নিকটে ছিল। এই ব্রিগেডটিই ছিল আমাদের শেষ আর্মার্ড শক্তি। আদেশ দিলাম প্রাণপণে আক্রমণ করো এবং ভারতীয় আর্মার্ড শক্তিকে ধ্বংস করো কিংবা সুদূরে হটিয়ে দাও। যুদ্ধের প্রচণ্ডতম আর্মার্ড লড়াই হয়েছিল সেদিন; কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। আমাদের একশ' ট্যাঙ্ক একদিনেই ধ্বংস হয়ে গেল, হামিদের কণ্ঠ করুণ।

এরপর মুহূর্তখানেক হামিদ চুপ করে রইলেন। মনে হচ্ছিল কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে বললেন, 'এদিকে ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধ বন্ধ প্রস্তাব ঘোষণা করেই চলেছেন। আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম যে, ওটাও নিচ ও কাপুরুষ ভারতীয়দের আর একটা চালাকি বৈ কিছু নয়। তারা জানতো আমরা মুসলমানরা কিছুতেই যুদ্ধ বন্ধ করবো না—শেষ সৈন্য ও শেষ গুলি পর্যন্ত লড়ে যাবো। আর এদিকে সমস্ত দুনিয়াকে ওরা বোঝাতে পারবে যে, পাকিস্তান জয় করা ছাড়া এ যুদ্ধ বন্ধ হতো না। এই ছুতোয় তারা গোটা পাকিস্তান দখল করে নিতো। কিন্তু আমরা তাদের চালাকি ধরে ফেললাম এবং ১৫ ডিসেম্বর রাতেই ঘোষণা করে দিলাম, 'আমরা যুদ্ধ বন্ধ প্রস্তাব মেনে নিলাম।'

শেষের কথাগুলো বলার সময় হামিদ তাঁর কণ্ঠস্বর ভারি করে ফেললেন, ভান করলেন যে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ছেন এবং আর কথা বলতে পারছেন না। সেই অবস্থায় তিনি পোডিয়ামের পেছন দিয়ে যাতায়াতের পথে দাঁড়ানো তাঁর এডিসির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। এডিসি প্রস্তুত ছিলেন—তিনিও একটি

রুমাল হামিদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি ছোট দরজা দিয়ে কিছুটা পেছনে গেলেন; কিন্তু পুরোপুরি বেরিয়ে গেলেন না এবং সবাই দেখতে পায় এমন করে চোখ মুছতে লাগলেন। এসব কিছুর জন্য তাঁর মিনিট দুই সময় লাগলো। তারপর আবার লেকচার স্ট্যান্ডে ফিরে এসে বললেন যে, তিনি জানেন উপস্থিত শ্রোতাদের মনের অবস্থা; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে কেউ লড়তে পারে না। একথা বলে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। তারপর তিনি শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করলেন।

এরপর যে দৃশ্যের অবতারণা হলো তেমনটা আমি জীবনে কখনো দেখি নি। দেখবো বলে কল্পনাও করতে পারি নি। হামিদের বক্তৃতার সময় প্রশস্ত হল ঘরে উপস্থিত প্রায় সাতশ' অফিসারই যেন কড়াইয়ের তেলের মতো মিনিটে মিনিটে সেকেন্ডে সেকেন্ডে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। শেষের দিকে কড়াইটি যেন অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠলো। এই সময় হামিদের আহ্বান, 'কোনো প্রশ্ন।' তপ্ত কড়াইটা এবার যেন ফেটে পড়লো। কিংবা চার্জ করা বোমাটি পেল যেন দিয়াশলাইয়ের স্ফুলিঙ্গ। প্রায় বিশজন মেজর ও লে. কর্নেল পদবির অফিসার একসাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের চোখে আগুন। উচ্চস্বরে চিৎকার। কান বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সবাইকে নিজেরাই থামিয়ে দিয়ে মেজর রউফ নামক একজন অফিসারকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হলো। মেজর রউফ ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত। কিন্তু একটা নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত সব সৈনিক আর্মির রিজার্ভ হিসেবে থাকেন অর্থাৎ যুদ্ধ লাগলে তাদের ডাকা হয় ও কর্তব্য দেয়া হয়। সেই সুবাদে রউফও রি-কল্ড্ হয়ে এসেছিলেন। অন্য সবার মতো তিনিও অপমানে ক্ষোভে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলেন। রউফের ব্যবহৃত ভাষার হুবহু পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। তবুও চেষ্টা করবো যথাসম্ভব তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে। রউফ বললেন, 'জেনারেল হামিদ (রউফ হামিদকে 'স্যার' না বলে নাম ধরে সম্বোধন করলেন), 'আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্নটি হলো এই যে, আপনারাই আমাদের শিখিয়েছেন এবং বিশ্বাস করিয়েছেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অজেয়। একজন পাকিস্তানি তিনজন ভারতীয় সৈন্যের সমান। তাই যদি হয় তবে আপনি ও আমাদের সামনে বসা এই চাকচিক্যময় পোশাকধারী জেনারেলদের অধীনে আমাদের সেনাবাহিনী হারলো কেন? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমি যুদ্ধের ডাক পেয়ে চিঠি পেলাম মাস দুয়েক আগে। খবর নেয়ার জন্য গেলাম গুজরানওয়ালা জেলার ডিসির অফিসে। ডিসি সাহেব বললেন, রি-কল্ড্ তো হয়েছেন, এখন পাকিস্তানের যেকোনো জায়গায় বদলি হতে পারেন। যদি কোনো বিশেষ জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে থাকে তবে বলুন। হামিদকে (জেনারেল) বলে দেব ও সেই জায়গাতে আপনার পোস্টিং দেবে। এখন আমার প্রশ্ন, আপনি জেনারেল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বজ্যেষ্ঠ

অধিনায়ক। আপনাকে 'হামিদ' বলার সাহস ও অধিকার একজন ডিসি কি করে পেল?'

এই সময় জেনারেল হামিদ কিছু বলার জন্য উদ্যত হলেন। রউফ ধমকের সুরে বললেন, 'আমি জানি ডিসি কেন সাহস পেল। সীমান্ত এলাকায় আপনি সরকার থেকে ২৫০ একর জমি নিয়েছেন। কৃষি বিভাগের ট্রাক্টর ও বীজ ইত্যাদি দিয়ে ডিসিই আপনার জমি চাষ করিয়ে দেয় আর আপনি উৎপাদনটি নেন। কী, যা বলেছি—ঠিক নয়?'

হামিদ কিছু বলার আগেই অন্য একজন মেজর দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর কথা, 'আপনারা সব জেনারেলরাই এ সমস্ত দুর্নীতি করে আর দেশটাকে লুট করে আরামপ্রিয় হয়েছেন। আপনারা যুদ্ধে জিতবেন কী করে? আপনারা হারবেন না তো হারবে কে?

এই সময় অন্য এক মেজর উঠে দাঁড়ালেন এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আপনারা কি মনে করেন আপনাদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ কিভাবে খরচ করেন আমরা তা জানি না? জানি, খরচ করেন মদ্যপান ও মেয়েবাজি করে।'

এই সময় আর একজন মেজর দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি এখনি মদ ত্যাগ করুন এবং প্রতিজ্ঞা করুন যে জীবনে কখনও মদ ও মেয়েবাজি করবেন না।' এই সময় আরও দু-একজন মেজর/লে. কর্নেল সমস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, 'কেবল আপনি নন, সামনে বসা সব জেনারেলরাই এখনি পদত্যাগ করুন।'

এক পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ার কোরের ব্রিগেডিয়ার ফজলে রাযিক (পাঠান— তিনি মদ্যপান করতেন না) দাঁড়িয়ে অনেকটা মেজরদের সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করলেন, কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করা ও পরে মেজর জেনারেল হওয়া যায় কিনা। তিনি বলতে লাগলেন, 'ঠিক কথাই তো। মদ, দুর্নীতি এসব সামরিক বাহিনীতে থাকা উচিত নয়।' কথাটি বলে তিনি সমর্থনের আশায় চারদিকে কিছুটা গর্বের সাথে তাকালেন। এই ফাঁকে এক মেজর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ব্রিগেডিয়ার ফজলে রাযিক তো? আপনার মতো চোর পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, পাকিস্তানের বড় শহরের প্রত্যেকটিতে আপনার জমি নেই? আপনিও পদত্যাগ করুন এবং এখনি। আপনার জমিগুলোও বাজেয়াপ্ত করা হবে।' ফজলে রাযিক 'চোরের' মতোই বসে পড়লেন। এই দৃশ্যটি দেখে আমার মনে হয়েছিল, যে ভয়াবহ নাটকটি সেদিন প্রত্যক্ষ করছিলাম তা একেবারে কৌতুকবিহীন ছিল না।

'বিশ্ববিখ্যাত মার্শাল জাত' পাঞ্জাবি সৈনিকদের এহেন কাণ্ড দেখে অন্যান্য

পাঞ্জাবি ও পাঠান জেনারেল/ব্রিগেডিয়াররা ভীত অবস্থায় মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাদের প্রচণ্ড ভয় ছিল যে এতোক্ষণ তো কেবল কথাই চলছে, কখন না মারপিট শুরু হয়। এদিকে লে. জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন ও আমরা দু'তিনজন সিনিয়র বাঙালি, দৃশ্যটিতে প্রথমত কিছুটা ভীত বোধ করলেও শেষের দিকে আনন্দই অনুভব করছিলাম এবং হলের মধ্যে কেবল আমাদের মাথাই উঁচু ছিল।

ভুট্টো-গুল হাসান গ্রুপের বিজয়

এদিকে একই সাথে আরও একটি নাটক চলছিল—ক্ষমতা দখলের রাজনীতির। আগেই বলা হয়েছে যে, জেনারেল হামিদ তো সভাটি ডেকেছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পতনের পর পাঞ্জাবি অফিসারদের সমর্থন নিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করবেন সেই অভিলাষে। গোড়ায় তাই একটি করুণ গোছের বক্তৃতা ও কান্নার অভিনয়ও করলেন। কিন্তু তারপরেই সমর্থন তো দূরের কথা অফিসাররা ফেটে পড়লো ক্ষোভে ও চরম অপমানবোধে। যেই না এই অবস্থাটা ফুটে উঠলো—হয়তো মিনিট পনেরো-বিশেক হবে, লে. জেনারেল গুল হাসান, যাঁকে চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) পদের অধিকারী হিসেবে হামিদ খানের পরেই সামরিক বাহিনীর তৃতীয় শক্তিধর ব্যক্তি বলা চলে, সহসাই বেরিয়ে গেলেন, অনেকটা অলক্ষ্যে। আমার পাশের অফিসার কানে কানে বললেন, 'ওই দেখ গুল হাসান যাচ্ছে।' অর্থাৎ গুল হাসান চললেন পাঞ্জাব হাউসে যেখানে ভুট্টো অপেক্ষমাণ।

আগেই বলেছি গুল হাসান, বিমানবাহিনী প্রধান রহিম খান ও ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। কারণ পরিস্থিতি তখন এই যে, খারিয়ানের ডিভিশন, জেনারেল গুল হাসানের একান্ত অনুগত বাহিনী, চারদিক ঘিরে আছে আর রহিম খানের যুদ্ধবিমানগুলো ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। আরও বড় সুবিধা, পাঞ্জাবের জনগণ সামরিক বাহিনীর ওপর আস্থা হারিয়েছে। এই অবস্থায় ভুট্টোর ক্ষমতা গ্রহণ সহজ হয়ে গেল এবং তিনি ওই দিনই অর্থাৎ ২০ ডিসেম্বর গুল হাসান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান রেডিওতে প্রচারিত ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনি রাত প্রায় এগারোটায় টিভি ও রেডিওতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। ভাষণটি লিখিত ছিল না। কিন্তু প্রবল আত্মবিশ্বাস সহকারে ভুট্টো ভাষণ দিলেন। ঘটলো বিভিন্ন রাজনৈতিক রদবদল। সর্বজেনারেল হামিদ খান, পীরজাদা, মিঠ্ঠা খান, ওমর খান, খুদাদাদ ও আরও কয়েকজন জেনারেলসহ

সর্বমোট এগারজনকে অবসর দেয়া হলো এবং লে. জেনারেল গুল হাসানকে সেনাপ্রধান করা হলো। কিন্তু তাঁকে পদোন্নতি দেয়া হলো না, তিনি আপাতত লে. জেনারেল রয়ে গেলেন। আদেশটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর হলো। এখানে একটি কৌতুকপ্রদ কথা না বললেই নয়। যে এগারোজন জেনারেলকে অবসর দেয়া হলো তাঁরা পরদিনই অর্থাৎ ২১ তারিখে তাঁদের পেনশন ও সমস্ত পাওনা (প্রত্যেকের দু'তিন লাখ টাকা) নিয়ে পিণ্ডি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

এভাবে একাত্তরের গোড়ায় আঁটা ভুট্টোর ষড়যন্ত্র বছরের শেষের দিকে ২০ ডিসেম্বর সামগ্রিকভাবে সফল হলো। বিরোধী দলের নেতা হিসেবে তিনি ভাঙা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন। কথাটি পরিষ্কার করার জন্য আবারও কিছু পশ্চাৎ ইতিহাস টানা প্রয়োজন।

লারকানা ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আগেই বিশদভাবে বলা হয়েছে। লারকানা ষড়যন্ত্রের পরের ইতিহাস সকলের জানা। একাত্তরের মধ্য-জানুয়ারিতে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে ছয় দফা নিয়ে আলোচনা, কিন্তু ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে কোনো স্পষ্ট প্রস্তাব না দেয়া, ২৩ জানুয়ারিতে মুজিব-ভুট্টো আলোচনায়ও অনুরূপভাবে কেবল ছয় দফা নিয়ে আলোচনা এবং ভুট্টোর তরফ থেকে সংবিধান রচনার কোনো প্রস্তাবনা না রাখা, ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টের বৈঠক স্থির করা, ভুট্টো কর্তৃক পাকিস্তান থেকে আগমনরত অন্যান্য দলের পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে প্রাণের ভয় দেখানো, ইয়াহিয়া কর্তৃক ১৫ ফেব্রুয়ারির বৈঠক পিছিয়ে মার্চের প্রথমে নেয়া, ১ মার্চ পার্লামেন্ট বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা—এসবই ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের ফসল।

ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তীব্র রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়লো। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো। পাকিস্তান সরকার অস্ত্র প্রয়োগ করে মুজিবের আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলো। ফলত ৩ মার্চ রেডিও-টিভিতে প্রদত্ত ভাষণে ইয়াহিয়া কর্তৃক শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেয়া হলো।

এদিকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আনার জন্য সময় প্রয়োজন। পরিকল্পনা হলো ইয়াহিয়া খান ঢাকা যাবেন ও শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার অভিনয় করে সময় ক্ষয় করবেন। আলোচনা যতো দীর্ঘ হয় ততো ভালো, যতো বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হয় ততো ভালো। এদিকে শেখ মুজিব এই পরিকল্পনার সবই জানতেন তবুও তাঁর পক্ষে সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত আলোচনায় অংশগ্রহণ ছাড়া উপায় ছিল না। যেহেতু ইয়াহিয়া খান গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে শেখ মুজিবের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন না, আলোচনার অভিনয় সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকলো। ২৫ মার্চ ঘনিয়ে এলো। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সর্বতোভাবে প্রস্তুত। ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করে পাকিস্তানে ফিরে

গেলেন। ভুট্টোও ফিরে গেলেন। ইতোপূর্বে তিনিও এসেছিলেন আলোচনার অভিনয় করতে। ইয়াহিয়া যাওয়ার সময় সামরিক বাহিনীকে হুকুম দেন যে, তারা যেন বাঙালির ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এমনভাবে নিধন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় যে ভবিষ্যতে বাঙালি কখনো যেন স্বাধিকারের কোনো স্বপ্ন আর না দেখে। ভুট্টো ফিরে গেলেন ও করাচি নেমেই ঘোষণা করলেন, আমাদের দেশপ্রেমিক বীর সামরিক বাহিনী পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে।

তবে এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, সেদিন ভুট্টো মনেপ্রাণে খুশি হয়েছিলেন এই দেখে যে 'দেশপ্রেমিক এবং মনবিহীন' পাকবাহিনী স্বদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার কাজটিতে সফলভাবে হাত দিয়েছে। অতএব, তাঁর ষড়যন্ত্র প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ তরতরিয়ে এগিয়ে গেল। পরে গোপনে ইয়াহিয়া ও হামিদ খানের অনুগত অংশকে এড়িয়ে ভুট্টো গুল হাসান ও রহিম খানের সাথে বন্ধুত্ব এবং ক্ষমতা ভাগাভাগির ষড়যন্ত্র করলেন। আর একাত্তরের ২০ ডিসেম্বর সেই ষড়যন্ত্র, সেই পরিকল্পনাই সর্বতোভাবে সফলতা লাভ করলো।

এখানেই আবার উঠে এলো আটকে পড়া বাঙালিদের প্রসঙ্গ। তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন ইতোমধ্যে বদলে গেছে, এদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সিদ্ধান্তটিও এখন পরিবর্তিত হতে বাধ্য। ভিন্ন পরিস্থিতিতে এদেরকে খাঁচায় পোড়ার কাজটি হয়ে পড়লো অবশ্যম্ভাবী। কেননা তাঁদের বিনিময়ে তো বাংলাদেশ/ভারত থেকে পাকিস্তানের তিরানব্বই হাজার যুদ্ধবন্দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই লাখখানেক যুদ্ধবন্দিকে ফিরিয়ে না আনতে পারলে ভুট্টোর ক্ষমতার উৎস পাঞ্জাবে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে এবং হতে পারে তাতে তাঁর অস্তিত্বও বিপন্ন হবে।

বিজয়ের পরে ভুট্টোর ক্ষমতার সংহতি

বাঙালিদের খাঁচায় পোড়ার আগে আরও কাজ বাকি ছিল ভুট্টোর। সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল প্রাপ্ত ক্ষমতা সংহত করা। বলাবাহুল্য, সম্পূর্ণ নিজস্ব কিংবা জনগণের দেয়া ক্ষমতা নিয়ে তো তিনি প্রেসিডেন্ট হন নি। হয়েছেন সামরিক বাহিনীর, বিশেষ করে ক'জন উচ্চপদস্থ সামরিক জেনারেলদের সমর্থনে। অতএব, প্রথম পর্যায়েই ক্ষমতা নিজ হাতে সংহত করতে হবে। কাজেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হলো। আমাদের বন্দিশিবিরে যাওয়া প্রসঙ্গের আগে সেই ক্ষমতার সংহতি পর্ব বর্ণনা করা প্রয়োজন।

ক্ষমতালাভের কয়েকদিনের মধ্যে ২৮ ডিসেম্বর ভুট্টো ঠিক হামিদ খানের সভার মতো করে রাওয়ালপিণ্ডিতে উপস্থিত মেজর ও তদোর্ধ্ব পদবির সামরিক

অফিসারদের সেই আইয়ুব হলেই ডাকলেন। জেনারেলদের বেশির ভাগ তো পিণ্ডিতে। কাজেই এদের সমর্থন পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভুট্টো বক্তৃতা শুরু করলেন। তার সারমর্ম, আমাদের যা ছিল কল্পনারও বাইরে সেই পাকিস্তানের পরাজয়, আমাদের বন্ধু দুই পরাশক্তির শেষ পর্যন্ত আমাদের সাহায্যে না আসা, পরাজিত পাকিস্তান আজ দ্বিখণ্ডিত ও বিধ্বস্ত, আজ পাকিস্তানের সম্মানও পৃথিবীর কাছে বিধ্বস্ত ইত্যাদির বর্ণনা গোড়াতে দিলেন। তারপর বললেন, পাকিস্তানকে বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে পুনরায় টেনে তুলতে হবে, মুস্‌লুম বাংলার সাথে (ভুট্টো মুসলিম কথাটি মুস্‌লুম উচ্চারণ করতেন এবং বাংলাদেশকে মুসলুম বাংলা বলতেন) পুনরায় পাকিস্তানের সম্পর্ক এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন মুসলুম বাংলাও পাকিস্তানের সাথে থাকে। বিধ্বস্ত সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। আটকে পড়া পাকিস্তানি বন্দিদের ফিরিয়ে আনতে হবে ইত্যাদি। তাঁর কথায় সর্বক্ষণই অনুরণিত হচ্ছিল যে তিনিই একমাত্র নেতা, যার নেতৃত্বেই কেবল এইসব অর্জিত হওয়া সম্ভব।

বক্তৃতা শেষে ভুট্টো উপস্থিত অফিসারদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করলেন। অর্ডন্যান্স কোরের যে শ্মশ্রুময় মেজর হামিদ খানকে বলেছিলেন যে, প্রতিজ্ঞা করুন আজ থেকে মদ্যপান ও মেয়েবাজি ছেড়ে দেবেন, সেই মেজরই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনি তো শুনেছি মদ্যপান করেন। পাকিস্তানের মতো ইসলামিক দেশে প্রেসিডেন্ট হলে তো আপনাকে মদ্যপান ছাড়তে হবে।

পরাজিত জেনারেল ও বিজয়ী ক্ষমতাসীন জেনারেলের মধ্যে থাকে রাতদিন পার্থক্য। এই প্রস্তাবটি শুনে হামিদ খান অপ্রস্তুত হয়েছিলেন ও আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, ওই দুটি অভ্যাসই তিনি পরিত্যাগ করবেন। আর বিজয়ী ভুট্টোর উত্তর, 'সত্যি বলতে কি আমি মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করে থাকি। সারাদিন বহু খাটাখাটুনির পর যখন দেহমনে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি তখন কিছুটা মদ্যপান করে থাকি।' এ কথাগুলো ভুট্টো সাধারণ কথোপকথনের সুরে বললেন। তারপর অনেকটা গর্জে উঠে বললেন, 'আমি তো কেবল মদ্যপানই করি, তাও নিজের পয়সায়। অনেকে আছেন যাঁরা (নিজের থুতনিতে হাত লাগিয়ে), এখানে 'নিয়ন সাইন' লাগিয়ে কপালে দাগ তুলে মানুষের রক্ত পান করেন। আমি মদ্যপান করি, কারও রক্তপান তো করি না। আপনারা আমার বক্তৃতা সম্বন্ধে কিছু জানা-বোঝার থাকলে প্রশ্ন করুন। আমি খোলাসা করে দিবো। এইসব অবান্তর মন্তব্য করে উপস্থিত সুধীজনের ও আমার সময় নষ্ট করবেন না। আমার অনেক কাজ। আপনি বসে পড়ুন।'

মেজরটি বসে পড়লেন। উপস্থিত অফিসারদের কাছ থেকে উল্লেখ করার মতো দ্বিতীয় প্রশ্ন আর এলো না।

বুক ফুলিয়ে সদর্পে ভুট্টো তাকালেন চা-নাশতা যেখানে রাখা ছিল সেই দিকে

এবং সকলকে চায়ে আমন্ত্রণ জানালেন। এই সময় জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন গিয়ে ভুট্টোকে জিগ্যেস করলেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ কি? কবে পাঠাবেন আমাদেরকে বাংলাদেশে?' ভুট্টোর তাৎক্ষণিক জবাব, 'নো হার্ট ফিলিংস জেনারেল। আপনাদের পাঠাতে কিছু দেরি হবে।' এরপরে জেনারেল ওয়াসিকে আর কোনো কথার সুযোগ দিলেন না।

খবরটি শুনে আমাদের মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনন্দে উড়ু উড়ু অবস্থা থেকে যেন মাটিতে পা পড়লো। প্রথমে বলাবলি ও পরে নিশ্চিতভাবেই আমরা বুঝলাম যে, বাঙালিদের এক এক করে বাংলাদেশে পাঠানোর পরিবর্তে পুরোপুরিভাবে (আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও) বন্দি করা হবে এবং প্রয়োজনমতো বন্দিশিবিরে পাঠানো হবে। কে জানে কতোদিন আলোচনার পর এই বন্দি বিনিময় বাস্তবায়িত হবে।

আমরা আশঙ্কা করে থাকলাম, যেকোনোদিন আমাদেরকে বন্দিশিবিরে পাঠানো হবে; কিন্তু তা হয় নি। দিন যাচ্ছে, সপ্তাহ যাচ্ছে আমরা যার যার বাসায় ও ব্যারাকেই আছি; কিন্তু কঠোর পাহারায়। তবে বন্দিশিবিরের মতো কাঁটাতারের বেড়া ছিল না। এই সুযোগে দুই একজন অফিসার কাবুল হয়ে পলায়ন করে ঢাকায় পৌঁছেন। আর আমাদের ওপর 'কঠোর' পাহারা কঠোরতর হয়। আমাদের মানসিকভাবে নির্যাতন করাও বাড়ে। যুদ্ধ শেষ। এই সময় পলায়ন মানে নেহায়েত নিজের স্বার্থসিদ্ধি। এতে আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু ওঁদের পলায়নের পরে অন্য সকলের সামান্য স্বাধীনতা, যেমন বাজারে যাওয়া, সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। অতএব, ওঁদেরকে এখানে বন্দি সবাই বিবেকহীন স্বার্থপর বলেই গালমন্দ করতেন।

ভুট্টোর ক্ষমতা সংহতির কার্যক্রম

এদিকে ভুট্টোর ক্ষমতা সংহতির কার্যক্রম জোরেশোরেই চলছে। অতএব, আমাদের আনুগত্য নির্ধারণের মতো অপেক্ষাকৃত কম জরুরি কাজ অপেক্ষা করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, ভুট্টোর নিজের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য এবং ভুট্টোকে ক্ষমতা দখলে সাহায্যকারী গুল হাসান ও রহিম খানের উদ্দেশ্য এক ছিল না। ভুট্টোর পরিকল্পনা ছিল—যে সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি ক্ষমতা দখল করেছেন তাকে কেটেছেঁটে সাইজমতো করা, যাতে তারা আবার অন্য কাউকে তাদের ইচ্ছেমতো ক্ষমতায় বসাতে না পারে। এদিকে গুল হাসান ও রহিম খানের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তাঁরা জানতেন যে, বর্তমানে তাঁদের পক্ষে সরাসরি ক্ষমতা দখল করা বাস্তবসম্মত ছিল না, কেননা পরাজিত সেনাবাহিনীর

ওপর দেশবাসীর তো বটেই, এমনকি সৈনিকদেরও আস্থা নেই। কাজেই ভুট্টোকে অন্তর্বর্তীকালীনভাবে প্রতিভূ হিসেবে ক্ষমতায় বসিয়ে আসল ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে হবে। প্রয়োজনমতো সময় ও সুযোগ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা নিজেদের হাতে সরাসরি তুলে নেয়া যাবে।

ক্ষমতা দখলের দিন পনেরো পরে ভুট্টো কোনো এক ভাষণে সামরিক বাহিনীর বর্তমান শৃঙ্খলাবোধ এবং নেতৃত্বের দুর্বলতা নিয়ে একটু শক্ত ভাষায় সমালোচনা করলেন। তিনি আরও বললেন যে, নিজের হাতে তিনি সেসব দিকের উন্নতি সাধিত করবেন। তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত ছিল যে, ৫০-এর দশক থেকে পাক সামরিক বাহিনী যে 'রাজত্বের মধ্যে রাজত্ব' প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে, তা এবার শেষ করবেন এবং সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নির্বাচিত সরকারের হাতে অর্থাৎ নিজের হাতে নিয়ে আসবেন। সেনাবাহিনীতে এর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা জানার জন্য হয়তো ভাষণটি পরীক্ষামূলক ছিল।

দেখা গেল সেনাসদরে এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া বিরূপ হলো। সেনাসদরে (জি.এইচ.কিউ) প্রতি সপ্তাহে অফিসারদের একটি আলোচনা সভা হতো। এজন্য জি এইচ কিউ'র নিজস্ব মঞ্চ ছিল। সেখানে সেনাপ্রধান বক্তৃতা দিতেন। তাতে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা আলোচিত হতো। সেনাবাহিনীর জন্য কোনো সমালোচনা কিংবা উপদেশ থাকলে তাও প্রদান করা হতো। ভালো কাজের জন্য বাহবা দেয়া হতো। বক্তব্যের শেষে অফিসারদের কাছ থেকে প্রশ্ন অথবা মন্তব্য আহ্বান করা হতো। মাঝে মধ্যে বাইরের কোনো প্রখ্যাত বক্তাকেও আমন্ত্রণ জানানো হতো।

ভুট্টোর এই বক্তব্য প্রদানের পর যে সাপ্তাহিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে বেশ জোরালো ভাষায় ভুট্টো কর্তৃক সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার প্রস্তাবের সমালোচনা করা হয়। হাউজ থেকে অর্থাৎ অফিসারদের মধ্য থেকে সমালোচনা আসে এবং এই ব্যাপারে সেনাপ্রধান গুল হাসান কী করবেন তা জিগ্যেস করা হয়। আগেই বলা হয়েছে, পঞ্চাশের দশক থেকে সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে চলতে অভ্যস্ত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে নির্বাচিত সরকার থাকলেও তার প্রতি অবজ্ঞা ছাড়া অন্য কোনো মনোভাব সেনাবাহিনীর ছিল না। এরপর তো আইয়ুব সরাসরি ক্ষমতা দখল করেন। তখন থেকে প্রায় তের বছর পর্যন্ত সেনাবাহিনী বেসামরিক লোকদেরকে আদেশ করেই অভ্যস্ত। বেসামরিক লোকের আদেশ পালন তাদের ধাঁচে নেই। পাকবাহিনীর বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকে (পূর্ব পাকিস্তান সমেত) রক্ষা করা, স্থিতিশীল রাখা ও একে শাসন করার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি হয়েছে। আবার এদিকে সেনাবাহিনী মানেই পাঞ্জাব। তবে 'দোকানের জানালা' সাজানোর জন্য কিছু পাঠান এবং পরে

রাজনৈতিক কারণে শতকরা পাঁচ ভাগ বাঙালি নেয়া হলো।

ত্রিশ/চল্লিশের দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি সবচেয়ে জোরালো সমর্থন গড়ে ওঠে বাংলার মুসলিম ও ভারতের ওইসব প্রদেশের মুসলিমদের মধ্যে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র সিন্ধু প্রদেশ ব্যতীত কারও তেমন জোরালো সমর্থন ছিল না পাকিস্তান দাবির প্রতি–পাঞ্জাবেরও না। এদের সমর্থন ব্যক্ত হয় নিতান্ত শেষের দিকে, যখন পাকিস্তান আগত প্রায়। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেই পাঞ্জাবি মুসলিমরা উপকৃত হলো সবচেয়ে বেশি। কেবল তাই নয়, গণতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটন করে পাঞ্জাবিরাই, একমাত্র সেনাবাহিনীতে তাদের সংখ্যাধিক্যের বলে, পাকিস্তানে তাদের সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করে সমগ্র পাকিস্তানে পাঞ্জাবি শাসন ও শোষণের কায়েমি বন্দোবস্ত করে বসলো।

অতএব, পাঞ্জাবের সবাই সামরিক শাসন সমর্থন করতো। নেহাত পাঞ্জাবের নিজের স্বার্থের খাতিরে সমগ্র পাঞ্জাব ছিল একত্র—একাট্টা। যেমন পাঞ্জাব ছিল একত্র তেমনি ছিল পাঞ্জাবি আমলাতন্ত্র (এরাই ছিল পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের ৭৫%) এবং এদের সঙ্গে ছিল পাঞ্জাবের শক্তিশালী সামন্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীটিকে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে নির্মূল করে দেয়া হয়েছিল। অথচ পাঞ্জাবে এই শ্রেণীর পরিবারের এক ছেলে সেক্রেটারি, তো অন্য ছেলে জেনারেল। পাঞ্জাবের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরাও সামরিক শাসনের বদৌলতে অন্য প্রদেশ থেকে শোষিত রস উপভোগ করতো; কিন্তু এই রাজনৈতিক ক্ষমতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বহাল রাখা সম্ভব ছিল না। পাঞ্জাব পশ্চিম পাকিস্তানে একক বৃহত্তম প্রদেশ (৫৭%) হলেও সমগ্র পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব 'এক ব্যক্তি এক ভোট' মানেই বাঙালি শাসন ও অন্যান্য প্রদেশেরও ক্ষমতার ভাগ পাওয়া। এই ব্যবস্থা হওয়া মানে পাঞ্জাবের অপূরণীয় ক্ষতি। অতএব, এই ব্যবস্থা যে করেই হোক রুখতে হবে। এটা হতে না দেয়ার একমাত্র পথ সামরিক শাসন।

এই সামরিক শক্তি আজ পরাজিত। সেই সুবাদে এবং গুল হাসান ও রহিম খানের সাহায্যে ভুট্টো ক্ষমতায়; কিন্তু তাই বলে তো আর আসল ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর হাতছাড়া হতে পারে না। ফলত ভুট্টোর মাতব্বরিতে পাঞ্জাবি অফিসারদের এই বিরাগ।

এখন সেনাপ্রধান গুল হাসানের নিজের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। নিজে পাঠান হলেও পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীই তাঁকে নেতৃত্ব দিয়েছে। তিনি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট। তাঁর ডানা কেটে দেয়ার প্রস্তাব প্রকাশ পেয়েছে ভুট্টোর ঘোষণায়। তাই তিনিও গর্জন করে উঠলেন, না, এটা চলতে দেয়া যায় না। আমি আজই প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলবো ও তাঁকে সাবধান করে দেবো।

গুল হাসানের আস্ফালন শুনে সেদিন আমার মনে হলো তিনি হয়তো পৃথিবীতে ক্ষমতা দখলের ইতিহাস পড়েন নি কিংবা পড়লেও এখন মনে নেই। সম্রাট বেঁচে থাকা অবস্থায় যেসব সেনাপতি ও অমাত্যরা সম্রাটের পুত্র কিংবা অন্য কোনো বিদ্রোহীকে সফলতার সাথে ক্ষমতায় বসায়, সেই সেনাপতি ও অমাত্যবর্গকে নতুন সম্রাটের হাতে সর্বপ্রথম প্রাণ হারাতে হয়। নতুন সম্রাট খুব ভালোভাবে জানেন যে, যাঁরা তাঁর পিতার নুন খেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, তাঁরা প্রথম সুযোগে তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরবেন। দ্বিতীয়ত, নতুন সম্রাট এও জানেন যে, যে অমাত্যরা তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছেন তাঁরা মুহূর্তের তরেও ভুলবেন না যে নতুন সম্রাট তাঁদেরই সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁদের হাতের পুতুল।

এরপর কয়েক সপ্তাহ সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ভুট্টোর সুর কিছুটা নমনীয় হয়েই ছিল। আমরাও ভাবলাম এখন সময় হয়েছে আমাদের আনুগত্য প্রকাশ ও দেশে ফেরার ব্যবস্থা নেয়ার। কিন্তু না, আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখনও কারণ কিছুই অনুমান করতে পারি নি। পরে বুঝেছিলাম যে, পাকিস্তানের ক্ষমতার সংগ্রাম শেষ হয় নি। সংগ্রাম বলা হোক আর ক্ষমতার সংহতি বলা হোক, তখন তা তুঙ্গে। ক্রমশ সিদ্ধান্তবাহী চূড়ান্ত দিনটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কানে আসে, প্রায়ই গুল হাসান ও ভুট্টোর মধ্যে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে নীরব গোছের মতবিরোধ হচ্ছে। ক্ষমতা সংহত অর্থাৎ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে কার জয় হবে এই নিয়ে লোকের কৌতূহল বেড়েই চলছিল। অবশেষে সেই দিনটি এলো।

ক্ষমতা সংহতির প্রাথমিক বড় পদক্ষেপ

দিনটি ৩ মার্চ ১৯৭২ সাল। স্থান সিহালা। সামরিক বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র সাপ্লাই পয়েন্ট ও তার পরিদর্শন বাংলো। পিণ্ডির অদূরে এবং পিণ্ডি-লাহোর মহাসড়কের পাশে একটি নির্জন, অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর সিহালা নামক গ্রামে অবস্থিত। এর পাশে ক্ষুদ্র সাপ্লাই কেন্দ্রটি। এর অধিনায়ক সাধারণত লেফটেন্যান্ট কিংবা জুনিয়র ক্যাপ্টেন। কয়েকজন বাঙালি অফিসার ছিলেন এর প্রধান। সেই সুবাদে আমরা অনেকে কয়েকবার গিয়েছি সেখানে দিন কাটাতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অত্যন্ত মনোরম একটি জায়গা। চারদিকে মাঝারি গোছের উঁচু সবুজ পাহাড়। গাড়ি-ঘোড়া বিশেষ নেই, জায়গাটা নির্জনও। বাচ্চারা যেদিকে খুশি দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। বড়রাও বাচ্চাদের মতো নানা খেলা খেলতো। ছোটো বাড়ি। দুটি শোবার ঘর—বাথরুম সঙ্গে। একটি খাবার ও

বসার ঘর। সবই ক্ষুদ্র সাইজের। এ রকম পরিদর্শন বাংলো সামরিক সেনানিবাসে বহু জায়গায় আছে।

কিন্তু জায়গাটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে যখন ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গে ভবিষ্যৎ আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে ওই দু'কামরায় আটক রাখা হয় বেশ কয়েকদিন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আন্তর্জাতিকভাবে যখন সিদ্ধান্ত হয় যে, বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেনকে মুক্তি দিতে হবে এবং বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে হবে, তখনই তাঁদেরকে জেলখানা থেকে এনে এই সিহালার পরিদর্শন বাংলোতে আটক রাখা হয়। সেখানে তাঁরা ছিলেন ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই সময় ভুট্টো শেখ সাহেবকে চাপের পর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন, তাঁর ভাষায় মুসলুম বাংলা যেন পাকিস্তানের সাথে কোনো না কোনো রাজনৈতিক বন্ধন অব্যাহত রাখে—তা যতোই ঢিলেঢালা গোছের হোক না কেন।

এদিকে শেখ মুজিবকে জেলখানায় রেডিও পর্যন্ত দেয়া হয় নি। কাজেই তিনি হয়তো ভালো করে জানতেনও না যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ভুট্টোর মুখে, ভুট্টোর ভাষ্যমতে, তিনি জানতে পারেন সঠিক তথ্য। ভুট্টো তাঁকে নিজের সুবিধামতো করে সংবাদটি পরিবেশন করেন। নিশ্চয় সব কথা খোলাসা করে বলেন নি। বঙ্গবন্ধুর উত্তর একটিই, 'দেখো ভুট্টো, আমি এখনও তোমার বন্দি, নিজের দেশে যাই নি। দেশে ফিরে না গিয়ে তোমার সাথে কি চুক্তি আমি করবো বা করতে পারি? আর কতোটুকুই-বা তার দাম হবে? (এই ঘটনাগুলো পরে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর কাছে আমার শোনা)। পরবর্তী সময়ে সিহালা একটি ছোট পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিল।

এই অখ্যাত ও বিখ্যাত কিন্তু নির্জন সিহালার পরিদর্শন বাংলোতে ভুট্টো একাধারে দাওয়াত করলেন তিন বাহিনীর প্রধানকে, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও খানাপিনা হবে। সেখানে পৌঁছানোর পর পিস্তল উঁচিয়ে গুল হাসান ও রহিম খানকে বসানো হলো পাঞ্জাবের গভর্নর মুস্তফা খারের গভর্নমেন্ট হাউসের অফিসিয়াল গাড়িতে। মুস্তফা খার নিজেই গাড়ি চালালেন। গাড়িটি সিকিউরিটি গার্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। গাড়ি সোজা গিয়ে উঠলো পাঞ্জাবের গভর্নরের প্রাসাদে। সেনাপ্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধানকে তাঁদের পদত্যাগপত্র এগিয়ে দেয়া হলো দস্তখত করার জন্য। মুখে ও ভাবসাবে জেনারেল গুল হাসান ছিলেন এক নেপোলিয়ান; কিন্তু পিস্তলের মুখে নিজের প্রাণের মায়াটা সাহসের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। অশ্রুসিক্ত চোখে দু'জনে নিজেদের পদত্যাগপত্রে দস্তখত করলেন। এদিকে টেলিভিশন ও রেডিওতে রাতের খবরে ঘোষণা করা হলো যে, সেনাপ্রধান (সি-এন-সি) লে. জেনারেল গুল হাসান ও বিমানবাহিনী প্রধান অর্থাৎ বিমান সি-এন-সি রহিম খান নিজ নিজ অবস্থান থেকে পদত্যাগ করেছেন

এবং সেনাবাহিনীর পদে জেনারেল টিক্কা খানকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, এখন থেকে কমান্ডার-ইন-চিফ (সি-ইন-সি) কথাটি তিন বাহিনীর কোথাও থাকবে না। তার পরিবর্তে এঁদের জন্য চিফ অব আর্মি স্টাফ (সি এ এস), চিফ অব এয়ার স্টাফ পদবিগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান খান তাঁর স্মৃতিকথায় (২০০০ সালে প্রকাশিত) নিজেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শেষ কমান্ডার-ইন-চিফ আখ্যা দিয়ে উপরোক্ত ঘটনাবলির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা কিছুটা ভিন্নরূপ। গুল হাসান তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, চারদিকে নানা গুজব উঠলেও আসল ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ।

ভুট্টো ৩ মার্চ তিন বাহিনী প্রধানকে তাঁর প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ডাকলেন, বিকেল তিনটার সময়, তাঁরা তাঁকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বোঝাবেন। সেখানে তিনি নিজে থাকবেন– অন্য কেউ থাকবে না। অন্য কেউ থাকবে না কথাটি এজন্য বলেছিলেন যে, ইতোপূর্বে ভুট্টো একবার তিন বাহিনী প্রধানদের পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে বলেছিলেন তিনি ও তাঁর কেবিনেটের সদস্যদের সামনে; কিন্তু এতে গুল হাসান ও রহিম খান রাজি হন নি। ভুট্টোকে এতোটা বিশ্বাস করা গেলেও তাঁর সিভিলিয়ান মন্ত্রীদের এসব টপ সিক্রেট বিষয় নিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। ভুট্টো বলেছিলেন, কেবিনেট সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। গুল হাসানের উত্তর ছিল— জনপ্রতিনিধি হলে কি হবে তাঁরা তো সিভিলিয়ান—বেসামরিক লোক। কেবিনেটসহ ব্যাখ্যা শোনানোর জন্য প্রস্তাবিত স্থানটি ছিল সিহালা পরিদর্শন বাংলো। অন্য সব সুবিধাজনক জায়গা ছেড়ে ভুট্টো আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র বাংলোটিকে কেন নির্ধারিত করেছিলেন তা ঠিক বোধগম্য নয়। তবে গুল হাসানের আপত্তি হেতু এই বৈঠকটি হতে পারে নি। পরের সপ্তাহে ভুট্টো নিজের প্রাসাদেই এই ব্যাখ্যার বন্দোবস্ত করেন এবং বলেন যে, তিনি সে ব্যাখ্যার সময় একা থাকবেন।

৩ মার্চ নির্ধারিত সময়ে গুল হাসান প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হাজির হন; কিন্তু হাজির হন উর্দির পরিবর্তে সিভিলিয়ান পোশাকে। এর ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। তবে দুই লাইনের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশ পড়লে মনে হয়, এ ছিল অবজ্ঞা। কিন্তু 'দুষ্ট' লোকে বলে তিনি কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন। হয়তো এজন্যই লাহোরের পথে খারিয়ান সেনাছাউনির কাছে গুল হাসানের অনুগত বাহিনীর কয়েকটি ট্যাংক লাহোর মহাসড়কে অবস্থানও নিয়েছিল গুল হাসানের শেষরক্ষার জন্য; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্দি হিসেবে গুল হাসানের লাহোর যাত্রার কোনো বিঘ্ন ঘটায় নি।

যাই হোক, গুল হাসানের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে পৌঁছে

দেখলেন কেবিনেটের অনেকে সেখানে আছেন। তাঁদের সাথে পাঞ্জাবের গভর্নর মুস্তফা খার ও সিন্ধুর গভর্নর মোমতাজ ভুট্টোও রয়েছেন। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের জাতৈ (সিন্ধুর), জে. এ. রহিম প্রমুখও ছিলেন। সবাই একসাথে বসলেন। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা আলোচনার কোনো নাম-গন্ধ নেই। গুল হাসান ও রহিম খানকে ভুট্টো পরিষ্কার করে বলে দিলেন, 'তোমরা দু'জন আমার আদেশ পালন করতে ইচ্ছুক নও। অতএব, আমাদের একসাথে সরকারে থাকা চলে না।' অর্থাৎ তোমাদের বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। তাঁদের দু'জনের পদত্যাগপত্র টাইপ করে তৈরি ছিল। তাঁরা সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র দুটো এগিয়ে দেয়া হলো এবং তাঁরা তাতে দস্তখত করলেন। পরে করমর্দন করে বিদায় নিলেন গুল হাসান ও রহিম খান। যদিও কারণটি তিনি ব্যাখ্যা করেন নি তাঁর বইয়ে, গাড়ি বারান্দায় গিয়ে দেখলেন পাঞ্জাবের গভর্নরের প্রকাণ্ড গাড়ি, সেই গাড়ির পেছনের সিটে বসার জন্য ইশারা করা হলো গুল হাসান ও রহিম খানকে। আদেশ যথারীতি পালিত হলো।

সামনের সিটে দু'জন—মুস্তফা খার ডানে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে আর বাঁয়ে মোমতাজ ভুট্টো। পেছনের সিটে গুল হাসান মধ্যবর্তী আসনে, তাঁর ডাইনে রহিম খান এবং বাঁয়ে সিন্ধুর ভুট্টো-বন্ধু জাতৈ। জাতৈয়ের পকেটে রাখা পিস্তলটি মাঝে মাঝেই গুল হাসানের পাঁজরের কাছে অনুভূত হচ্ছিল। এছাড়া পুলিশ গার্ডের একটি চকচকে গাড়ি তাঁদের পিছু পিছু অনুসরণ করছিল। এভাবে তাঁরা সোজা চলে আসেন লাহোরের গভর্নর প্রাসাদে। রাতে খানাপিনা হলো। পাক রেডিওতে গুল হাসানের পদত্যাগ ও টিক্কা খানের সেনাপ্রধান পদে নিযুক্তির ঘোষণা শোনা হলো। ওইদিন কি পরদিন গুল হাসান অনুরোধ করলেন ভুট্টোর সাথে ফোনে কথা বলবেন। ভুট্টোর সাথে তাঁকে কথা বলতে দেয়া হলো। তারপর ঠিক হলো গুল হাসান ও রহিম খান গভর্নরের সাথে তাঁর প্লেনে করে পিণ্ডি যাবেন। তার দুই একদিন পরে তাঁরা দু'জনেই সুবোধ বালকের মতো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করলেন রাষ্ট্রদূত হওয়ার জন্য।

তবে 'দুষ্ট' লোকেরা গুল হাসানের গল্পের শেষ দিকটা বিশ্বাস করতে চান না। যেমন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে গুল হাসানের ভূমিকা সম্বন্ধে গুল হাসানেরই দেয়া ব্যাখ্যাগুলো সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস করে ও তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়। বিশ্বাস তো করেই না বরং এটাই মনে করে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সি.জি.এস) হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানে যে ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসলীলা চলছিল তা গুল হাসান কেবল জানতেন তাই নয়—বরং এর পরিকল্পনাকারীদের প্রধানতমদের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন তিনিই। অথচ তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় পূর্ব পাকিস্তান (১৯৭১

সাল) অধ্যায়ে বারংবার বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে তখন কি হচ্ছিল তিনি কিছুই জানতেন না। সবই করতেন ও করাতেন জেনারেল হামিদ ও ইয়াহিয়ার লোকজন। অথচ তিনি স্বীকার করেছেন যে, ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান পরিদর্শন করেছেন। তিনি সকলকে বিশ্বাস করতে বলেন যে, বাঙালি হলেই বিনা দ্বিধায় হত্যা, বাঙালি নারী ধর্ষণ, ব্যারাকে ও ট্রেঞ্চে সৈনিকদের যৌন তৃষ্ণা মেটাতে বাঙালি নারী আটক, নির্বিচারে রাস্তার দু'পাশের বাঙালি বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া, এসব কিছুই তিনি জানতেন না। তিনি এও দাবি করেন যে, সেনাসদরের মতো সংরক্ষিত অবস্থানের অভ্যন্তরে ও অন্যান্য দপ্তরে পাঞ্জাবি অফিসার দ্বারা বাঙালি অফিসারের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলিবর্ষণ অর্থাৎ সরকারি অর্থে পালিত একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী দ্বারা পরিকল্পিতভাবে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধের ভাগী তিনি ছিলেন না। এর সাফাই গেয়ে তিনি বাংলাদেশের জেনারেল ওসমানীর একটি প্রশংসাপত্র ও প্রত্যয়নপত্র তাঁর স্মৃতিকথায় স্থান দিয়েছেন, অথচ প্রশংসাপত্রের নিচে ওসমানীর দস্তখতটি নেই। কর্নেল সিদ্দিক সালেক তার লেখা 'উইটনেস টু সারেন্ডার' বইটিতে লিখেছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসান '৭১ সালের মাঝামাঝি যখন পূর্ব পাকিস্তান পরিদর্শনে যান (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে তাকে কয়েকবার ওখানে যেতে হয়েছিল।), তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই যে প্রতি মাসেই শত শত পাকিস্তানি সৈনিক ও অফিসার নিহত হচ্ছেন তাঁদের মৃতদেহ নিয়মমাফিক তো পাকিস্তানে তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হস্তান্তর করা হয়— তাই না? গুল হাসান নাকি তাঁর স্বভাব সুলভ একটি উঁচু মানের কৌতুকের সাথে উত্তর দিয়েছিলেন, 'মৃত সৈনিক পাকিস্তানের কোনো প্রয়োজন মিটাবে না। পাকিস্তান চায় জীবন্ত সৈনিক।'

ইতিহাসের পরিহাস, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সৈনিক মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ না করে সম্পূর্ণ জীবিত ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে ভারতের বন্দিশালা হয়ে ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছিলেন।

গুল হাসানের 'মিথ্যা সিরিজের' দ্বিতীয় বৃহত্তম অধ্যায়টির প্রায় সবটা তাঁর ও রহিম খানের ১৯৭১ সালের মিলিত কর্মকাণ্ড বিষয়ক। ষড়যন্ত্রের কথা, খারিয়ানের আর্মার্ড ডিভিশন দ্বারা পিণ্ডি ঘেরাও, রহিম খানের জঙ্গি বিমান দ্বারা ইয়াহিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদকে 'বাযিং' করা, এগুলো কিছুই তাঁর স্মৃতিকথায় নেই। অথচ এই ঘটনাগুলো আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। কিন্তু আমাদের এই চোখে দেখা ঘটনাগুলোকে গুজব আখ্যায়িত করে তিনি এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এই সময় কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল মিঠ্‌ঠা খান হামিদ খানের 'ক্যু'কে সফল করার উদ্দেশ্যে গুজরানওয়ালা থেকে একটি

কমান্ডো কোম্পানি এনে রাওয়ালপিণ্ডির সেনাসদর দখলে নেয়ার প্রচেষ্টা চালান। এই প্রচেষ্টাকে তিনি ব্যাহত করেছেন এবং গর্বভরেই বলেছেন, কমান্ডো কোম্পানির আসা বন্ধ করে কিভাবে তিনি সেনাসদরে তথা পিণ্ডিতে, তথা পাকিস্তানে ওই ক্রান্তিলগ্নে রক্তপাত ও বিভক্তি রোধ করেছেন।

২০ ডিসেম্বরে জেনারেল হামিদের সভা থেকে তিনি যে পাঞ্জাব হাউসে ভুট্টোর কাছে ছুটে যান এ কথাটি সম্পূর্ণ গোপন করে বলেন যে, ২০ ডিসেম্বর ইয়াহিয়ার কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের পর ভুট্টো তাঁকে ডেকে পাঠান ও অনেক জ্যেষ্ঠ অফিসারকে পেছনে ফেলে তাঁকে সেনাবাহিনী প্রধান (সি-ইন-সি) করেন। এতে নাকি গুল হাসানের প্রবল আপত্তি ছিল কিন্তু ভুট্টো কিছুই শুনতে রাজি হন নি ইত্যাদি।

ক্ষমতা সংহতি : দ্বিতীয় পর্যায়

ষড়যন্ত্রে সাহায্যকারী দু'জন সেনাপতিকে অত্যন্ত কৌশলে ও সাহসিকতার সাথে ভুট্টো 'বস্তাবন্দি' করলেন। ক্ষমতা দখল তো হয়েছে আগেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষমতার সংহতি। সেই সংহতির প্রথম পর্বে ঘটে সেনাপতিদের অপসারণ। এঁদের অপসারণ করা হলো ভুট্টোর অতি বিশ্বাসী ও একান্ত অনুগত অমাত্যবর্গের সহায়তায়। এঁরা ছিল মুস্তফা খার, মোমতাজ ভুট্টো, জাতৈ, জে এ রহিম, মুহাজির নেতা মেয়রাজ মুহম্মদ খান প্রমুখ। এঁদের সাহায্যেই ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে পি পি পি দাঁড় করিয়েছেন এবং নির্বাচনে জিতেছেন। একজন সিন্ধির জন্য পাঞ্জাবের রাজনীতিতে প্রবেশ ও প্রাধান্য স্থাপন করা সহজ নয়, বরং অনেকটা অসম্ভব। এজন্য তিনি পাঞ্জাবের প্রভাবশালী সামন্ত নেতা মুস্তফা খারকে সহায়ক হিসেবে নিয়েছেন। সিন্ধুতে তিনি ব্যবহার করেছেন প্রভাবশালী জাতৈ ও তাঁর নিজের ভাই মোমতাজ ভুট্টোকে। সিন্ধু কিন্তু একমাত্র সিন্ধিদের অধ্যুষিত অঞ্চল নয়। এর জনসংখ্যার একটা বড় অংশ মুহাজির (অভিবাসনকারী), আমরা যাদের বিহারি বলি। এদের আনুগত্য লাভের ব্যাপারে তিনি বন্ধুত্ব করলেন বিহারি যুব নেতা মেয়রাজ মুহম্মদ খানের সাথে। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ভুট্টো যখন আইয়ুববিরোধী একটি রাজনৈতিক দল গঠন শুরু করলেন, তখন তাঁর জন্য প্রয়োজন ছিল একজন প্রবীণ ও সম্মানী লোক। জে. এ. রহিম ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ আই সি এস অফিসার এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দির আত্মীয় কিংবা ঘনিষ্ঠ অর্থাৎ উচ্চমহলে পরিচিত আমলাতন্ত্রের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁকে ভুট্টো 'চাচা' সম্বোধন করতেন।

এই সব অমাত্যবর্গের সাহায্যের ওপর তাঁর রাজনৈতিক দল ছিল নির্ভরশীল

এবং এঁদের সাহায্যে তিনি সেনাপতিদ্বয়কে অপসারিত করেছিলেন। ক্ষমতা এককভাবে দখলে রাখার অমোঘ নিয়ম অনুসারে ভুট্টোও তাঁকে সরাসরি সাহায্যকারী এইসব 'অমাত্য'বর্গ সবাইকে বিদায় করলেন অর্থাৎ বস্তাবন্দি করলেন। বলাবাহুল্য, এক এক করে বিদায় করার এই পদ্ধতি গুল হাসান ও রহিমের বিদায়ের মতো অপমানকর ছিল। তবে জে. এ. রহিমের সাথে ব্যবহারটি হলো অতীব জঘন্য। তাঁকে গুণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে বের করে দেয়া হলো।

প্রত্যেক খেলার এক সেট করে মৌলিক নিয়ম (গ্রাউন্ড রুল) থাকে। সেই নিয়মগুলো নৈতিকতা ও নিঃস্বার্থভাবে পালন করলে খেলার ফলাফল পরবর্তী প্রতিযোগিতা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অনুরূপভাবে ক্ষমতা দখলেরও মৌলিক কতক নিয়ম আছে। কিন্তু ভুট্টো, গুল হাসান, রহিম খান ও ভুট্টোর অমাত্যবর্গ কেউই ক্ষমতা দখলের বেলায় নৈতিকতা ও নিঃস্বার্থতার ধার ধারেন নি। একটি ডাকাতের দলেও পরস্পরের প্রতি আনুগত্য ও নিঃস্বার্থতা থাকে। ভুট্টোর এই 'ভেতরকার দলটিতে' নৈতিকতাবিহীন নৃশংসতা ছাড়া কিছু ছিল না। তাই তাঁর দখল করা ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, বরং তাঁকে প্রাণ দিয়ে তাঁর নৃশংসতার মূল্য দিতে হয়েছে।

যা হোক, পাকিস্তানের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস এ পুস্তকের বিষয়বস্তু নয়। আমরা তখন অপেক্ষা করছি কবে আমাদের আনুগত্য নির্ধারণ করে দেশে পাঠানো হবে। স্বাধীন দেশে আত্মীয়-স্বজনের সাথে আবার মিলিত হবো।

কিন্তু এখনও ভুট্টোর ক্ষমতা সংহতি শেষ হয় নি। অমাত্যদের বিদায় করা হয় নি এবং সামরিক বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব নেয়া সমাপ্ত হয় নি।

ক্ষমতা সংহতির শেষ পর্যায়

২৩ মার্চ। লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবস। আসল স্বাধীনতা দিবস ১৪ আগস্টে আবহাওয়া খারাপ থাকে। প্রচণ্ড গরম নয়তো প্রবল বৃষ্টি। অতএব, স্বাধীনতা দিবসের বড় সামরিক কুচকাওয়াজটি ২৩ মার্চই অনুষ্ঠিত হতো। সেই দিনটি প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস হিসেবে আড়ম্বরে পালিত হতো।

অন্যান্য বছরের মতো এবারেও কুচকাওয়াজের অনুশীলন মার্চের প্রথম দিকে শুরু হলো। দিনটি ছিল প্রধানত সৈনিকদের। বেসামরিক লোকদের মধ্যে যাঁরা নেহাত ভাগ্যবান তাঁরা দাওয়াত পেতেন কুচকাওয়াজ দেখার। বাকিরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে সামনের লোকদের মাথার ওপর দিয়ে যতোটুকু দেখতে পেতেন, ব্যাস্। অনেকটা আমাদের দেশের সামরিক শাসনামলের কুচকাওয়াজের মতো। কিন্তু এবারের আয়োজন একেবারে ভিন্ন। ভুট্টো তাঁর পি পি পি'র সদস্যসহ

সকলের জন্য খুলে দিলেন কুচকাওয়াজের দরজা। সিন্ধু থেকেও পি পি পি সদস্যদের নিয়ে আসা হলো। আর তাঁরা হাজারে হাজারে এসে কুচকাওয়াজ-স্থল চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো। উচ্চপদীয় জেনারেল সাহেবদের সামনে-পেছনেও লোক ভরে গেল। কুচকাওয়াজ মাঠটিও লোকে পরিপূর্ণ। এমনকি সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করার জায়গাগুলোতেও লোক দাঁড়িয়ে গেল। সামরিক বাহিনীর সুশৃঙ্খল ছিমছাম কুচকাওয়াজ মাঠ অনেকটা মেলার মাঠের মতো দেখতে হলো। এই অবস্থায় নিম্নপদস্থ সৈনিক থেকে উচ্চতম পর্যায়ের জেনারেলরা কেবল আশ্চর্যান্বিত হলেন না, মনে মনে নিদারুণভাবে ক্ষুব্ধ হলেন; কিন্তু করার কিছু ছিল না। ভুট্টো তাঁর কুচকাওয়াজের বক্তৃতায় বললেন, সামরিক বাহিনী জনগণের সম্পদ, জনগণের বন্ধু। তাই জনগণের অংশগ্রহণ করা এদিনে নেহাত জরুরি।

ভুট্টো নিজেই এই আদেশ দিয়েছিলেন। কেন দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে নানা রকমের বক্তব্য শোনা যেতে লাগলো। পাঞ্জাবের এক জেনারেল মন্তব্য করলেন যে, পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর পাখা কেটে মাটিতে নামানো ও জনগণের আধিপত্য বিস্তারই এর উদ্দেশ্য। কথাটি আমার কাছেও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। ভুট্টো তখন দেশের সরকারপ্রধান। তাঁর রাজনৈতিক দল পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে ক্ষমতাসীন। সামরিক বাহিনী সদ্য-পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দি ভারতে। এমতাবস্থায় সামরিক নেতৃত্ব প্রকাশ্যে ভুট্টোর বিরোধিতা করার সাহস পেল না। দ্বিতীয়ত, ভুট্টো দ্বারা নিযুক্ত টিক্কা খান তখন সেনাপ্রধান। টিক্কা খান ও জেনারেল নিয়াজির মতো অফিসাররা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নি এবং তাঁদের সতীর্থরা কখনও কল্পনা করে নি যে তাঁরা স্বীয় মেধা বলে সেনাজীবনে কর্নেলের ওপরে কোনো পদ পাবেন। কর্নেল হয়ে অবসর নিতে পারলে তাঁরা খুশি থাকতেন; কিন্তু এলো আইয়ুব খানের সামরিক একনায়কত্ব। কেবল সামরিক নয়, যেকোনো একনায়কত্বতে সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের পদোন্নতি হয় মেধার ভিত্তিতে নয়, আনুগত্যের নিরিখে এবং কাকে বিশ্বাস করা যায় তার ভিত্তিতে। অর্থাৎ যে অফিসারটি পোষা প্রাণীর মতো প্রভুর আদেশ বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে ও বিনা চিন্তায় পালন করবে তাদেরকে পদোন্নতি দিয়ে একনায়ক নিজের চারদিকে মোতায়েন রাখে এবং তাদের সাহায্যে মেধাবী ও চিন্তাশীল নাগরিকদেরকে অত্যাচারের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখে। মনবিহীন টিক্কা খান তাঁদেরই একজন।

এভাবেই ভুট্টোর ক্ষমতা সংহতির 'আপাতত' আখেরি পর্যায় সমাপ্ত হলো।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পাকিস্তানের একনায়কতন্ত্রে অর্থাৎ আইয়ুব, ইয়াহিয়া ও জিয়াউল হকের সামনে কি কেবল এসব মেধাবিহীন, মনবিহীন ও চরিত্রবিহীন অফিসাররা জেনারেল হয়েছেন? না। একটি বড়সংখ্যক

অফিসার-শ্রেণী কেবল মেধা ভিত্তিতেই পদোন্নতি পেয়েছেন। জনগণের সাথে থাকা ইয়াকুব এসব জেনারেলের একজন। তাঁরা নিজ কর্তব্যে যেমন দক্ষ, তেমনি ঊর্ধ্বতন এমনকি একনায়কের আদেশও অন্ধের মতো পালন করবেন না। দেখবেন কোন আদেশটি দেশের আইনানুগ ও সংবিধান অনুযায়ী নয়। তা তাঁরা মান্য করবেন না। তাঁরা দক্ষ চরিত্রবান ও মননশীল আর এজন্যই অতি উত্তম সিপাহি ও যোদ্ধা। তাঁদের দ্বারা যুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং তাঁদের নেতৃত্বেই যুদ্ধে বিজয় হয়, মাতৃভূমির রক্ষা হয়, মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচে।

একনায়কের জন্য 'জি হুজুর' জাতীয় নয়, এমন ধরনের জেনারেলের প্রয়োজন, কেবল একটি কারণেই। তা হলো, ভারতের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধ। ভারতের সাথে যুদ্ধ কল্পনা নয়, বাস্তব। ইতিহাসের অমোঘ বিধান যে, দেশ যুদ্ধে পরাজিত হলে শাসকেরও পতন হবে। সেজন্যই স্বৈরশাসক এইরকম দক্ষ জেনারেলকেও সঙ্গে রাখেন, রাখতে বাধ্য হন। তবে ভেতরের গণ্ডিতে এবং বেআইনি কাজের জন্য থাকে ভেতর-দলের জেনারেল, যাদেরকে স্বৈরশাসক পুরোপুরি 'বিশ্বাস' করতে পারেন।

ভুট্টো ছিলেন গণতন্ত্রের লেবাসে পুরোপুরি স্বৈরশাসক। 'হাঁ-প্রভু' জাতীয় ব্যক্তি ছাড়া কাউকে তিনি উচ্চপদে রাখেন নি। এর ফলশ্রুতিতে টিক্কা খান সেনাপ্রধান। বাকি ঊর্ধ্বতন অফিসাররা এতো ভীত যে 'দেয়ালেরও কান আছে' কথাতে পুরোপুরি আস্থাবান এবং ফলত সদাই ভয়ে কম্পমান। ভুট্টো ছিলেন অতি মেধাবী, চরম ধূর্ত, বড় মাপের বাগ্মী, সম্পূর্ণভাবে বিবেকহীন, নিজের স্বার্থ ছাড়া পৃথিবী অর্থহীন—বৈশিষ্ট্যের লোক। সে যাই হোক, পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাস আমাদের বিষয়বস্তু নয়। আমাদের আলোচ্য বাঙালিদের আনুগত্য প্রকাশ ও দেশে যাওয়ার প্রত্যাশা; কিন্তু বাস্তবে ঘটলো বিপরীত। আনুগত্য প্রকাশের পর আমাদেরকে প্রথমে গৃহবন্দি এবং পরে বন্দিশিবিরে রাখা হলো।

মার্চের শেষ ও এপ্রিলের প্রথমে আনুগত্য প্রকাশ শুরু হলো। প্রথমে আমাদেরকে স্টেশন সদর দফতরে ডাকা হলো এবং আনুগত্যের ফরমটি পূরণ করতে বলা হলো। প্রায় সকল বাঙালিই বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। দু'চারজন যাঁরা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন তাঁদের স্ত্রীরা ছিলেন পাকিস্তানি। মাত্র একজন বাঙালি অন্য কারণে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। তিনি কর্নেল (পরে পাকিস্তানে ব্রিগেডিয়ার) আলম। তিনি তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রসিকিউটর ছিলেন বলে বাংলাদেশে ফিরতে ভয় পেলেন। পরে জিয়ার সামরিক শাসনের আমলে তিনি দেশে ফিরে আসেন। কয়েক বছর আগে তাঁর প্রয়াণ হয়েছে।

আনুগত্য প্রকাশের পরই আমাদের সাথে বন্দি হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হলো। আমাদের ভাতা ঠিক হলো মেজর এবং তদুপরি সমস্ত পদবির

অফিসারদের জন্য পরিবারপ্রতি মাসিক ৪০০ টাকা। এরপর ৩৫০, ৩০০, ২৫০, সর্বনিম্নে মাসিক ১৫০ টাকা পর্যন্ত। বলাবাহুল্য যে, এই ভাতা অপ্রতুল বললে একেবারে ভুল হবে। এই ভাতা ছিল অমানবিক। সিনিয়র ও বয়স্ক অফিসাররা আগেই সম্ভাব্য এ রকম পরিস্থিতির জন্য কিছুটা প্রস্তুত ছিলেন আর তাঁদের স্ত্রীদের অলঙ্কারাদিও ছিল। কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ অফিসার ও যাঁদের পরিবার বড় তাঁদের অবস্থা হলো একান্তই করুণ। তাঁরা দু'বেলা পেট পুরে খেতে পারতেন না সবসময়।

জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত আমরা নিজেদের বাসায় অবস্থান করলাম। সে সময় প্রায়ই সিনিয়রদের ও প্রতিবেশীর কাছে অনুরোধ আসতো টাকা ধার করার। আগেই বলা হয়েছে যে, বড় পরিবারের নিম্নপদস্থ সৈনিক ও কর্মকর্তাদের পক্ষে মাসিক ওই অমানবিক মাসোহারা দিয়ে চলা অসম্ভব ছিল।

এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য একটি চাঁদার বই খোলা হলো। সাহায্য সামান্যই ছিল এবং সাহায্যদাতা আমাদের অফিসাররা ছিলেন। যাঁদের হাতে কিছু নগদ ছিল, কিংবা যাঁরা টেলিভিশন, রেডিও, রেডিওগ্রাম, দামি আসবাবপত্র পানির দামে বিক্রি করে কিছু টাকা যোগাড় করেছিলেন, তাঁরাই চাঁদা দিতেন। এই সাহায্য খুব বড় আকৃতির না হলেও আমরা আজ সন্তুষ্টির সঙ্গে বলতে পারি যে, জানা মতে আমাদের কারোরই সন্তানেরা অভুক্ত থাকে নি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, বিপদের সময় বিপদকে ভাগ করে নেয়ার প্রবৃত্তি ও হৃদয়শীলতা বেশি থাকে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে। তবে উদারতাবিহীন লোকও ছিল। অন্যের ক্ষতি করে আনন্দ লাভ করার প্রবণতাও ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা মুষ্টিমেয়। মানব চরিত্র বোধহয় এরকমই। যা হোক এ ব্যাপারে পরে আরও।

আমাদের মধ্যে কিছু স্বার্থান্ধ ও ভীতু গোছের লোক ছিল। তাঁরা দু'চারজন এই সময় ফাঁক পেয়ে কাবুল হয়ে দেশে ফিরে এসেছিল। অথচ যুদ্ধের সময় গিয়ে যুদ্ধে শামিল হওয়ার কথা তাঁরা চিন্তা করে নি। তাঁরা যাওয়ার পর আমাদের বন্দিদশার ওপর কঠোরতর নিয়ম চালু করা হলো। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন তো বাংলাদেশ সরকারের জনবলের এমন তীব্র প্রয়োজন নেই। তবুও এরা আগে গেলে হয়তো সিনিয়রিটি পাবে, আরামের জীবনযাপন করবে ইত্যাদি ভেবে পলায়ন করে। এক মুহূর্তের জন্যও ভাবে নি তাঁদের এই পলায়ন ত্রিশ হাজার সৈনিকের ওপর কি দুর্ভোগ বয়ে আনবে। যাহোক অবশেষে আমাদেরকে কয়েদখানায় নেয়া শুরু হলো।

সপ্তম অধ্যায়

বন্দিজীবন— কোহাট ও অন্যত্র

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে আমাদের বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হলো। আমাকে নেয়া হলো কোহাটে। আমার প্রতিবেশী লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন নিজের বাসাতেই কিছুদিনের জন্য রয়ে গেলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মুহূর্তটি নেহাতই করুণ ছিল। ব্রিগেডিয়ার মজিদুল হকও আমাদের সঙ্গে বিদায় নিতে গেলেন। জেনারেল ওয়াসি বললেন, সেখানকার সব খবরাখবর যেন আমরা জানাই।

কোহাট সীমান্ত প্রদেশের একটি জেলা ও সেনাছাউনি। মরুভূমির মতো ঊষর এবং গরম। এখান থেকে পেশাওয়ার উত্তর-পশ্চিমে প্রায় চার ঘণ্টার পথ। শহরটি এমন কিছু নয়। শহরে পাকা রাস্তা নেই বললেই হয়। তবে সিভিল অফিসারদের পাড়া এবং ছাউনির রাস্তাগুলো পাকা ও ভালো। ব্রিটিশ আমলে ঘরবাড়িগুলো হয়তো ভালোই ছিল। বর্তমানে ছাউনির একটা বড় অংশ অব্যবহৃত বলে নিম্নমানের। ছাউনির ওই অংশটিকে কিছু সংস্কার করে বাঙালি বন্দিদের ঠাসাঠাসি করে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

এই কোহাট সেনাছাউনির একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আমার ও ব্রিগেডিয়ার মজিদুল হকের পরিবারবর্গকে রাখা হলো। মাটির ছাদ ও দেয়ালের বাসাটিতে তিনটি শোবার ঘর, বৈঠকখানা সংযুক্ত খাওয়ার ঘর। মজিদুল হকের বড় তিন ছেলেমেয়ে, আমার চারটি, ছোটটি ৩/৪ বছরের। সঙ্গে আমার মা। মায়ের চোখের অসুখ বেশ খারাপ গোছের। সবাই মিলে বাড়িটি ভাগ করে নিলাম। জিনিসপত্রও নেহাত কম নয়। একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া কিছুই বের করা হলো না। কিন্তু মুশকিল হলো যে, রান্নাঘর একটি এবং আরও বড় বিপদ, পায়খানা দুটি স্যানিটারি ব্যবস্থা সংবলিত নয়। একটি আসবাবপত্রহীন ছোট কামরাতে কাঠের আলগা কমোড। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর মেথর এসে ওটাকে সাফ করে ফেরত রাখার কথা। দুই পায়খানা সাফ-সুতরো রাখার জন্য একজন মেথর

সার্বক্ষণিকভাবে থাকার কথা; কিন্তু আমাদের জন্য মেথর বরাদ্দ ছিল একটা বিশেষ সময়ের জন্য। তার ওপর সময়মতো প্রায়ই সে আসতো না। ফলে সর্বমোট বারোজন বাসিন্দার জন্য প্রাণান্তকর অবস্থা। ছেলেপিলেরা কেঁদেই ফেলতো।

বাড়িটির চারদিকে কিছু নেই, কয়েক একর জমির মধ্যে একটি বাড়ি। ঘাস-পাতার চিহ্নও নেই। কেবল বালু ও পাথর।

বন্দিশালায় এসে গেলাম নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা দেখতে। তাদের রাখা হয়েছে অবর্ণনীয় অবস্থায়। মাটির দেয়াল, মাটির ছাদ, গত শতাব্দীর তৈরি লম্বা ব্যারাক, একটি হলঘরের মতো। মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি চলার রাস্তা রেখে দু'পাশে দশ পনেরো ফিটের একটি একটি করে জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, প্রতিটি পরিবারের জন্য। কোনো আসবাব নেই। মাটিতে শোয়ার ব্যবস্থা। মশারি খাটানোর মতো রশি টানিয়ে নিজেরাই কাপড় ঝুলিয়ে প্রতিবেশীর কাছ থেকে পর্দার ব্যবস্থা। রাতে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে প্রতিবেশীর বিছানায় চলে যাওয়ার ভয়। পায়খানা দূরে, সবার জন্য পাশাপাশি কয়েকটি। নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। বস্তুত ব্যারাকগুলো ছিল সৈন্যদের জন্য। এ পায়খানাগুলোও স্যানিটারি নয়, মেথর এসে পরিষ্কার করতো। বেশি ব্যবহার হলেই উপচে পড়বে ও ব্যবহারের অযোগ্য হবে। তাই হয়েছে। রান্নার কাজের জন্য একমাত্র জায়গা বারান্দা। যে ব্যারাকে হয়তো চল্লিশজন সৈনিকের জায়গা হওয়ার কথা সেখানে শ'দুয়েকের কম লোক নয়। বয়স্ক ছেলেমেয়ে, বাচ্চা শিশু, গর্ভবতী মহিলা, অসুস্থ মানুষ সব ঠেসে গাদাগাদি করে রাখা। সমস্ত দৃশ্যটাই বীভৎস ও অমানবিক। অথচ এরা সবাই গর্বিত সৈনিক ও তাদের পরিবার। জীবন বিপন্ন ও উৎসর্গ করে মাতৃভূমি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে যে সরকারের চাকরিতে ভর্তি হয়েছিল সেই সরকারের হাতে তাদের এই চরম অবমাননা ও বিপর্যয়। বিশ্বাস করতেও পারি নি এই পাকিস্তান নামক সরকারের কর্তৃপক্ষ এতোটা নিচ। চোখে পানি এসে গেল। এরা কেউ মুখে নালিশ করলো না। করুণ কণ্ঠে শুধু বললো, 'স্যার নিজের চোখেই দেখুন।' মহিলারাও অসহায় করুণ চোখে কেবল তাকিয়ে থাকলেন। কিছু বলার দরকারও ছিল না।

বাসায় ফিরে এলাম। মজিদুল হকের কাছে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে একজন পাকিস্তানি এসেছিল তাঁকে পৌঁছে দিতে। তাঁর হাতে দেব বলে দু'জনে মিলে ক্যাম্পের অবর্ণনীয় ও অমানবিক অবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে একখানা চিঠি লিখলাম জেনারেল ওয়াসিকে। চিঠি নিয়ে লোকটি চলে গেল। পরে শুনেছি জেনারেল ওয়াসি চিঠিখানা বিবিসির স্থানীয় ভাষ্যকার পিটার গিলকে দিয়েছিলেন এবং সবিস্তারে তা প্রচার করা হয়েছিল বিবিসি থেকে। সে ভাষ্যে নাকি এও বলা হয়েছিল যে, ক্যাম্প থেকে প্রেরিত কোনো সিনিয়র বাংলাদেশি অফিসারের চিঠি থেকে এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে।

আর যায় কোথা! জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে 'ধর ধর মার মার' পরিস্থিতি। সপ্তাহ দুয়েক পরেই শাস্তির হুকুম এলো স্থানীয় কমান্ডারের দফতরে। স্থানীয় কমান্ডার একজন পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার। আমার ডাক পড়লো দফতরে। ব্রিগেডিয়ার কিছুক্ষণ ধানাইপানাই করে বললেন, 'এ চিঠিখানা তুমিই লিখেছো।' কোনো উত্তর দিলাম না। 'অর্ডার' পড়ে শোনালেন, আমার বদলি হয়েছে ওয়ানা (Wana) ক্যাম্পে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত যেখানে মিশে, ওয়ানা ক্যাম্পটি সেইখানটায়। ফ্রন্টিয়ার কনস্টেবুলারির একটি ক্যাম্প। আশপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনো শহর নেই, চারদিকে বৃক্ষহীন পর্বতমালা। পর্বতের পাশ কেটে পাথুরে পথ—কোনো রকমে জিপ চলতে পারে। ৮/১০ ঘণ্টা লাগে কোনো শহর থেকে ওয়ানা নামক গ্রামটিতে পৌঁছতে। মায়ের চোখ ও ছোট শিশুর জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রশ্নই ওঠে না। জীবনের নিরাপত্তাও প্রশ্নের সম্মুখীন। মনের ভয় যথাসম্ভব চেপে রেখে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি বলছো আমার বদলি হয়েছে। তা আমার অবস্থানটা কি? আমি কি তোমাদের বন্দি?' এ কথাটি আমি পিণ্ডিতেই এক পাকিস্তানি বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম যে, আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থাৎ অফিসিয়ালি আমাদের বন্দি ঘোষণা করা হয় নি। আমাদেরকে চাকরিচ্যুতও করা হয় নি। আন্তর্জাতিকভাবে নাকি অসুবিধা ছিল। কাজেই বহির্বিশ্বের দেশগুলোকে বলা হয়েছিল স্থান সংকুলানের কারণে আমাদের একসাথে করে অন্য নির্দিষ্ট সেনাছাউনিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে মাত্র।

আমার প্রশ্নের উত্তরে ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'না, তুমি ঠিক বন্দি নও। তবে তোমাকে বদলি করার অধিকার পাকিস্তান সরকারের আছে।' তখন আমার অবস্থা অনেকটা বেপরোয়া। একান্ত মরিয়া হয়ে বললাম, 'তবে শোনো। ওয়ানা নামক জায়গাটিতে ব্রিগেডিয়ার পদের কোনো দফতর বা কমান্ড নেই। সেখানে আমার বদলি হতে পারে না। সেখানে আমি যাবো না। যদি জোর করে পাঠাতে চাও তবে আমাকে বন্দি করে হাতকড়া পরিয়ে পাঠাতে হবে। এছাড়া আমার পরিবার আর্মি অ্যাক্টের আওতায় পড়ে না। তাদের পাঠাতে হলেও তাদের হাতকড়া পরাতে হবে।' দম বন্ধ করেই কথাগুলো বলে গেলাম; কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ব্রিগেডিয়ার অনেকটা হতভম্ব। একজন বন্দির মুখে এ কি কথা! তাঁর সুর নরম হয়ে গেল। নরম সুরে বললেন, 'হুকুমটি জি এইচ কিউ'র।' তাঁকে বললাম, আমার কথাগুলো জি এইচ কিউকে জানাতে এবং নতুন আদেশ আনতে।

বাসায় ফিরে গেলাম। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে ছিল। তাদেরকে বললাম ঘটনা। স্বভাবতই আমার পরিবার পরম আতঙ্কে ছিল, ভবিষ্যৎ ভেবে। আর মজিদুল হকের পরিবার অত্যন্ত দুঃখিত। মজিদুল হক হয়তো এই ভেবে বেশি

দুঃখিত ছিলেন যে চিঠিখানা দু'জনে মিলে লিখেছিলাম। হাতের লেখা ভালো বলে তিনিই লিখেছিলেন পত্রটি। অথচ শাস্তি হচ্ছে আমার একার। আমি বোঝালাম, ওতে কিছু এসে যায় না। শাস্তি হবে কেন সেটাই প্রশ্ন।

দিন দুয়েক পরে পুনরায় আমার ডাক পড়লো স্টেশন হেড কোয়ার্টার্সে। আবার কিছুক্ষণ একথা-ওকথার পর ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'খলিল, দেখ তোমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তবে যেখানে সামরিক হাসপাতাল আছে এমন জায়গায় তোমাকে যেতে হবে। বল কোথায় যাবে, পেশাওয়ার নাকি নওশেরায়।' তখন আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। নিদারুণ আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। বললাম, 'দুটির যে কোনোটিতে যাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত।' ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'তবে নওশেরায় যাবে তুমি।'

ফিরে এসে জিনিসপত্র বেঁধে ফেললাম; কিন্তু মন থেকে আশঙ্কা গেল না। হতে পারে এ একটি চালাকি মাত্র। যাবো তো ওদের কয়েদি হয়ে। রাস্তায় মোড় ফিরে হয়তো ওয়ানাতেই নিয়ে যাবে। মজিদুল হকের মনেও একই ভয়। পাকিস্তানিদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। ছাউনি থেকে বাঁ দিকে বেরিয়ে আধ মাইলখানেক দূরে বড় রাস্তা– ডান দিকে পেশাওয়ার/নওশেরা আর বাঁ দিকে ওয়ানা যাওয়ার পথ। ঠিক হলো মজিদুল হক দেখবেন আমাদের গাড়ি কোন্ দিকে ঘোরে। যদি বাঁ দিকে ঘোরে তবে যেভাবে হোক খবরটি পিণ্ডিতে জেনারেল ওয়াসিকে জানাতে হবে। দম বন্ধ করে বসে থাকলাম। গাড়ি পেশাওয়ারের দিকে ঘুরতে দেখে প্রথম স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

আমাদের জিনিসপত্র একটি সামরিক ট্রাকে। আমি ও পরিবারের সদস্যরা আমার ফিয়াট ১১০০ গাড়িতে। পাহারাদারদের একজন আমাদের গাড়িতে বসার কথা; কিন্তু গাড়িটি আমার পরিবারের সদস্যদের দিয়ে ভরা ছিল। দেখে বোধহয় ওদের মনে কিছুটা সঙ্কোচের উদয় হলো। হাবিলদার এসে বললো, 'ঠিক আছে, আপনারা আমাদের পেছনে আসুন। ট্রাক থেকেই আমরা আপনাদের ওপর নজর রাখবো।' মনটা খুশি হলো। গাড়ি আমিই চালাচ্ছিলাম।

এখানে গাড়িটি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ক্যাম্পে আসার আগে যখন গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, আমাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন সবাই উদ্‌গ্রীব হলো যা আছে সব বিক্রি করে দাও এবং যা দাম পাওয়া যায় তাতেই অর্থাৎ প্রায় বিনামূল্যে। আমরা দু'একজন সিনিয়র অফিসার ঠিক করলাম, যা হওয়ার হবে। আমরা কিছুই বেচবো না। টিভি, রেডিও, আসবাবপত্র, অলঙ্কার কিছুই না। ভাবলাম আমরা সিনিয়ররা যদি গাড়ি বিক্রি করি তবে জুনিয়ররা তাদের সোনাদানা এমনকি স্ত্রীর শাড়িও বিক্রি করে দেবে। বিক্রির হিড়িক পড়ে যাবে। আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানিরা তাই চাচ্ছিল, পানির দামে এগুলো কিনতে। অথচ এগুলো বাংলাদেশে নিতে পারলে যৎকিঞ্চিৎ হোক সাহায্য হবে। অতএব,

আমি গাড়ি বিক্রি করলাম না। দেখাদেখি কয়েকজন যাঁরা গাড়ি বিক্রির বন্দোবস্ত করে বায়নার টাকাও নিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের গাড়ি ফেরত নিলেন। পরে অবশ্য আমাকে এজন্য অনেক কটূক্তি শুনতে হয়েছিল, যখন দিন দিন গাড়ি তো দূরের কথা আমাদের নিজেদেরও দেশে ফেরার আশা অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল।

বন্দিজীবন—নওশেরা

পেশাওয়ার থেকে ২৮ মাইল দূরে রাওয়ালপিণ্ডি-লাহোর মহাসড়কের ওপর নওশেরা একটি সেনাছাউনি। নওশেরাতে আরও জনবিশেক বাঙালি অফিসার ও তাঁদের পরিবারবর্গ ছিল। ব্রিটিশ আমলে সার্জেন্টদের জন্য তৈরি, পরে পাকিস্তান আমলে প্রশিক্ষণরত অবিবাহিত অফিসার দ্বারা ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোয়ার্টার্স— একটার সঙ্গে আর একটা লাগোয়া, লম্বা ব্যারাকের মতো। যতো ছোটই হোক, একটা বড় আশীর্বাদ, প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি করে বাথরুম, তাও আবার স্যানিটারি কমোডসম্পন্ন। সর্বমোট তিনটি ছোট কামরা। কোহাটের তুলনায় ভালোই। তাছাড়া ক্যাম্পের দেখাশোনার ভার পিএমএ-তে আমার এক সহপাঠী কর্নেলের ওপর। তিনি ভালো লোক। মনে অনেকটা স্বস্তি ফিরে এলো।

কিন্তু সমস্যাও ছিল। সমস্যা প্রধানত নিজেদের শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে। মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—বেশির ভাগ লোকই স্বভাবসুলভভাবে শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আবার কেউ কেউ রয়েছে যাঁরা শৃঙ্খলা পালন করে কেবল শাসনের ভয়ে। শাসনের ভয় না থাকলেই তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। ক্যাম্পে সেই শৃঙ্খলাবোধটাই ছিল প্রধান সমস্যা। প্রথমে পরস্পরের সাথে ঝগড়াঝাঁটি, পরে মারামারি শুরু হয়। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—এতে মহিলারাও যোগ দেন। অথচ ভাবছিলাম যদি এঁরা তাঁদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিতে, নতুন বাংলাদেশে যেতে পারেন এবং তাঁদেরকে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয় তবে নতুন সামরিক বাহিনী এঁদের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ হবে ও নতুন সামরিক বাহিনী এদের বিভিন্ন জ্যেষ্ঠতা দ্বারা সুসমন্বিত হবে; কিন্তু এঁদের কিছুসংখ্যক শৃঙ্খলাহীন সদস্যদেরকে দেখে ভয় হতে লাগলো এঁদের দ্বারা আমাদের সামরিক বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আরও আশ্চর্যের কথা, এদের দেখাদেখি অন্য অফিসারদের মনেও সামরিক শৃঙ্খলার প্রতি অনীহা জেগে উঠছিল।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। এখানে আসার কয়েকদিন পর দেখলাম আর্মার্ড কোরের একজন জুনিয়র অফিসার চুল বড় করছে।

ইতোমধ্যেই লম্বা বাবরি হয়ে গেছে এবং তাঁকে রাস্তার গুণ্ডাশ্রেণীর যুবকের মতো দেখাচ্ছে। সিনিয়রিটির দিক দিয়ে আমার পরে ছিলেন কর্নেল মান্নান সিদ্দিকী। মান্নানকে বললাম, 'ওকে বলো চুল কাটতে।' মান্নান আগে থেকেই ওই ক্যাম্পে ছিলেন। বললেন, 'বলে লাভ হবে না।' বস্তুত তাকে বলাও হয়েছিল। উত্তরে তিনি বললেন যে, 'এখন আর তিনি কোনো বাঙালি সিনিয়রের নিয়ন্ত্রণে নন। স্বাধীন। অতএব যা খুশি তাই করবেন।' মান্নান জানালেন যে, অত্যন্ত রূঢ়ভাবেই নাকি অফিসারটি কথাগুলো বলেছেন। যে সিনিয়র তাঁকে বলেছিলেন চুল কাটতে তিনি আর সাহস পান নি কিছু বলতে।

অত্যন্ত তিক্ত কণ্ঠে বললেন মান্নান। আমারও মুখটা কালো হয়ে গেল। আমি বললাম, 'এভাবে হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না। একটা কিছু করতেই হবে।' মান্নান বললেন, 'কঠিন কাজ। অন্য অফিসাররাও হতাশাগ্রস্ত। ভবিষ্যতের কথা কেউ ভাবতে চায় না। ভাবখানা—যা হওয়ার হবে, যেভাবে চলছে চলুক। এ অবস্থায় কি করতে পারবেন?'

শুনে মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। ঘরে ফিরে গেলাম তখনকার মতো। কথাটা ভেবে দেখতে হবে। বাঙালি এখন স্বাধীন। লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা। অথচ আমরা এই স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করতে পারি নি। আমি নিজে তিন তিনবার চেষ্টা করেছি পালিয়ে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করতে। একবার তো গোছগাছ করে বসেই ছিলাম যাওয়ার অপেক্ষায়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সফল হই নি। এরকম প্রচেষ্টা আমার সঙ্গী-সাথিরা অনেকেই করেছেন। এই গ্লানি আমাদের মনে ছিল। এছাড়া আমরা বাঙালিরা বিশ্বাস করতাম যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার মতো প্রশিক্ষণ, দায়িত্বজ্ঞান ও পরিপক্বতা আমাদের আছে। বরং যে পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর ২৪ বছরের দুঃশাসন চালিয়েছে গায়ের জোরে, তাদের চাইতে আমাদের পরিপক্বতা ও মানসিক গুণ বেশি বৈ কম নয়। এর মানে এই যে, একটি বাঙালি সমাজ সে যেখানেই থাকুক আর তার পরিধি যতো বড় কিংবা যতো ক্ষুদ্র হোক না কেন, তারা তাদের নিজস্ব সামাজিক ও মানসিক গুণ দ্বারা নিজেদেরকে একটি সুসমন্বিত ও সুসংগঠিত সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ। আর এই ক্যাম্পে তো আমরা ক্ষুদ্র একটি বাঙালি সমাজ। তদুপরি আমরা এখানে সবাই শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত উঁচু সমাজের ব্যক্তি। এখানে একটি সুসংগঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠা খুব তো সহজ হওয়া উচিত। অন্যপক্ষে আমরাই যদি পাকিস্তানি ডাণ্ডা ব্যতীত নিজেদেরকে সুশৃঙ্খল রাখতে না পারি তবে আমাদের এই বাঙালি আত্মবোধ বাঙালি আত্মপ্রত্যয় মূল্যহীন হয়ে পড়বে। সমগ্র বাঙালির এই স্বাধীনতার দাবি ও স্বাধীনতা অর্জন মূল্যহীন হয়ে পড়বে। ভাবতে লাগলাম। সত্যিই কি আমরা স্বাধীনতার অনুপযুক্ত? মন

কিছুতেই সায় দিলো না। মনে হতে লাগলো প্রেরণা পেলে অনেকেই এগিয়ে আসবেন এটা প্রমাণ করতে যে, আমরা নিজেরা-নিজেদেরকে সুশৃঙ্খল সমাজে পরিণত ও পরিবর্ধিত করতে পারি।

বিকেলে সিনিয়র কয়েকজন অফিসারকে ডাকলাম এবং আমার উপরোক্ত চিন্তাগুলো বিশ্লেষণ করলাম। শুনে মেজর মুহিত (প্রয়াত) বলে উঠলেন, 'স্যার, এ হতে পারে না যে, বাঙালি স্বাধীন সমাজে বাস করার যোগ্য নয়। আপনি বলুন কি করতে হবে।' উপস্থিত অফিসারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই কি ভাবছো যে ওই একটি উচ্ছৃঙ্খল যুবকই আমাদের বাঙালি চেতনার প্রতিভূ। তোমাদের কারও যেতে হবে না— বলো আমি একাই ধরে নিয়ে আসছি ওই কলঙ্কসম বাঙালি যুবককে।' বলেই তিনি যেতে উদ্যত হলেন।

অসীম বল এলো মনে। বললাম, 'তোমার সঙ্গে আরও দু'জন সিনিয়র অফিসার যাবেন।' মিনিট কয়েকের মধ্যে যুবককে ধরে নিয়ে এলেন তারা। যুবকের ঔদ্ধত্য তখন আর নেই। উচ্ছৃঙ্খল মানব কখনো সাহসী হয় না। শান্ত সুরে বললাম, 'কি, তুমি নিজে থেকে চুল কাটাবে, নাকি আমরা কেটে দেবো তোমার চুল?'

আমাদের অনভিজ্ঞ হাতে তার বাবরি কাটার পর সেই সুরত দেখে তার নব বিবাহিতা স্ত্রীর মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে হয়তো সেটা ভেবে এই 'সাহসী' যুবক অনুনয় করে বললো, 'স্যার, আমাকে এক ঘণ্টার সময় দিন দয়া করে।' পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে সামরিক প্যাটার্নের ক্রু কাট গোছের চুল কেটে কর্নেল মান্নানের কাছে রিপোর্ট করলো।

আমাদের মনের বল ফিরে এলো। হতাশাগ্রস্ত অফিসাররাও মনে হলো একটা নতুন আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেলেন। ভবিষ্যতে যা হবার হবে, আপাতত পুরনো অভ্যস্ত জীবন প্রণালিতে ফিরতে পারবেন আশা করে সবাই যেন স্বস্তি পেলেন। ক্ষুদ্র ঘটনা কিন্তু ফলাফল বিশাল।

আমার মনে হলো যে, এভাবে শৃঙ্খলাবোধ সাময়িক ফিরে এলেও স্থায়ী হবে না। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড শুরু করা দরকার। সবাই মিলে ঠিক করলাম— সকালে সমবেত ব্যায়াম চর্চা ও বিকেলে আলোচনা সভা নিয়মিত হওয়া দরকার। ঠিক হলো আলোচনা সভায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আলোচ্য বিষয় হবে। এই আলোচনা সভাগুলো অসীম মূল্যবান ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল শেষ অবধি।

একদিন ঘটলো একটি হাসির ব্যাপার। সেদিন আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের ভূগোল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। উপস্থিত অফিসারদের মধ্যে ২৮ বছর চাকরিরত একজন প্রবীণ মেজর সাহেব ছিলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে তিনি কৌতুকে ও হাসিতে ফেটে পড়লেন।

'বাংলাদেশের ভূগোল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা! এ আবার কে না জানে?' এই নিয়ে সময় নষ্ট করতে তিনি রাজি নন।

উত্তরে বললাম, 'আপনি হয়তো অত্যন্ত বিজ্ঞ এ ব্যাপারে। কিন্তু হতে পারে কোনো যুবক অফিসারের এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নাও থাকতে পারে। চলুন বসা যাক একসাথে। আমরা আপনার জ্ঞান থেকে উপকৃত হবো—এটাই উদ্দেশ্য।' তিনি যথাযথ গাম্ভীর্য বজায় রেখে বসলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে বক্তা বললেন, 'বরিশালে একটি সড়ক নির্মিত হয়েছে।' মেজর সাহেব বরিশালের লোক। ব্যঙ্গ করে উচ্চ সুরে বললেন, 'কি বললেন? বরিশালে সড়ক? এই বুঝি আপনাদের জ্ঞান? বরিশাল আপনি চেনেন? গিয়েছেন কোনো দিন? ওই রকম বিশাল বিশাল নদীর দেশে সড়ক? শুনুন, বরিশালে কোনো রেলপথ নেই, কোনো সড়কও নেই। আর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। বুঝলেন, ভালো করে না জেনে কথা বলবেন না।'

সভায় সবাই থ । অনেকেরই জানা ১৯৭১ সালের আগেই বরিশালে সড়কপথে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যেত, যদিও কয়েকটি ফেরি ছিল নদী পারাপারের জন্য।

বলাবাহুল্য, পদোন্নতির দিকে না হলেও চাকরিকালের দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ এই প্রবীণ মেজর সাহেবকে সেদিন শেষ পর্যন্ত নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল অনেক তরুণের হাতে। আমি বললাম, 'স্যার, বাংলাদেশের ভূগোল ও ইতিহাসের কথা শুনলে মনে হয় এটা স্কুলের নিচু শ্রেণীর ছাত্রের ব্যাপার; কিন্তু আসল কথা– এসব আমাদেরও জানার ব্যাপার। এসবের আমরাও অনেক কিছু জানি না। আপনি আসুন, তরুণদেরকে উৎসাহিত করুন। আর নিজেও শিখুন।' শেষের কথাটা নিচু সুরেই বললাম।

অন্যান্য ক্যাম্পের তুলনায় আমাদের জীবন নওশেরা ক্যাম্পে অনেকটা সহনীয় মন্দের ভালো বলতে হবে। এর প্রধান কারণ ক্যাম্পের কমান্ডার কর্নেল আকরাম ছিলেন যেমনি ভদ্র তেমনি ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি '৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। একটি পা খোঁড়া। পি এম এ-তে আমার সিনিয়র ছিলেন, কিন্তু বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি বললেন, 'দেখ খলিল, ভাগ্যের পরিহাস তোমরা এখানে বন্দি।' বলতে বলতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। 'আমাদের একটি অপ্রীতিকর দায়িত্ব তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করা। এতে আমাদের কোনো গৌরব নেই, আছে অশেষ গ্লানি। আমার ওপর দায়িত্ব তোমাদের ভেতর শৃঙ্খলা বজায় রাখা আর দেখা যে কেউ যেন পালিয়ে না যায়। জানোই তো কেউ পালিয়ে গেলে আমাদের ওপর শাস্তি নেমে আসবে সেনাসদর থেকে।'

আমি বললাম, 'বলো আমাদের কী করতে হবে।'

বললেন, 'ব্যক্তিগতভাবে তোমার সম্মানবোধ ও দক্ষতার ওপর আমার পূর্ণ

আস্থা আছে। যদি কথা দাও যে তুমি এই একুশজন অফিসারের শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, আর যদি কথা দাও যে কেউ পালানোর চেষ্টা করবে না, তবে আমি তোমার হাতে এ দায়িত্ব অর্পণ করে আমার সরকারি কাজে মনোযোগ দিতে চাই।'

সেদিন কর্নেল আকরামের কথার উত্তর দিলাম না। ফিরে এসে সিনিয়র বাঙালি অফিসারদের ডাকলাম। তাঁরা বললেন, 'আপনি এ দায়িত্ব নিয়ে নিন। আমরা আপনাকে সহযোগিতা করবো।' বিকেলে সব অফিসারকে ডাকলাম। তাঁরাও সমস্বরে বললেন, 'আপনি এ দায়িত্ব নিন।' বললাম, 'এখন আর পালিয়ে যাওয়ায় লাভ কি? '৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করতে আমরা পারি নি। এখন পালিয়ে যেতে হয়তো আমাদের মধ্যে দু'একজন সফল হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখ পালিয়ে যাওয়ার পর বাকি সবার ও তাঁদের পরিবারবর্গের ওপর যে অত্যাচার নেমে আসবে তা তবে অসহনীয়। বর্তমানে তো অনুমতি নিয়ে পরিবারপ্রধান বাজার করতে ও হাসপাতালে যেতে পারছে; কিন্তু তখন তাও পারবে না। অসুখ-বিসুখে, যতো জরুরি হোক, বসে থাকতে হবে কখন পরদিন ডাক্তার আসবে, আরও কতো কিছু। কাজেই আমাকে কথা দিতে হবে তোমরা এই দুটি শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।' সবাই কথা দিলেন। আমিও পরদিন কর্নেল আকরামের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্ব নিলাম। সকালে শরীরচর্চা হতো। সেখানে সবাই খুশি মনে হাজির হতেন। নিকটেই বাজার। সেখানেও পরিবারের একজন বাজার করতে যেতে পারতেন আমাদের নিযুক্ত একজন অফিসারের অনুমতিপত্র নিয়ে। হাসপাতালেও যেতে পারতেন— অনুমতিপত্র নিয়ে। এভাবে ভালোই কাটছিল দিন।

হঠাৎ একদিন ব্যতিক্রম ঘটলো। কর্নেল আকরামের বদৌলতে আমরা যতোই স্বায়ত্তশাসন ভোগ করি না কেন, ঊর্ধ্বতন স্টেশন হেড কোয়ার্টার্সের ডিউটি অফিসারের দায়িত্ব ছিল আমাদের ওপরে চোখ রাখা। একদিন একজন তীব্র বাঙালি-বিদ্বেষী, রগচটা, পাগল গোছের মেজর ছিলেন ডিউটি অফিসার। তিনি সকালবেলা এলেন আমাদের শরীরচর্চা দেখতে। কর্নেল মান্নান সিদ্দিকী পিটি পরিচালনা করতেন। সবাই হাজিরও ছিলেন পিটিতে। হঠাৎ মেজর চিৎকার করে উঠলেন, 'ব্রিগেডিয়ার খলিল কোথায়?' কর্নেল মান্নান জবাব দিলেন, 'তিনি তো পিটিতে আসেন না। তাঁর আসার কথাও নয়। ব্রিগেডিয়ারের তো পিটিতে 'ফল-ইন' করার কথা নয়।' মেজর গর্জন করে উঠলেন, 'তাকেও আসতে বলো।' কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর আমাকে খবর দেয়া হলো। গেলাম। মেজর হুকুম করলেন, 'ফল-ইন' অর্থাৎ লাইনে দাঁড়ান। কর্কশ স্বরেই বললাম, 'মেজর, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কি ব্রিগেডিয়ার পিটিতে বা কোন প্যারেডে 'ফল-ইন' করেন?' মেজর কিছুটা দমে গেলেও হার মানলেন না, সজোরে বললেন, 'আপনি আমাদের বন্দি। ফল-ইন।' শান্ত কণ্ঠেই বললাম, 'এ ব্যাপারে

আপনি আপনার কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করুন। আমি ফল-ইন করবো না। কারণ এটা নিয়ম-বিরুদ্ধ। তবুও আপনার সম্মান রক্ষার্থে আমি আমার ঘর থেকে এ পর্যন্ত এসেছি। এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কথা।' এ কথা বলে আমি চলে এলাম। কিছুটা বিমূঢ় হয়ে মেজর চলে গেলেন। পরে শুনেছিলাম এই মেজরের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বাংলাদেশে বন্দি।

একটু পরেই আমি আমাদের গার্ড হাবিলদারকে বললাম, 'চল স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সাহেবের বাংলোতে। আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃত করার পর ব্রিগেডিয়ার মেজরটিকে সাবধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এরপর অনুরূপ ঘটনা আর ঘটে নি।

আর একদিনের ঘটনা। সন্ধ্যার পরপরই আমার মা রান্নাঘরে পা পিছলে পড়ে গেলেন ও তাঁর হাতের একটি বড় অংশ ধারালো কিছুতে কেটে গেল এবং ঝুলতে থাকলো। মনে হলো ১৫/২০টা ফোড়ন লাগবে জোড়া দিতে হলে। প্রমাদ গুণলাম। পরদিন সকালে হাসপাতাল খুললে অনুমতি নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে। সেখানে কি চিকিৎসা হবে সেটাও অজানা। ততোক্ষণ এই অসুস্থ বৃদ্ধার আর কি সঙ্কট হবে চিন্তা করতে লাগলাম।

ক্যাম্পের অনেকে দেখতে এলেন। ডা. মেজর মুরতজাও এলেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ সার্জন। বললেন, এখনি সেলাই না করলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। ক্যাম্পে টেলিফোনও নেই যে কর্তৃপক্ষকে অবগত করবো ও অনুমতি চাইবো। কী করি ভাবছি। মুরতজা বললেন, 'স্যার, ওঁকে তৈরি করুন, আপনিও তৈরি হোন। আমি আসছি।' মিনিট পনের পরে মুরতজা এসে হাজির– সুন্দর ইস্ত্রি করা উর্দি পরে কাঁধে চকচকে মেজরের পদবি চিহ্ন। অবাক হলাম। বললেন, 'বন্দি হওয়ার আগে আমি এই হাসপাতালে সার্জন ছিলাম। এদেরকে কখনোই পর ভাবি নি। জাতভেদ করি নি। কর্তব্য করেছি। মানবতাকেই ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছি। দেখা যাক এর মূল্য এরা দেয় কি না। আপনি গাড়ি চালান হাসপাতালের দিকে।'

গার্ড কমান্ডার হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে গেলাম সি এম এইচে। মুরতজা দারোয়ানকে ডেকে গেট খুলতে বললেন ও অপারেশন থিয়েটারের চাবি দিতে বললেন। চাবি নিয়ে তিনি অপারেশন থিয়েটারে কর্তব্যরত সমস্ত কর্মচারীকে হুকুম দিতে লাগলেন—ভাবটা এমনি যে তিনি এখনও এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্জন। আর তাজ্জব ব্যাপার। কর্মচারীরা প্রথমত একটু অপ্রস্তুত হলেও শিগগিরই অত্যন্ত খুশি মনে মুরতজার হুকুম পালন করতে লাগলো। মুরতজা অপারেশন থিয়েটারে গেলেন। সাদা গাউন, টুপি দস্তানা, নিয়মমাফিক পরে সার্জারি করলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। প্রসন্ন মুখে রোগীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গাউন ইত্যাদি ছেড়ে কর্মচারীদের পিতৃসুলভ স্নেহসিক্ত কথাবার্তা ও

ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে বসলেন।

প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় দেখেছিলাম মুরতজার চোখেমুখে সেদিন। এই আত্মপ্রত্যয় তাঁর স্বকীয় নিশ্চয়ই। তবে কর্মচারীসহ সকলকে নির্বিচারে সেবার স্বভাবগত কার্যক্রম সে প্রত্যয়কে জোরদার করেছে সন্দেহ নেই। দ্বিধা মুরতজার ব্যবহারে সেদিন ছিল না। আমার মনেও সন্দেহ রইলো না যে এই মুরতজা মানবসেবায় আন্তরিকতা ও মানবতাবোধের সাথে এই কর্মচারীদের সবারই পরিচিত। তাই এই সশ্রদ্ধ ভালোবাসা।

মেজর মুরতজাকে অনুরূপ পরিস্থিতিতে আর একবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার কয়েক বছর পর ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে। ৭ নভেম্বর সিপাহি বিপ্লবের একদিন কি দু'দিন পরে। দু'একদিন যাবৎ অফিসার ও তাঁদের পরিবারের ওপর সিপাহিদের হামলা হচ্ছিল। অফিসাররা সবাই আত্মগোপন করে আছেন—প্রায় সবাই সেনাছাউনি ছেড়ে চলে গেছেন। এক অরাজক অবস্থা। আমি তখন প্রতিরক্ষা স্টাফ প্রধান। সেনাছাউনিতে বিভিন্ন সেনা ইউনিট পরিদর্শন করছিলাম সৈন্যদের শান্ত করতে ও অফিসারদের মনোবল বাড়াতে। এক পর্যায়ে সিএমএইচ গিয়ে পৌঁছলাম। সব স্থাপনাতে যা করে থাকি এখানেও তাই করা হলো। নির্দেশমতো আমার দেহরক্ষী দল গেটের বাইরে থেকে গেল। আমি আর আমার এডিসি, দু'জনেই নিরস্ত্র এগিয়ে গেলাম সামরিক হাসপাতালের দফতরের দিকে। দু'দিক থেকে দুটি রাইফেলের গুলির শব্দ। যেহেতু গায়ে লাগে নি বুঝলাম ফাঁকা আওয়াজ। এগিয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে গুলির আওয়াজ শুনে দেহরক্ষী দল ধেয়ে এসেছে। তাদেরকে ফিরে গেটের বাইরে যেতে বললাম। শ'খানেক গজ সামনে জন দুয়েক সৈনিক দাঁড়িয়ে। ইশারায় কাছে ডাকলাম। আমাদের নিরস্ত্র দেখে বোধহয় তারা সাহস করে এগিয়ে এলেন। ওদের দেখাদেখি আরও কয়েকজন এগিয়ে এলেন। ক্রমে শ'খানেক সৈনিক আমার চারদিকে সমবেত হলেন।

একজনকে বললাম আপনাদের অধিনায়ককে ডেকে আনুন। অধিনায়ক এলেন। তিনি দ্বিতীয় অধিনায়ক, ভারপ্রাপ্ত। সিভিলিয়ান কাপড় পরা—দাড়ি কামানো হয় নি। উষ্কখুষ্ক চেহারা। ভয়েই চেহারাটা মলিন। তাঁকে জিগ্যেস করলাম, 'আর কোনো অফিসার নেই।' উনি বললেন, আর একজন আছেন তিনি সার্জন এবং অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন করছেন। বুঝলাম যেসব সিপাহি গত দিন-দুয়েক আহত হয়েছেন তাদের অপারেশন চলছে। মনটা খুশি হলো। নিকটস্থ কর্মকর্তাকে বললাম, অপারেশনের ফাঁকে সার্জন সাহেবকে একবার আসতে বলার জন্য।

ইতোমধ্যে সমবেত সৈনিকদের সাথে কথা বলছিলাম (এর বিশদ বিবরণ আমার অন্য পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে)। কিছুক্ষণ পরে সার্জন বেরিয়ে এলেন। সদ্য

ইস্ত্রি করা নিখুঁত সামরিক পোশাক। কাঁধে মেজরের পদবি চিহ্ন ঝকঝক করছে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, তথাকথিত সিপাহি বিপ্লবের পরে দু'একদিন যাবৎ কোনো অফিসার কাঁধে পদবি চিহ্ন পরার সাহস পেতেন না। যেমন আমার পাশে দাঁড়ানো ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কটিও পান নি, পাছে 'সিপাহি-সিপাহি ভাই ভাই, সুবেদারের ওপর অফিসার নাই' স্লোগানধারী সিপাহিরা আক্রমণ করে বসে।

আসবার সময় একজন স্ট্রেচারবাহিত রোগী এলো দেখে সার্জন সাহেব উচ্চকণ্ঠে স্ট্রেচার বহনকারীদের হুকুম দিলেন কোথায় নিয়ে যেতে হবে। লোকগুলো কিছুটা ভুল পথ ধরতেই চিৎকার করে, গালাগালি করে, তুই তুকারি করে পুনরায় নির্দেশ দিলেন। সব সৈনিক ভিজে বেড়ালের মতো অনেকটা কাঁপতে কাঁপতে হুকুম তামিল করছিল। অদ্ভুত অসামঞ্জস্য আমার সামনের এই সিভিলিয়ান পোশাক পরা অধিনায়ক ও সার্জন সাহেবের।

বলাবাহুল্য, এই সার্জন সাহেবই মেজর মুরতজা। বিধাতাকে প্রশ্ন করলাম, সবাই মুরতজা হয় না কেন? সবাই না হোক, নিদেনপক্ষে বেশির ভাগ মানুষ মুরতজা হলে তোমার ক্ষতি কি? নাকি তোমার সৃষ্টির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে– এই ভয়?

পূর্বাপর অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় নওশেরার বন্দিজীবন অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে ভালো কেটেছে। কর্তৃপক্ষ সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। আগেই বলেছি, এর প্রধান কারণ কর্নেল আকরামের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ। আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সমস্যা ছিল। তাঁকে অনুরোধ করাতে তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন যে আমাদের ছেলেমেয়েরাও পাকিস্তানি ছেলেমেয়েদের মতো কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত রিসালপুর ছাউনির স্কুলে গিয়ে পড়তে পারবে। একটি বড় সমস্যার সমাধান হলো। এখানে বলে রাখি পরের বন্দিশালায় আমাদের এ সুবিধা দেয়া হয় নি। আমার বড় ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। তাও আবার ভার্নাকুলার বাংলা। যদিও পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, তবুও বাংলা প্রশ্নপত্র পাঠানো হলো ও ছেলে ঠিকমতো পরীক্ষা দিলো; কিন্তু বিপদ হলো ফল প্রকাশ নিয়ে। ফলাফল যখন বের হলো তখন দেখা গেল উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় ওর নাম নেই। অথচ ছাত্র মোটামুটি ভালো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ভার্নাকুলারে সে গরহাজির। অনেক লেখালেখি করে পেশাওয়ারে বন্ধু কর্নেল চিরাগ শাহ্‌র (প্রখ্যাত ন্যাপপন্থী সাংবাদিক সৈয়দ আমানুল্লাহ শাহের ভাই) সাহায্যে ওর বাংলা নম্বর যোগ করে ফল পাওয়া গেল। ও প্রথম ডিভিশনে পাস করেছিল।

একদিন এক মেহমান এসে হাজির আমাদের কোয়ার্টার্সে। দরজা খুলে দেখি জেনারেল ওয়াসিউদ্দীন সাহেবের স্ত্রী। যেমন অবাক হলাম, তেমনি মনটা খুশিতে ভরে গেল। মহিলা পেশাওয়ারের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যা। কাজেই

গাড়ি করে তাঁর পাকিস্তানের কোনো জায়গায় যেতে কোনো অসুবিধা ছিল না। তাই স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে ঠিক করেছেন ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে বাঙালি পরিবারের খোঁজ-খবর নিয়ে আসবেন। বেগম ওয়াসি ব্যাখ্যার সুরেই বললেন এই কথাগুলো। জিগ্যেস করলাম, 'গেটে ঢুকলেন কিভাবে? ওরা তো কোনো পাকিস্তানিকে এখানে ঢুকতে দেয় না।' উত্তরে বললেন, 'বলেছি আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবের বাচ্চাদের শিক্ষিকা (ওস্তানী)। ওরা সন্দেহ করে নি।' তিনি কোহাটে ব্রিগেডিয়ার মজিদুল হক, কর্নেল এ আর খান প্রমুখের সঙ্গেও দেখা করে এসেছেন। ওখানে নাকি ক্যাম্পে ঢুকতে অসুবিধা হয়েছিল। অনেক বাদানুবাদের পর প্রহরীসমেত ঢুকতে হয়েছিল। ওঁদের তুলনায় আমরা অনেক ভালো আছি মনে হলো।

আমরা ২১টি পরিবার বন্দি। এই ২১টি কোয়ার্টার্স মুখোমুখি দুই সারিতে বিন্যস্ত। মাঝখানে একটি সুরকির রাস্তা। বাসাগুলো ইংরেজ আমলে সার্জেন্টদের জন্য করা ছিল। ইদানীং অবিবাহিত অফিসারদের থাকার ঘর। এইসব অফিসার সাধারণত ২/৩ মাসের প্রশিক্ষণের জন্যই নওশেরাতে আসেন। কাজেই পরিবার নিয়ে আসেন না। আমাদের বাসাগুলোর এক প্রান্ত কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। বেরুনোর রাস্তা কেবল আরেক প্রান্ত দিয়ে—প্রহরী পরিবেষ্টিত। বাসাগুলোর পেছন দিকে খেলার মাঠ। ওখানেই সকালে আমাদের শরীরচর্চা ও বিকেলে খেলাধুলা হতো; কিন্তু এই নওশেরা ক্যাম্পে আমাদের দীর্ঘদিন থাকা হয় নি।

বন্দিজীবন—মন্ডি বাহাউদ্দিন

১৯৭৩ সালের প্রথমদিকে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় মন্ডি বাহাউদ্দিন নামক বিশাল এক বন্দিশালায়। এখানে ছিল প্রায় সাড়ে তিনশ' পরিবার। এখানে ছিলাম আমরা তিনজন ব্রিগেডিয়ার পদবির অফিসার। এদিকে এতোগুলো পরিবার ও এতোজন অফিসার/ জেসিওর শৃঙ্খলাবোধও এতো দীর্ঘ কারাবাসের পর স্বভাবতই অনেকটা ভেঙে পড়েছিল। যিনি নিজে এই বন্দিত্বের অবস্থায় কোনোদিন পড়েন নি, তাঁর পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন এই সত্যটি। আমরা যাঁরা সিনিয়র ছিলাম তাঁদের পক্ষে এই শৃঙ্খলাহীনতা দেখে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। আগেকার এই উঁচুমানের সুশৃঙ্খল বাঙালি অফিসারদের বর্তমান শৃঙ্খলাহীনতা দেখে আমাদের পাকিস্তানি কারারক্ষীরা আনন্দে হাসাহাসি করুক তা কোনো বাঙালিরই কাম্য হতে পারে না। অতএব, এর প্রতিকারে কতক পদক্ষেপ নিতে অনেকটা বাধ্য হয়েছিলাম। এই প্রতিকারসমূহ বর্ণনার আগে

আমাদের বন্দিজীবনের অনুভূতি, মানসিক ও বাহ্যিক অবস্থার বিবরণ দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

বন্দিজীবনের অর্নুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অত্যন্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অপরাধ মানুষের জন্য যতো সর্বনেশেই হোক, জেলখানা তার চেয়ে ঢের বেশি।' আর একজন বাঙালি কবির কথা, 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?' স্বাধীনতাহীনতা ব্যক্তির চরিত্র হনন করে। সে আর 'বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব' থাকে না। তার নিম্নগুণ বা দোষগুলোই প্রকট হয়ে ওঠে। উন্নত মস্তক, গর্বিত ও উন্নতমনা মানুষের জায়গায় স্বার্থপর, নিচ, বেহায়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষ বা অমানুষে পরিণত হয় বেশির ভাগ মানুষই। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম থাকেন কিন্তু তাঁরা সম্মানিত ব্যতিক্রমই।

একজন বন্দি তাঁর ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে একটি সংখ্যায় পরিণত হয়। যেহেতু তখন তাঁর আত্মপরিচয়, সামাজিক পরিচয় বিলুপ্ত হয়, পরিশ্রমে সে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সে প্রতিষ্ঠার গৌরব তার লোপ পায় এবং সে হয়ে যায় একটি অব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নন-এনটিটি, তখন কোনো নিচ কাজ করতে তাঁর আর বাধে না।

যেমন আগেই আভাস দিয়েছি, সবাই যে এরূপ পশুত্বের পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং গোড়াতেই সেটা ঘটে তা নয়। সকল মানুষের মনের জোর এক নয়। মানবত্ব থেকে পশুত্বের পর্যায়ে কে কতো দ্রুত তলিয়ে যাবে তা নির্ভর করে মনের জোর কার কতো বেশি বা কম তার ওপর। যার মনের জোর প্রচণ্ড, সে হয়তো বহু বছরের বন্দিজীবনেও পশুত্বের স্তরে নামে না। উদাহরণ দেয়া যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার। ২৮ বছর একটানা অত্যন্ত হেয় ও অমানবিক বন্দিজীবনেও তাঁর অশেষ অফুরন্ত মনের জোর কমে নি। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন যে, একদিন একজন কারা অফিসার তাঁর সাথে নির্দয় ব্যবহার করেছিল এবং অত্যন্ত কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করেছিল। সেদিন সে ব্যবহারে তাঁর ধৈর্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং তিনি কারা অফিসারকে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। টেবিলের অপর পাশে বসা অফিসারের কাছে তিনি যখন টেবিল ঘুরে পৌঁছলেন, ওই মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে ম্যান্ডেলার স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ফিরে এলো। তিনি উদ্যত হাত নামিয়ে নিলেন। নিজেকেই বললেন, এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। অনেক কাজ এখনও বাকি। তবে ম্যান্ডেলার মতো মনের জোর কম লোকের থাকে। আমাদের মধ্যে কিছুটা হলেও মনের জোর কারো কারো ছিল। তাই রক্ষা।

মনে আছে একদিন অনুরূপ একটি দুর্বল মুহূর্তে এমন এক কাণ্ড আমি নিজেও করে বসেছিলাম। ক্যাম্পের অফিসারদের উচ্ছৃঙ্খলতা, কর্তৃপক্ষের অপমানকর ব্যবহার ইত্যাদি মিলিয়ে মনটা ছিল যেমনি বিষণ্ন, তেমনি তিক্ত। এমতাবস্থায় আমাদের বড় ছেলেটি অবাধ্যতা ও মুখের ওপর জবাব দিয়ে

মেজাজ একেবারে খিঁচিয়ে তুললো। অথচ ছেলেটি আমাদের শান্ত ও সংযত স্বভাবের এবং ছোটবেলা থেকেই পরিপক্ক-মনা। বন্দিত্ব ওকেও নিশ্চয় ওই মুহূর্তে অনুরূপভাবে প্রভাবান্বিত করে রেখেছিল। রাগের মাথায় চিৎকার করে বলে দিলাম, 'বেরিয়ে যা।' ওর বয়স তখন ১৫/১৬ বছর, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। তখন বেলা গড়িয়ে গেছে, সন্ধ্যা আসন্ন। সেও রাগের মাথায় এক কাপড়েই বেরিয়ে গেল পেছনের মাঠের দিকে। ওদিকে কাঁটাতারের বেড়া; কিন্তু পাশের গাছে চড়ে লাফ দিয়ে তারের বেড়া অতিক্রম করা খুব দুঃসাধ্য নয়। ও কিছু দূর যাওয়ার পরই আমার চেতনা ফিরে এলো। আমার স্ত্রীও হতবাক, কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ছেলে আমার জেদি, স্বভাব-শান্ত ছেলেরা যা হয়। জীবনে কোনো দিন আমাদের মধ্যে কটুবাক্য বিনিময় হয় নি। জানতাম আমি সে মুহূর্তে মাফ চেয়ে ওকে ফিরতে বললেও ফিরতো না। আমার স্ত্রীও জানতেন সে কথা। দুঃখে-ক্ষোভে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল। এ অবস্থায় পাঠান মুলুকে এই সময় বেরিয়ে গেলে ওর কী হবে চিন্তাও করতে পারছিলাম না। আর ধরা পড়লে যে কি হবে তাও বলাই বাহুল্য। যা হোক, ঘণ্টাখানেক মাঠেই দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর ধীর পদক্ষেপে বাসায় ফিরে এলো। জিগ্যেস করি নি কিছু, কিন্তু তারও স্বাভাবিক চেতনা ও চিন্তা নিশ্চয় ফিরে এসেছিল কিছুক্ষণ পরেই।

ঘটনাটি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করলাম, বন্দিজীবন মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনার কতোটা অবনতি ঘটায় তার একটা উদাহরণ হিসেবে।

আগেই বলা হয়েছে, আমাদের ভাতা কমে যাওয়ার দরুন পিণ্ডিতে আমরা একটি সাহায্য তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পিণ্ডিতেই এর জন্য আমরা একটি কমিটি গঠন করি। আমাকে সভাপতি ও কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল ও অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা) ডা. এ আর খানকে সম্পাদক করে এই কমিটি গঠিত হয়। আমাদের কাজ ছিল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অফিসারদের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে তা বিতরণ করা। এ কাজ করতে গিয়ে দেখি কিছু কিছু কর্মচারী আছেন যাঁরা সত্যি সত্যিই অভাবী। যাঁদের পোষ্য বেশি তাঁরাই সাধারণত এই শ্রেণীর; কিন্তু কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা পূর্বাপর বিবেচনাশূন্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও স্বার্থপর এবং খরচে স্বভাবের লোক। হয়তো আগামীকাল তাঁর ছেলেপুলেকে উপবাস করতে হবে, কিন্তু আজ তিনি অপ্রয়োজনীয় খরচ করেই চলেছেন। এদের বেশির ভাগ হাতপাতা স্বভাবের হয় এবং বাড়ি এসে জ্বালাতন করে। অসীম ধৈর্য সহকারে কর্নেল এ আর খান বিতরণের কাজ করতেন। এই সময় আমাদের আরও একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, দায়িত্ব ও কাজ না থাকলে মানুষ বাজে কাজ বেশি করে ও বাজে কথা বেশি বলে।

এই কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্তের পেছনে কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য একটি বড় উদ্দেশ্যও ছিল। আমরা জানতাম ওই 'হাতপাতা' স্বভাবের লোকগুলো শিগগির পাকিস্তানিদের কাছে গিয়ে ধরনা দেবে। পাঞ্জাবিদের চোখে হেয় হওয়া? সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে এই সম্ভাবনা ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্হিত ও অবমাননাকর। তাই সমূহ ত্যাগ স্বীকারও আমাদের অনেকের কাছে তুচ্ছ মনে হতো তখন। আমাদের মহিলারাও তাই তাঁদের গোপনে জমাকৃত টাকা থেকে হাসিমুখে আমাদের চাঁদা দিয়েছেন। এই দেখে কিছু নিষ্কর্মা অফিসার তাঁদের কর্মবিহীন আড্ডায় বসে কঠোর সমালোচনা করতে লাগলেন এই কমিটির কাজ সম্বন্ধে। এমনকি তাঁদের কথাতে এটাও স্পষ্ট হতে লাগলো যে, কমিটি দুর্নীতিপরায়ণ। ভাবতেও অবাক লাগে যে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র ধরনের এই ফান্ডটি সম্বন্ধেও তাঁরা সন্দেহ পোষণ করছেন। একদিন এই আড্ডায় নায়ক গোছের এক অফিসারকে ডেকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে সংরক্ষিত কমিটির হিসাব-নিকাশের বইটি নিরীক্ষা করতে বললাম। এতোটা সে আশা করে নি। কাঁচুমাচু মুখে সে বলতে লাগলো, 'স্যার, আমরা কি আপনাদের মতো সিনিয়র অফিসারদের সন্দেহ করি?' ধমকের সুরে বললাম, 'তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে তাই করো।' অগত্যা সে হিসাব পরীক্ষা করতে বাধ্য হলো। নিরীক্ষা শেষ হলে তাঁকে বলা হলো, 'এইবার তোমার মন্তব্য লেখ এবং দস্তখত করো।' বলাবাহুল্য, অত্যন্ত লজ্জায় পড়ে সে তাই করতে বাধ্য হলো। এরপর আর এই কমিটির কাজ নিয়ে কোনো গুঞ্জরণ শোনা যায় নি।

বন্দিজীবন বড়ই অদ্ভুত। নওশেরা ছাউনি পেশাওয়ার থেকে মাইল পঁচিশেক দক্ষিণে রাওয়ালপিণ্ডির পথে। ওখানে আমাদেরকে নেয়া হয় ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে। আবার ওখান থেকে আমাদের নেয়া হয় মন্ডি বাহাউদ্দিন। জায়গাটি পাঞ্জাবের ঝিলাম ও গুজরানওয়ালা জেলার সংযোগস্থলে। ওখানে যাই আমরা ১৯৭৩ সালের শুরুতে, ফেব্রুয়ারি/মার্চের দিকে।

আগেই বলেছি, যে-তিনটি ক্যাম্পে আমি দেড় বছর কাটিয়েছি তার মধ্যে একমাত্র নওশেরার অবস্থান ছিল অপেক্ষাকৃত সহনীয়। আমাদের তিনটি ছেলে ও বড় একটি মেয়ে। মেয়ের বয়স ১৯। ছোট ছেলেটি বছর তিনেকের। এছাড়া আমার মা ছিলেন আমাদের সঙ্গে। এই আটটি মানুষের খরচ ছিল যথেষ্ট। কতোদিন এই কারাবাস চলবে জানতাম না। সঞ্চিত টাকাও ছিল সীমিত। স্ত্রী ও মেয়ের গায়ে কিছু অলঙ্কারাদি ছিল। দুর্দিনের সহায়ক হিসেবে সেগুলোর দিকে নজর ছিল সবার; কিন্তু মাঝে মাঝেই শুনতে পেতাম পাকিস্তানিরা ওগুলোও নিয়ে নেবে জোর করে। অত্যন্ত অসহায় লাগতো তখন। প্রচণ্ড রকমের ব্যয় সঙ্কুলান করে চলতাম আমরা। গরুর মাংস আনুপাতিক হারে

সস্তা ছিল বলে গরুর গোশত আর সবজি চলতো মাসের পর মাস জুড়ে। ছেলেপিলেরা বায়না ধরতো অন্য কিছু খাওয়ার জন্য, কিন্তু উপায় ছিল না। তবে খাওয়ার কথাটা বড় ছিল না। মারাত্মক প্রশ্ন ছিল নিরাপত্তার। নানা রকমের গুজব শুনতাম। মৃত্যুর ভয়ও বিশেষ কাবু করতে পারতো না। কাবু হয়ে যেতাম মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে। রাতে ভালো ঘুম হতো না কারোরই।

মন্ডি বাহাউদ্দিন ক্যাম্পে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো স্পেশাল ট্রেনে করে। কোহাট, পেশাওয়ার ও অন্যান্য নানা ক্যাম্প বন্ধ করে পাঞ্জাব ও ফ্রন্টিয়ার এলাকার সবাইকে একই ক্যাম্পে নেয়া হলো। ঝিলাম হাইড্রো ইলেকট্রিক বাঁধের জন্য তৈরি হয়েছিল এই ক্যাম্পটি। অনেকগুলো ছোট ছোট বাড়ি। কোনোটা এক কামরা, একটি বসার ঘর ও একটি বাথরুম এবং একটি রান্নাঘর। ছাদ নিচু, অত্যন্ত গরম। কোনো গাছপালা নেই। এই বাসাগুলো পরিবারসহ দু'জন অফিসারকে বরাদ্দ দেয়া হলো। আর এক শ্রেণীর বাসা ছিল দুই বেডরুমের। সেগুলোতে বড় ছেলেমেয়েসহ দুই পরিবারকে বরাদ্দ দেয়া হলো। আর কিছু ছিল তিন বেড রুমের ও দুই বাথরুম। সেগুলো দেয়া হলো তিনটি পরিবারকে; কিন্তু মুশকিল হলো, যখন দেখা গেল এই তিনটি পরিবারেই বয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে—কেউ কেউ কলেজে পড়ে। মনে পড়ে এই তিন শোবার ঘরসমেত একটি বাসায় তিনজন অফিসার ছিলেন যাঁদের দশ বছরের অধিক বয়স্ক ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল তিন পরিবার মিলে সতেরোজন। দুটি বাথরুম ও একটি রান্নাঘর। বস্তুত এই অবস্থা দোজখখানাই মনে করিয়ে দেয়। একে তো থাকার এই ব্যবস্থা, তার ওপর টাকার ভাবনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা ও সর্বোপরি বন্দিজীবনে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাঁটি জীবনকে দুর্বিষহ করে তুললো।

মন্ডি বাহাউদ্দিন ক্যাম্পের এই অংশটি বরাদ্দ ছিল পরিবারসহ তিনশ' অফিসারের জন্য। এর বাইরে আর একটি অংশ ছিল পরিবারসহ সুবেদার ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের জন্য। তাঁদের অবস্থা শুনেছি আরও খারাপ। এছাড়া এই ক্যাম্পের আরও দুটি অংশ ছিল– একটি পরিবারহীন নিম্নপদস্থদের জন্য, অন্যটি পরিবারহীন অফিসারদের জন্য। এগুলো ছিল শ্রমিক কলোনির ব্যারাক। প্রত্যেকেরই অবর্ণনীয় অবস্থা। এছাড়া আমাদের অংশে কয়েকটি বাড়িতে ভৃত্যদের কোয়ার্টার্স ছিল। সেখানে রাখা হয় অধিক পোষ্যসহ কয়েকজন সুবেদার সাহেবকে। শুনেছি এঁরাই নাকি সবচেয়ে ভাগ্যবান ছিলেন।

এই সমগ্র বন্দিশালাটি উঁচু ও ডবল কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। আবার এটি ছিল তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের জন্য একটি করে গেট—প্রহরী বেষ্টিত। কারও বাইরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। একটি ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠা করা হয়। চাল-ডাল, মশলাপাতি ও গরুর গোশত থাকতো সেই ক্যান্টিনে। লাইন লাগিয়ে

কিনতে হতো জিনিসপত্র। দামও বেশি। কালেভদ্রে এক আধদিন স্থানীয় গ্রামবাসী ক্যাম্পের অনুমতি নিয়ে এক আধ ঝুড়ি মাছ আনতো। সেদিনটাতে হতো প্রবল সমস্যা। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তো মাছের ওপর।

একদিনের ঘটনা। এক ঝুড়ি মাছ এসেছে। তার মধ্যে কেজি দেড়েক পাবদা মাছ। সবারই চোখ পাবদার দিকে। কেউ কেউ বলাবলি করছেন, পাবদাগুলো একটা দুটো করে ভাগ করে নিলে কেমন হয়। এই সময় একজন সিনিয়র মেজর পাবদাগুলো হাতে তুলে হঠাৎ দিলেন দৌড়। প্রথমটা সবাই কিছুটা হতভম্ব। পর মুহূর্তে একজন সুঠামদেহি ক্যাপ্টেন দৌড়ালেন মেজরের পেছন পেছন। একশ' গজ গিয়ে ধরে ফেললেন মেজরকে। তারপর ধস্তাধস্তি, গালাগালি ও মারামারি।

আগেই বলেছি বন্দিজীবন মানুষকে নিচ করে দেয়। এঁরা সবাই কমিশন্‌ড্ অফিসার। এরকম দু'চার কেজি পাবদা মাছ দুষ্প্রাপ্য হলেও তাঁরা স্বাভাবিক সময়ে পরস্পরকে উপহার দিয়ে অভ্যস্ত। ইতোপূর্বে পেশাওয়ার থেকে আগত একজন অফিসারের মুখে শুনেছিলাম ওখানে ওঁরা প্রায় গোটা দশেক পরিবার ছিলেন, অবিবাহিত অফিসারদের মেসের থাকার কামরাগুলোতে। পানির লাইনটি এক প্রান্ত থেকে ঢোকে ও অপর প্রান্তে শেষ হয়। পানির টানাটানি প্রায়শ লেগে থাকতো। ক'জন অবিবাহিত অফিসারের জন্য নির্মিত ট্যাঙ্কটির পানি দশটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই অবস্থায় নাকি প্রথম প্রান্তে অবস্থিত এক মহিলা সাত সকালে উঠে সমস্ত কাপড় কাচা ও ধোয়া-মোছা সেরে বড় বড় বালতি ভরতি করতেন। তারপর পানির কলটি পুরো খুলে দিতেন। ঘণ্টাখানেক খোলা কল চলার পর ট্যাংকের সব পানি পেছনের নালা দিয়ে বেরিয়ে যেত। পরে বাকি নয়টি পরিবারের সদস্যরা কোনো পানি পেতেন না। হয়তো দৈনন্দিন মনোমালিন্যের প্রতিশোধ হিসেবে এটিকেই সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন প্রথমোক্ত মহিলা ও তাঁর স্বামী।

অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগলো। এসব দেখেশুনে এবং আমাদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তা করতে লাগলাম এর একটা বিহিত করা দরকার। এসব ঘটনার ব্যাপারে যদি কোনো অফিসার পাকিস্তানি কারারক্ষীর কাছে নালিশ করতেন তবে শুরু হতো অত্যাচার ও অবিচার। ফলে আমাদের হেয় জীবনে নেমে আসতো হেয়তর অবমাননা। ক্যাম্পে আমরা তিনজন ব্রিগেডিয়ার ছিলাম। তাঁর মধ্যে সিনিয়র ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জব্বার। সিদ্ধান্ত হলো তিনি হবেন সিনিয়র বাঙালি অফিসার অর্থাৎ এস বি ও। তাঁকে ক্ষমতা দেয়া হলো অনুরূপ শৃঙ্খলাভঙ্গের বিচার ও শাস্তি বিধান করার। আমরা দু'জন ব্রিগেডিয়ার মজিদুল হক ও আমি, এস বি ও সাহেবের উপদেষ্টা নিযুক্ত হলাম। অর্থাৎ আমরা তিনজন মিলে বিচার-আচার করবো ও শৃঙ্খলাজনিত নির্দেশাবলি প্রচার করবো।

বিচার-আচার ছাড়াও আরও কতক ব্যাপার সমন্বয় করাও প্রয়োজন ছিল। যেমন, আমাদের ক্যাম্পের জন্য একটি ডিসপেনসারি ছিল। কিছু ওষুধ সেখানে ছিল কিন্তু কোনো নিয়মিত ডাক্তার ছিল না। অথচ আমাদের বন্দিদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এঁরা সবাই রোগীদের সেবা করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। অনেক মহিলা গর্ভবতী ছিলেন। তাঁদের জন্য কোনো গাইনি বিশেষজ্ঞ ছিল না। অথচ আমাদের মধ্যে গাইনি মহিলা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন ছিলেন। এঁদেরকে কাজে লাগানো ও এঁদের কাজের সমন্বয় করা একটি প্রধান দায়িত্ব ছিল এস বি ও সাহেবের। তাছাড়া আমাদের সন্তানদের মধ্যে কলেজ ও স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ছিল। তাদের স্কুল-কলেজের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এদিকে আমাদের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। তাই সমন্বিতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

এস বি ও অফিস স্থাপনা অর্থাৎ বাঙালি বন্দিদের ওপর বাঙালি কমান্ড প্রতিষ্ঠা আমাদের অনেক বন্দির পছন্দসই ছিল না। এটা আমরাও জানতাম। মানবসমাজে কিছু লোক সর্বদাই থাকে যাঁদের আত্মসম্মানবোধ কম। তাঁরা স্বাধীনতার চাইতে পরাধীনতা বেশি পছন্দ করে। ইংরেজ আমলেও দেখেছি কিছু ভারতীয় নিজেদের মধ্যকার গুণী ব্যক্তিকে সম্মান করতেন না, মান্য করা তো দূরের কথা। তাঁরা অনেক নিচু স্তরের হলেও ইংরেজ শাসকের পদসেবা করতে বেশি আগ্রহী হতেন। কারণ তাঁর মাধ্যমে কিছু অন্যায্য পাওনা আদায় সহজ হতো। প্রয়োজনে স্বদেশি ভারতীয়দের বিরুদ্ধেও তাঁরা ইংরেজ শাসককে খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করতেন। ইংরেজও এদের 'লয়ালিস্ট' হিসেবে প্রশ্রয় দিতো এবং সংরক্ষণ করতো। এদের সাহায্যেই তারা উন্নতমনা ভারতীয়দের কাবু রাখতো। পাকিস্তানি শাসন আমলেও এই শ্রেণীর নিচ চরিত্রের লোক বাঙালি স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে নিজের আখের গোছাতে প্রয়াস পেত। আমাদের বন্দিশিবিরেও এই রকম অফিসারের অভাব ছিল না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সিনিয়রও ছিলেন।

এদিকে কারা কর্তৃপক্ষও আমাদের সংগঠনটিকে সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু নওশেরা-লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ঠিক করলাম যে, প্রয়োজনে দৈহিক শক্তি দিয়ে হলেও আমরা বাঙালি কমান্ড স্থাপন করবো। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ হয় আত্মমর্যাদাপূর্ণ, অতএব এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের আশীর্বাদপুষ্ট কমান্ড, ওই কিছুসংখ্যক হীনমনাদের কাবু রাখতে সমর্থ হবে। আমরা এও জানতাম যে, হীন চরিত্রের লোক সাহসী হয় না। সৎসাহস ও সূক্ষ্ম সুবিচার দ্বারা এঁদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এই কমান্ড প্রতিষ্ঠার আরও একটি বড় প্রয়োজন ছিল। আমরা জানতাম যে,

কারা কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ হীনমনাদের সাহায্যে প্রয়োজনমতো আমাদের অপমান করবে। আমরা যদি পরিবারহীন সৈনিক হতাম তাহলে হয়তো এই অপমান সহনীয় হতো। কিন্তু আমাদের মধ্যে ছিলেন মা, বোন ও সোমত্ত মেয়েরা। প্রাণের বিনিময়ে হলেও এঁদের সম্মান তো রক্ষা করতেই হবে। অতএব, একটি মজবুত সংগঠন একান্ত আবশ্যক।

আগেই বলেছি, আমাদের তিনশ' পরিবারের এই ক্যাম্পটি ছিল তিনভাগে বিভক্ত—এ, বি ও সি। 'এ' বিভাগে ছিল প্রায় শ'দেড়েক পরিবার। 'বি' এবং 'সি' বিভাগে বাকি ১৫০টি। এই বিভাগগুলো কাছাকাছি হলেও কাঁটাতারের বেড়ার সাহায্যে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। প্রত্যেকটির আবার আলাদা গেট ও আলাদা প্রহরী। ডিসপেনসারিটি ছিল 'এ' বিভাগে। 'বি' ও 'সি' বিভাগের রোগীদের অনুমতি নিয়ে যেতে হতো ডিসপেনসারিতে। এই অনুমতি পাওয়া ছিল এক তিক্ত সমস্যা এবং কারা কর্তৃপক্ষের নেহাত মর্জির ওপর নির্ভরশীল। অথচ রাত দুপুরেও কোনো দুর্ঘটনা কিংবা সহসা করে অসুখ ঘটতে পারে এবং ঘটতো। অতো রাতে অনুমতি গ্রহণ ও রোগীর নিরাপত্তা বিধান, বিশেষ করে যদি মহিলা রোগী হতেন, ছিল একটি বড় সমস্যা। দ্বিতীয়ত ছিল স্কুল ও কলেজ সমস্যা। একটি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠাই অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তিন-তিনটি করে বিদ্যালয় তো অসম্ভব ব্যাপার। এজন্য বিভাগগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ প্রয়োজন যাতে ছাত্রছাত্রীরা বাকি দুই বিভাগ থেকে একই স্কুলে আসতে পারে।

এসব বিবেচনা করে ঠিক করা হলো প্রত্যেক বিভাগের কার্যক্রমে একজন বাঙালি কমান্ডার থাকবেন। এই তিন কমান্ডার মিলে এসব কাজের সমন্বয় করবেন। স্বভাবতই প্রথমে কর্তৃপক্ষ বাধা দিয়েছিল; কিন্তু ততোদিনে আমাদের সংগঠন অনেকটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এস বি ও অফিস এবং আরও দশ-বারোজন সিনিয়র অফিসার মিলে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হলো। আমাদের সংগঠনকে সহায়তা করলে প্রতি-সহযোগিতা দেয়া হবে, অন্যথায় যে-কোনো পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের, এইরূপ একটি আভাস পরিষ্কারভাবেই দিলাম কর্তৃপক্ষকে। এও বুঝিয়ে দিলাম যে, বন্দিদের শৃঙ্খলাজনিত বিচারে যদি আমরা মনে করি যে অবিচার হয়েছে তবে আমরা সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ করবো। তাতে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই কর্তৃপক্ষের। বলাবাহুল্য, ভয় দেখানোও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। এতে কিছু কাজ হলো। আমরা কর্তৃপক্ষকে আরও কথা দিলাম যে, বিচার ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার আমাদের ওপর ন্যস্ত করা হলে তার দায়দায়িত্ব আমরাই নেবো। কর্তৃপক্ষ সবাই ছিলেন চাকরিজীবী। গোলযোগ হলে তাঁদের চাকরির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এসব ভেবে তাঁরা রাজি হলেন। ক্যাম্প তিনটির মধ্যে

আন্তঃযোগাযোগের অনেকটা অধিকার আমাদের দেয়া হলো।

'বি' এবং 'সি' বিভাগেই বেশির ভাগ সিনিয়র অফিসার ছিলেন। ক্যাম্প দুটি ছিল পাশাপাশি। 'এ' বিভাগ একটু দূরে। 'বি' বিভাগে একটি মাঠ ছিল। সেখানে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। এর অধ্যক্ষ হলেন শিক্ষা বিভাগের অভিজ্ঞ একজন মেজর। অসাধারণ কর্মোদ্যোগী, স্বার্থহীন ও নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ। তিনি সপ্তাহখানেকের মধ্যে স্কুল ও কলেজ গড়ে তুললেন। শিক্ষক আমরা সবাই। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনেকে এগিয়ে এলেন। মহিলারাও এলেন। শিক্ষকের অভাব নেই। গাছতলায়, মাটিতে বসে ক্লাস। শিক্ষার মাঝে মাঝে মাঠে খেলাধুলা। কলেজের ছাত্রছাত্রী কম। তারা বিভিন্ন বৈঠকখানা ঘরে বেশির ভাগ ক্লাস করতে লাগলেন। বৈঠকখানা ঘরটিতে রাতে বিছানা পাতা হতো—দিনের বেলায় চলতো ক্লাস। অল্প ছাত্র। পিতামাতারাই শিক্ষক, অল্পদিনেই স্কুল-কলেজের মান অবিশ্বাস্য রকমের উঁচুতে পৌঁছলো। ছাত্ররা বলাবলি করতো এমন মানের শিক্ষা তারা আগে কখনো পায় নি।

ডিসপেনসারিটিও একটি উঁচুমানের চিকিৎসালয়ে পরিণত হলো। চিকিৎসকরা বড় বড় বিশেষজ্ঞ এবং তাঁদের হাতে সময়ও অফুরন্ত। ওষুধপত্র অনেক ক্ষেত্রে রোগী নিজে ক্রয় করতেন। যাঁরা অপারগ ছিলেন, তাঁদের জন্য চাঁদা তুলে ওষুধপত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এদিকে আরও একটি সমস্যা দেখা দিলো। শোনা গেল এমন পরিবারও আছে যাঁরা ছেলেপুলেদের দু'বেলা খেতে দিতে পারে না। অতএব, পুনরায় চালু করা হলো সাহায্য কেন্দ্র। ওই অবস্থার মধ্যেও অনেকে যথাসাধ্য অনুদান দিলেন। তখন কেউ জানতাম না কতোদিন, কতো বছর আমাদেরকে এই বন্দিশালায় জীবনযাপন করতে হবে। তাই অনুদান দেয়ার ইচ্ছে থাকলেও অনেকে সাহস পেতেন না সঞ্চিত অর্থ দান করতে। কাজেই অনুদান ছিল অতি অল্পই।

একদিনের একটি ঘটনা এখনও মনে দাগ কেটে আছে। আমাদের বিভাগে একজন সুবেদার ছিলেন। তাঁর সাতজন ছেলেমেয়ে। শুনলাম সে পরিবার প্রায়ই অভুক্ত থাকে। লোক পাঠানো হলো তাঁর কাছে একটি দরখাস্ত করার অনুরোধ জানিয়ে। আমরা অপেক্ষা করছি প্রেরিত লোকটির ফেরত আসার জন্য। লোকটি ফেরত এলো অধোমুখে। হাতে দরখাস্ত নেই। একটু আমতা আমতা করে যা বললো তার মর্মার্থ দাঁড়ায়– সুবেদার সাহেব দরখাস্ত করবেন না। আমরা তিনজন অবাক। কৌতূহলও হলো। সুবেদার সাহেবের বাসা নিকটেই। তাঁকে ডেকে পাঠালাম। তিনি এলেন। অত্যন্ত সৌম্য চেহারার পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তি। মুখে দাড়ি। টকটকে চেহারায় নম্রতা ও ভদ্রতার ছাপ সুস্পষ্ট। অভাবী লোকের যে ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তা থাকে তার কোনো চিহ্ন নেই মুখে। বসতে বলায় বিনীতভাবে বসলেন। জিগ্যেস করলাম, 'কেমন আছেন।' উত্তর, 'ভালো

স্যার।' বললাম, 'শুনলাম আপনি অত্যন্ত অর্থাভাবে আছেন।' তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। বললাম, তবে আপনি একটা দরখাস্ত করুন না। তাঁর উত্তর শুনে আমরা হতবাক। তিনি বললেন, হাদিসে আছে নিজের অভাব-অভিযোগ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বলা ঠিক নয়। মুখ দিয়েছেন আল্লাহ, আহার তিনিই দেবেন। এখন কিছু কষ্ট যাচ্ছে। আল্লাহই উপায় করবেন। বলেই মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

এরপর আমাদের মুখে রা সরার কথা নয়। কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, 'যদি আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা আপনাকে কিছু সাহায্য কিংবা কিছু কর্জ দিই, নেবেন?' অত্যন্ত স্বস্তির সাথে শুনলাম তাঁর উত্তর, 'যদি আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করেন কিংবা ধার দেন তা নিতে মানা নেই। নেবো।' সম্পূর্ণ আল্লাহ নির্ভর (তাওয়াক্কুলুল্লাহ) মানুষের কথা শুনেছি। মনে হলো আজ নিজের চোখে দেখলাম।

আমাদের শোবার জন্য খাটিয়া ছিল; কিন্তু আর কোনো আসবাবপত্র ছিল না। টিনের বাক্সগুলোকে সবাই বসার জন্য ব্যবহার করতেন। দেয়ালের পাশে ওগুলোকে রেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসাই ছিল আরামদায়ক। খাওয়া হতো মেঝেয় বসে পত্রিকার কাগজের ওপরে। খাওয়া শেষে কাগজগুলো পুনরায় ব্যবহারের জন্য যত্ন করে তুলে রাখা হতো। একটি রান্নাঘর—পর্যায়ক্রমে দুই-তিন পরিবারের রান্না চলে সেখানে। ঝগড়াঝাঁটি হওয়ার কথাই—হতোও; কিন্তু বেশি সমস্যা হতো বাথরুম নিয়ে। কারও উদরাময় হলে সমস্যা করুণ আকার ধারণ করতো। কিন্তু এসব ছাপিয়ে যে উৎকণ্ঠার ছাপ ছিল সবার মুখে তা ছিল নিরাপত্তা, বিশেষ করে মেয়েদের আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। এভাবে কতোদিন চলবে?

এপ্রিল মাসে প্রচণ্ড গরম। ছায়ার মধ্যেই ১১৪° ফারেনহাইট। রাতে দেয়াল ও ছাদ থেকে যেন আগুনের হলকা বেরুতো। এখানকার লোক রাতে বাইরে খোলা আকাশের নিচে শোয়। এজন্য বাড়ির পেছনে কিংবা ছাদে জায়গা থাকে। আমাদের অভ্যেস নেই, তাছাড়া এতোগুলো মানুষের শোয়ার জায়গাও ছিল না বাইরে। গরমে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলো। কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলো। তারা এর কোনো সদবিহিত করতে পারবেন না বলে জানালেন। শেষে ঠিক হলো ক্যান্টিনে পাখা রাখা হবে—ছাদ পাখা ও মেঝে পাখা। বন্দিদের তা কিনে নিতে হবে। অগত্যা তাই হলো। বেশির ভাগ পরিবারই একটির বেশি পাখা কিনতে পারে নি। সমস্ত পরিবারের জন্য একটি পাখা; কিন্তু পাখাটি পেয়ে মনে হলো অকস্মাৎ স্বর্গবাস করছি।

আমার কাছে চারটি সাধারণ কম দামি ডেক চেয়ার ছিল। যেহেতু মালের পরিবহনের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না, চেয়ারগুলো আমি নিয়েই

এসেছিলাম। ওর দু'খানা দুই বন্ধুকে ধার দিলাম। নিজে রাখলাম দু'খানা। ওই দু'খানা চেয়ারের জন্য আমার বাসাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রাত দশটায় খাওয়া-দাওয়ার পর কর্নেল (পরে জেনারেল) দস্তগীর আসতেন। এসে বলতেন, 'স্যার, আপনার ঘরের সামনে বসে একটা সিগারেট খাবো। আপনার একটা চেয়ার কিছুক্ষণের জন্য ব্যবহার করতে পারি?' একথা শুনে সজোরে হেসে উঠলেও অন্তরটা কান্নায় ভেঙে পড়তো। সঙ্গে থাকতেন বেগম দস্তগীর। তাঁর আবার পোলিও রোগে ভোগার দরুন ছোটবেলা থেকেই একটা পা অকেজো। তিনি নিচে বসতে পারতেন না। তাঁদেরকে দুটো চেয়ার দিয়ে রোয়াকে বসতাম আমরা দু'জন। অপেক্ষাকৃত সহনীয় তাপে রাত বারোটা পর্যন্ত গল্প চলতো; কিন্তু কখনও কেউ কাউকে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম না। পাকিস্তানিরা আর কী কী অত্যাচার আমাদের ওপর করতে পারে তার কল্পনাই স্থান পেত গল্পে বেশি। তখন খুব গুজব চলছিল যে, পাকিস্তানিরা আমাদের ঘর সার্চ করবে ও অলঙ্কারাদি কেড়ে নেবে। অলঙ্কার হারানোর চাইতে ঘর সার্চের সম্ভাবনার ভয়ে কাঠ হয়ে যেতাম। ঘরে রয়েছে মহিলা ও বয়স্ক মেয়েরা। মনে মনে ভাবতাম কি দোষ করেছিল এসব এককালে গর্বিত সৈনিকরা, বিশেষ করে তাঁদের পরিবারবর্গ, যে তাঁদেরকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে কতগুলো কাপুরুষ আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সৈনিকের মুক্তির জন্য।

মনে পড়ে বন্দিজীবনের শেষের দিকে আমার জনৈক পাকিস্তানি বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনা কতোটুকু? উত্তরে বলেছিলাম, 'অন্যদের কথা জানি না, যারা তোমাদের এই বন্দিশালায় নরকের জীবনযাপন করে দেশে ফিরে যাবে তারা যদি সিদ্ধান্তকারী কোনো ভূমিকায় আসে তবে তোমাদের প্রতি তাদের একটি তীব্র ঘৃণার সম্পর্কই থাকবে। তোমাদের 'মুসলিম মুসলিম ভাই ভাই' আর 'ইসলামি রিপাবলিক অব পাকিস্তান'-এর ভাঁওতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হবে।' শুনে খুশি হন নি আমার বন্ধুটি।

একদিনের ঘটনা। মেজর ওয়াজিউল্লাহ (পরে মেজর জেনারেল) আর মেজর আনিস ওয়াজি (পরে মেজর জেনারেল) প্রথমে তর্কাতর্কি পরে মারামারি করলেন। ওয়াজি হয়তো বেশি মারলেন। ঘটনাটি ঘটলো মাঠে এবং সকলের সামনেই। কোহাট থেকে ট্রেনে আসার সময় নাকি ওয়াজি আনিসের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন। মারামারিটা তারই প্রতিশোধ হিসেবে।

ঘটনার রিপোর্ট হলো কারা কর্তৃপক্ষের কাছে। কর্তৃপক্ষ ওয়াজিকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। ওয়াজি ছিলেন 'এ' বিভাগের বাসিন্দা। তাঁর ওপর হুকুম হলো, শাস্তি হিসেবে তাঁর পরিবারের বাসস্থান 'বি' বিভাগে, সুবেদারদের জন্য

নির্দিষ্ট অর্থাৎ সারভেন্ট কোয়ার্টারে স্থানান্তরিত হবে। ব্যাপারটি আলোচিত হলো আমাদের এসবিও (সিনিয়র বাঙালি অফিসার) অফিসে অর্থাৎ এসবিওর ঘরে। সিনিয়র অফিসাররাও ছিলেন।

শাস্তি দেয়াতে আমাদের আপত্তি ছিল না; কিন্তু এ কি রকম শাস্তি। একজন অফিসারের পরিবার অফিসারদের কোয়ার্টারেই থাকবে। যদিও জেসিওদের কোয়ার্টারের চাইতে অফিসারদের কোয়ার্টার এমন কিছু উন্নত ধরনের ছিল না; কিন্তু প্রশ্নটি নীতিগত। কতো রকম শাস্তিই তো দেয়া যেত। অফিসার জেসিও মিশিয়ে ফেলার এই প্রচেষ্টা কেন? ওরা কি তা হলে বাঙালি সামরিক বাহিনীর কাঠামোগত ও সাংগঠনিক সত্তাকে ভেঙে ফেলতে চায়? এ প্রশ্নই আমাদের মনে বড় হয়ে দেখা দিলো। দু' একজন জেসিওকে ডেকে জিগ্যেস করা হলো। তাঁরাও এরূপ শাস্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। অতএব সিদ্ধান্ত হলো, এই শাস্তির বাস্তবায়ন প্রতিরোধ করা হবে।

বিকেলের দিকে ওয়াজিউল্লাহর পরিবারকে কর্তৃপক্ষের গাড়িতে করে 'এ' বিভাগ থেকে 'বি' বিভাগের গেটের সামনে আনা হলো। আমরা দল বেঁধে আগে থেকেই গেট আটকে দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা বাধা দিলাম। সামরিক বাহিনীর জন্য অনেকটা অভূতপূর্ব ঘটনা। মনে হলো কর্তৃপক্ষ এতোটা আশা করে নি। অনেকটা অবাক হয়ে গেল তারা। কিছুটা হতবুদ্ধিও। আমরা খুব শান্ত ভঙ্গিতে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে আমাদের কথা ও দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিয়ে বললাম। ওরা বুঝলো শক্তি প্রয়োগ ছাড়া কাজ হাসিল হবে না। শক্তি প্রয়োগ করলে কি হবে এ নিয়ে আমাদেরও দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। দুর্বলমনা লোক তো ছিলই আমাদের মধ্যে।

প্রায় আধঘণ্টা কথা কাটাকাটির পরও আমরা নড়লাম না দেখে কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসলো। দীর্ঘ আলোচনার পর ওরা সাব্যস্ত করলো শক্তি প্রয়োগ করা হবে না। ওরা আমাদের দাবি মেনে নিলো। ওয়াজিউল্লাহর পরিবার পুনরায় ফিরে গেল। আমরা স্বস্তির একটি বড় নিশ্বাস ফেললাম। সংগঠিত শক্তির বিজয় হলো দেখে সংগঠনের প্রতিও আমাদের আস্থা প্রচণ্ড রকম বৃদ্ধি পেল; কিন্তু আমরা স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে, এর প্রতিশোধ ওরা নেবেই আমাদের ওপর। আরও দুশ্চিন্তায় দিন কাটতে লাগলো।

অবশেষে সত্যিই একদিন আদেশ এলো যে, আমাদের ঘরবাড়ি সার্চ করা হবে। মেয়েদের দেহ পর্যন্ত সার্চ করা হবে।

এই সার্চের গুজব আমাদের কানে আগেই এসেছিল। শোনার পর আমরা সিনিয়ররা আলোচনায় বসেছিলাম। স্থির হলো বাধা দিতে হবে। এটা আমাদের পরিবারবর্গের সম্মানের প্রশ্ন। পরিণতি যাই হোক না কেন, বাধা দিতেই হবে। কারা কর্তৃপক্ষকে তাই বলা হলো। সার্চ স্থগিত হলো। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে

ঊর্ধ্বতন অফিসের সাথে যোগাযোগ শুরু হলো। শেষে বলা হলো যে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ খবর পেয়েছে যে কে বা কারা বেতার যন্ত্রের সাহায্যে বন্দিখানা থেকে বাইরে সংবাদ পাঠাচ্ছেন। অতএব, এই বেতার যন্ত্রটি উদ্ধারের জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে সার্চ করতে হবে। কি উদ্ভট চিন্তা, বন্দিশালা থেকে এমন কি খবর পাঠানো থাকতে পারে, যা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। তাছাড়া আধুনিক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কোনো বেতার যন্ত্রের সঠিক অস্তিত্ব আবিষ্কার অত্যন্ত সহজ একটি কাজ। পরে বুঝেছিলাম পাকিস্তানিদের আসল উদ্দেশ্য তা ছিল না। আসল লক্ষ্য ছিল আমরা যে বন্দি হয়েও সংগঠিত ছিলাম, সেই সংগঠনটির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া, যাতে আমরা সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ করতে না পারি। অতএব, এটা ছিল আমাদের ওপর একটি তৃতীয় ডিগ্রি পদ্ধতির আক্রমণ; কিন্তু গর্বের বিষয় পাকিস্তানিদের এই পরিকল্পনা সফল হয় নি। কিছু কিছু অফিসার অবশ্য আমাদের প্রতিরোধের পরিবর্তে আত্মসমর্পণের পক্ষে ছিলেন; কিন্তু সংখ্যাগুরু অফিসাররা সংগঠনের পক্ষে ছিলেন।

তবে সার্চ শেষ পর্যন্ত হয়েই ছিল। এবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ছিল একান্তভাবেই অনড়। আমাদের আলোচনা চলতে লাগলো। অবশেষে স্থির হলো সার্চ হবে, কিন্তু কেবল বেতার যন্ত্র দেখার জন্য—অন্য কিছুর জন্য নয়। মহিলাদের ঘরে ঢুকবে কেবল মেয়ে-কারারক্ষীরা এবং তল্লাশি হবে তাঁদের স্বামী/অভিভাবকদের উপস্থিতিতে।

কিন্তু এই চুক্তি ছিল পরম ক্ষমতাবানের সাথে নিতান্ত অসহায়ের চুক্তি। অতএব আমরা সকলে, বিশেষ করে মহিলারা, থাকলাম একরকম দমবন্ধ করেই। চরম অসম্মানের ভয় ছিল আমাদের; কিন্তু তা করা হয় নি। সঙ্গে মেয়ে-কারারক্ষী ছিল। তাই বলে পাকিস্তানের এই পরাজিত সেনাবাহিনীতে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকের অভাব ছিল না। শোনা গেল মরহুম কর্নেল এম আর আর রহমানের বাসা এবং এরূপ আরও দু'এক জায়গায় মেয়ে-কারারক্ষী ও পাক সৈনিকরা মিলে তাঁদের অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নিয়েছে। তবে এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ একান্তই নিষ্ফল হবে জেনে সবাই চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমরা দেশের খবর পেতাম প্রধানত দুই উপায়ে। প্রথমত, রেডিও মারফত। বিবিসি তো ছিলই। তাছাড়া বহু কষ্টে আমরা ঢাকা স্টেশনও ধরতাম। শুনলাম বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানি বন্দিদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করবে। এটা আশানুরূপই ছিল। আর এটাও জানতাম যে, ওখানে বন্দিদের বিচার হলে, এখানেও এরা বেছে বেছে আমাদের কিছু অফিসার, বিশেষ করে সিনিয়র অফিসারদের একটা প্রহসনমূলক বিচারের ব্যবস্থা করবে এবং অনুরূপ শাস্তি দেবে। তার জন্য আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু পরিবারবর্গ

নিতান্ত বিমর্ষ থাকতো।

রেডিওর খবরে জানতে পারলাম, সিমলা বৈঠক হচ্ছে। বন্দি বিনিময় আলোচনা হচ্ছে ইত্যাদি। তাতে কোনো অগ্রগতি হলে আমাদের জুনিয়র অফিসার ও তাঁদের পরিবারবর্গ খুশি হয়ে উঠতো। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি পাকিস্তান-ভারত আলোচনায় অনেকটা অগ্রগতিও হচ্ছিল।

দেশের খবর জানার দ্বিতীয় উপায়টি ছিল চিঠিপত্র। চিঠিপত্র সবই আসতো বিদেশ হয়ে। আমাদের আত্মীয়-স্বজন চিঠি পাঠাতেন বিদেশে কোনো আত্মীয়কে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে চিঠিখানা নতুন লেফাফাতে ভরে আত্মীয়রা পাঠাতেন আমাদেরকে। কারা কর্তৃপক্ষ সেগুলো সেন্সর করে আমাদের দিতো। এই চিঠি আসতে আসতে ২/১ মাস লেগে যেত। আমরাও অনুরূপভাবে চিঠি পাঠাতাম দেশে। এই চিঠিগুলোতে দেশে আমাদের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের খবর থাকতো। কি যে আনন্দ ও স্বস্তি হতো এই চিঠিতে তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়।

কিন্তু দু'একটা চিঠিতে দেশ সম্বন্ধে খারাপ খবরও থাকতো। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হতো না। যেমন, দেশে সন্ত্রাস প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার পর ঢাকা শহর নিরাপদ নয়। এদিকে গ্রামেগঞ্জেও সন্ত্রাস। জনগণের মনে শাসকদলের সদস্যদের প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠছে দিনে দিনে।

বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে দেশবাসী। একটি সোনার বাংলার স্বপ্ন সবার মধ্যেই; কিন্তু একি? রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানাগুলোতে চরম দুর্নীতি ও অদক্ষতার খবর। প্রথমে বিশ্বাস হতো না। পত্রলেখকের ওপরে প্রচণ্ড রাগ হতো। কিন্তু পরস্পরের সাথে আলোচনা করে জানতে পারতাম তাঁদের পাওয়া চিঠিগুলোও একই রকমের খবর দিচ্ছে—দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে। তখন আর অবিশ্বাস থাকে নি। মনটা বর্ণনাতীত খারাপ হয়ে যেত। ভাবতাম একটি আগুনে পোড়া জাতি সোনার মতো খাঁটি হয়ে উঠবে, তার চারিত্রিক উজ্জ্বলতা হবে চোখ ধাঁধানো। চরম অপমান, নির্যাতন ও আত্মাহুতি তার খাদগুলো নিংড়ে নিঃশেষ করে নিখাদ সোনার মতো পবিত্র করে তোলার কথা। এই জাতির নেতৃত্বে আছেন এমন একটি প্রিয় ব্যক্তিত্ব যাঁর অঙ্গুলি হেলনে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ওঠে, বসে, কাঁদে, হাসে, আগুনে ঝাঁপ দেয়। এই শুভ সংযোগ তো সোনায় সোহাগা। সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি জনগোষ্ঠীর পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজন তো মাত্র কয়েকটি বছর। তারপরেই তো জাতির পাখা মেলার কথা। আর এই পুনর্গঠনের পর্যায়ে তো গোটা জাতির মুক্তিযুদ্ধকালীন একাত্মতা ও একাগ্রতা নিয়ে দিনরাত্রি নিবিষ্ট মনে কাজ করার কথা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা। সোনার মাটিতে সোনার বীজ বপন ও সোনার

বাংলা বাস্তবায়নে আত্মনিবেদন করার কথা। সোনার বাংলা বিনির্মাণ তো কোনো তর্কের ব্যাপার নয়, কেবল সময়ের ব্যাপার।

অথচ চিঠিপত্রে যা খবর পাই তাতে মন ভেঙে যাওয়ার কথা। ঢাকার রাস্তায় সন্ধ্যার পর বের হওয়া নিরাপদ নয়? গ্রামেগঞ্জে সন্ত্রাসের বিস্তৃতি? রাষ্ট্রীয়কৃত কলকারখানাগুলোতে লুটপাট—শ্রমিক বিশৃঙ্খলা? অবিশ্বাস্য!

এই খবরগুলোর মধ্যে যেটি সবচাইতে বড় আঘাত দিতো তা হলো শাসকদলের কর্মী-নেতাদের মনোভাব। সবারই নাকি একটা সবজান্তাভাব এবং জনগণের প্রতি অবজ্ঞা ও নিজেদের ব্যক্তিগত উগ্রতা। এসব শুনে মনে হতো সমগ্র জাতিটাই হয়তো দুর্ভাগা।

এদিকে বন্দিজীবনের অপমান ও অসহায়তা। একদিন একজন পাঞ্জাবি সিপাহি এলো বাসায়। খবর পেয়ে বেরিয়ে এলাম। সালাম আদাব তো দূরের কথা, দেখি একটা ভাঙা চেয়ারের ওপর এক পা তুলে দাঁড়িয়ে। তাচ্ছিল্যভরেই বললো, 'ত্যায়নু দফতর বুলায়া।' হঠাৎ রাগ চড়ে গেল মাথায়। উচ্চস্বরে বললাম, 'জওয়ান, ঠিক তরিকাসে খাড়ে হো।' ইতস্তত করছে দেখে আবার চিৎকার। সিপাহি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললাম, 'স্যালুট।' পাঞ্জাবিদের একটি গুণ, শক্ত করে হুকুমদাতার আদেশ পালন করা। সামরিক কায়দায় অভিবাদন করলো। বললাম যে, তোমার দফতরওয়ালা কর্নেল। ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে কখনও কর্নেল সাহেবরা ডেকে পাঠান না। প্রয়োজনবোধে কর্নেলই আসেন ব্রিগেডিয়ারের কাছে। জিগ্যেস করলাম বুঝেছে কিনা। উত্তরে বললো, জি হা বুঝতে পেরেছে। বললাম, 'যাও।' সে অভিবাদন না করেই চলে যাচ্ছিল। ফের চিৎকার, 'স্যালুট।' এতে কাজ হলো। স্যালুট করে সামরিক কায়দায়ই পেছন ঘুরে মার্চ করে গেট পর্যন্ত এগিয়ে উধাও হয়ে গেল।

রাগের মাথায় কাজটা তো করলাম। তারপর ভাবলাম এর প্রতিক্রিয়া আমার জন্য খুব আনন্দদায়ক না হওয়ারই কথা। অপমানের ওপর আর এক দফা অপমান আসার সম্ভাবনা সমধিক। সবার সামনে দিয়ে অস্ত্রবাহী গার্ড দিয়ে আমাকে দফতর পর্যন্ত নেয়া বিচিত্র নয়। যে দু'একজন সহবন্দি ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদেরও মুখ শুকনো। তবে মুখে বললেন, 'ভালোই করেছেন। যা হওয়ার হবে। এরা যখন বাড়াবাড়ি শুরু করেছে তখন চরমেই যাক।' বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম; কিন্তু না। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। পরদিনও না। তার পরের দিনও না। বরং এরপর শিবির কর্তৃপক্ষই কিছুটা নমনীয় হয়েছিল।

কতিপয় পাকিস্তানি অফিসারের মানবিক আচরণ :

বন্দিজীবনে সবাই যে আমাদেরকে কেবল অপমানই করেছে তা নয়। দু'চারজন আমাদের সাথে মানুষের মতো আচরণ করেছে। তাঁদের কথা না বললে কাহিনী একতরফা হয়ে যাবে এবং বিধাতার সর্বোত্তম সৃষ্টি 'মানুষের' চরিত্র সম্যকভাবে চিত্রিত হবে না।

একদিন বসে আছি বসার ঘরে (অর্থাৎ বসা-শোয়ার ঘরে)। হঠাৎ চিৎকার, 'খলিল, খলিল, ইয়ার আপ কিধার হো?' বলতে বলতেই ঘরে ঢুকলেন মেজর আশরাফ। লেফটেন্যান্ট থেকেই আমরা একসাথে চাকরি করেছি। প্রথমে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। তুই তুকারি সম্পর্ক। বহু হাসিকান্নায় দিন কেটেছে একসাথে। শেষের দিকে আমি যখন কর্নেল তখন আশরাফ আমার দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে চাকরি করেছেন। আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। বর্তমানে এই বন্দিশালার ঊর্ধ্বতন হেড কোয়ার্টার্সে চাকরিরত। পরিদর্শন করতে এসেছেন বন্দিশিবিরটি। অর্থাৎ আমাদের ঠাকুরদা, কর্তৃপক্ষের কর্তৃপক্ষ।

এই উচ্চস্তরের অফিসার আশরাফ আমাকে ডেকে না নিয়ে একেবারে আমার ঘরে। আমার ও আমার স্ত্রীর তো চক্ষুস্থির। ততোক্ষণে আশরাফ বসে পড়েছেন। আমার অবাক হয়ে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখ্ কিয়া রাহি হো ভাবি? চায়ে নেই পিলাওগি?' 'জরুর জরুর' বলে উনি চা করতে চলে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'স্যার, বাতাও ক্যায়সে হো?' বলেই একটি পোটলা এগিয়ে দিলেন। আমাদের নেহাত পছন্দের দু'একটি খাবার। দেখে কান্না পেল। সামলে নিয়ে জিগ্যেস করলাম ওঁর ছেলেপুলের কথা, ওঁর স্ত্রীর কথা। বললেন, 'কেউ ভুলতে পারে না রংপুরে আমাদের সেই দিনগুলো।' কিন্তু মেজর আশরাফ সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন বর্তমান ও নিকট অতীত। হালকা কথাবার্তাই চললো, যেমন চলতো পুরনো দিনে। ওঠার সময় আমাকে দাওয়াত দিলেন রাতের খাবার একসাথে খাবেন। জিগ্যেস করলাম, 'কোথায়।' উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। গেটের সামনে কারা কর্তৃপক্ষের অফিসারদের জন্য যে মেস সেই মেসে। বন্দির সাথে কারা কর্তৃপক্ষের একসাথে খাওয়া? নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে কি পাকিস্তানিরা এখন তাদের নীতির পরিবর্তন করছে। দ্বিতীয় চিন্তায় আশরাফের জন্যই ভয় হলো। নিতান্তই পুরনো দিনের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে এসেছেন পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা ও চিরজীবন গ্রামবাসীর মতোই সরল এই আশরাফ; কিন্তু অন্য অফিসাররা তো একে ভালো চোখে দেখবে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তো জানবেই। জানলে আশরাফের ক্ষতি হবে নিশ্চিত। কিন্তু আশরাফ অনেকটা লা-পরোয়া গোছের মানুষ বরাবরই। আমি সজোরেই বললাম, 'না আশরাফ, এটা ঠিক হবে না।

তোমার ক্ষতি হোক আমি চাই না। তোমার স্ত্রী-পুত্র আছে। তাঁরা আমাদের অত্যন্ত প্রিয়।' শেষে অনুনয়ই করলাম; কিন্তু আশরাফ আবেগপ্রবণ হয়ে গেল হঠাৎ। আবেগপ্রবণ হয়ে গেলে দেখেছি লোকে মাতৃভাষা বলে, বিশেষ করে পাঞ্জাবিরা। পাঞ্জাবিতে বললেন, 'তুছি কিঁও ফিকর করদেও। দায়িত্ব আমার। হারামজাদারা এই সুন্দর দেশটা ভেঙে খানখান করে দিলো। ভবিষ্যতে আর কি করবে জানি না। আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না, কতোদিন বাঁচবো জানি না। তোমার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না, আমার মন বলছে। একদিন দুই বন্ধুতে বসে খাবার খাবো না তা কি করে হয়?' তারপর হাত ধরে বললেন, 'চাকরি জাহান্নামে যাক। তোমাকে আসতেই হবে।' আর না করতে পারলাম না।

সন্ধ্যার পর নিজেই এসে নিয়ে গেল। সেখানে মেজর আসালত বসে। মেজর আশরাফের মতো মেজর আসালতের সাথেও আমি বহুদিন চাকরি করি ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এবং আমরা তাঁকেও আমাদের একজনই ভাবতাম। কিন্তু তিনি ছিলেন আশরাফের একেবারেই উলটো—প্রতিহিংসাপরায়ণ। আমাদের বর্তমান বন্দি অবস্থা তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য ব্যাপার ছিল। তাঁর চাইতে সিনিয়র ও সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙালি অফিসারদের তাঁর হুকুমে চলতে হয়, তাঁর কাছে হাত পাততে হয়, এ ছিল তাঁর কাছে যেন বিধাতার আশীর্বাদ। তাই তিনি জুনিয়র অফিসারদের, খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও কটুকাটব্য করতে তৎপর ছিলেন ও প্রায়শই অপমান করতেন। আমরা তাঁকে ঘৃণা করতাম। আসালত, মনে হতো বহু আশা করে বসে থাকতেন যে ইস্ট বেঙ্গলের কোনো বন্দি অফিসার তাঁকে এসে কোনো ব্যাপারে মিনতি করুক। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণ হয় নি। ইস্ট বেঙ্গলের অফিসাররা কেউ কোনোদিন তাঁর কাছে যায় নি। 'সিনিয়র বাঙালি অফিসার' নামক সেই সংগঠনই আমাদের আত্মসম্মান অনেকটা বাঁচিয়েছে।

মেসে গিয়ে দেখলাম আসালত ছাড়া আরও দু'একজন ক্যাপ্টেন আছেন; কিন্তু কর্নেল রেজা নেই। রেজাই ছিলেন ক্যাম্পের অধিনায়ক। ক্যাডেট জীবনে আমার ছ'মাসের সিনিয়র। পাকিস্তান জাতীয় দলের কৃতী হকি খেলোয়াড়। সকলেই নামে চেনে। অতবড় খেলোয়াড়—তাই খেলোয়াড়সুলভ ভদ্রলোক। আমাদের ভাগ্য ভালো। ওঁ না থাকলে আসালতের (২য় অধিনায়ক) অত্যাচারে হয়তো আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যেত।

ভালো খাবার পরিবেশন করা হলো। বোঝা গেল খরচ আশরাফের। কথাবার্তা শুরু হলো। আশরাফ একাই বলছিলেন কথা। একবার আসালত যুদ্ধ ইত্যাদি ও ক্যাম্পের বিষয়ে কি যেন বলতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আশরাফ, 'তু চুপ কর। হামে বাতেঁ করনে দে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার সুনাও। বাল বাচ্চোঁ কি পড়াই তো বরবাদ হুয়ি হোগি, ইস ক্যাম্পে মে।'

আসালত আবার বলে উঠলেন, 'না এরা বড় সংগঠিত। নিজেরাই পড়াশোনা করিয়েছেন বাচ্চাদের।' পুনরায় আশরাফ ক্ষেপে উঠলেন, বললেন, 'তোমাদের মতো অফিসারদের পাল্লায় পড়ে এরা কেমন ছিলেন আমি অনুমান করতে পারি।' আরও যেটা বলতে যাচ্ছিলেন তা হয়তো এই যে, এই আসালতদের মতো লোকদের দ্বারাই এমনি আত্মধ্বংস সাধিত হয়েছে, এই আসালত শ্রেণীর লোকদের হাতেই আজ সামরিক বাহিনী তথা পাকিস্তান। এখানে আশরাফ শ্রেণীর লোকদের স্থান নেই, ভবিষ্যৎও নেই। কিন্তু মুখ ফুটে কথাগুলো বললেন না আশরাফ। আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এই বুঝি একটি সংঘর্ষ বেঁধে ওঠে; কিন্তু না, মানবতার নৈতিক শক্তি পশুসুলভ দৈহিক শক্তির চেয়ে শক্তিমান। আসালত চুপ করে গেলেন। ক্যাপ্টেনদ্বয় শুনছিলেন। অনেকক্ষণ গল্প হলো। মাঝে মাঝে আসালতকে দু'একটা গালাগালি দেয়া ছাড়া আর তিক্ততা কিছু হয় নি।

শেষের দিকে মেজর আসালত কিছুটা নমনীয় সুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনারাও তো আমাদেরকে তেমনভাবে আপন করে নেন নি।' তখন উত্তর আশরাফের, 'কেন আমার তো তেমন মনে হয় নি। খলিল, মশহুর, সালাহউদ্দিন এরা তো আমার আপন ভাইয়ের চেয়ে কম ছিল না। কি খলিল, তাই না?' আমি ধীর কণ্ঠে বললাম, 'ভালোবাসাতেই ভালোবাসার জন্ম দেয়। শ্রদ্ধাই শ্রদ্ধার জন্ম দেয়। আসালত, তুমি যদি আমাকে আন্তরিকভাবে ভালোবেসে থাক, তবে এটা সম্ভবই না যে আমি তোমাকে ভালোবাসবো না। তবে পাকিস্তানের বর্তমান ও অতীতের সমস্যা ভিন্ন। সামরিক শাসন যেকোনো দেশের জন্যই দুর্ভাগ্যজনক। যদি সামরিক শাসন না থাকতো, যদি গণতন্ত্র থাকতো তবে পাকিস্তান ভাঙতো না বলেই আমার বিশ্বাস। ভাঙার দরকার হতো না।' '৭০-৭১ সালে গণতন্ত্রের একটি সুযোগ এসেছিল; কিন্তু সামরিক শাসন ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়লো। মানুষের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালো না। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তোমার হয়তো এমন কোনো দোষ নেই। তোমরাও দাবার ঘুঁটি ছাড়া কিছু নও। আমার বিদায়ী শুভেচ্ছা তোমাদের প্রতি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর। নইলে তোমার বর্তমান পাকিস্তানও টিকবে কিনা সন্দেহ। আমার কথাগুলো আসালত বুঝবে আমি আশাও করি নি। তবে আশরাফকে সান্ত্বনা দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

বাসা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিলেন আশরাফ। চলে যাওয়ার আগে উষ্ণ আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। কয়েক বছর পরে শুনেছি আশরাফ মারা গেছেন।

কেবল আশরাফ একাই নন, আরও পাঞ্জাবি অফিসার আমাদের খবর নিয়েছেন। মারী পর্বতের অধিবাসী মেজর আশফাক আমাদের সিনিয়র ছিলেন ১ম ইস্ট বেঙ্গলে। বাহ্যিকভাবে কঠোর প্রকৃতির লোক আশফাক। আলসেমি

সহ্য করতে পারতেন না। বাইরে-ভেতরে প্রতি ইঞ্চি একজন সৈনিক। অধস্তন সৈনিকদের ত্রুটির জন্য যেমন করতেন গালাগালি, তেমনি কৃতিত্বের জন্য করতেন সোহাগ। বাঙালি সৈনিকরা স্বভাবগতভাবেই গালাগালি অপছন্দ করতেন। তবে আশফাক এবং আশফাকের মতো দু'একজনের গালাগালি এরা সহ্য করতো। কারণ কোনো বিপদ-আপদে পড়লে কিংবা অনিচ্ছাপ্রসূত দোষ করে অনুতপ্ত হলে নিজের কোম্পানির লোকদের পক্ষ হয়ে আশফাক ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সেখানে তিনি সূক্ষ্ম ন্যায়বিচারের ধার ধারতেন না। তাঁর অধস্তন সৈনিক হলেই হলো। তার জন্য তিনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন। নিজের চাকরিটি বিপন্ন করে হলেও। এরকম লোককে সৈনিকরা কেন, সবাই পছন্দ করে থাকে।

একবার কোয়েটার পাকিস্তান পদাতিক স্কুলে একজন পাঞ্জাবি হাবিলদার প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। বেয়নেট (সঙিন) চার্জ শিক্ষা। একজন বাঙালি সৈনিক (ইস্ট বেঙ্গল নয়, পদাতিকও নয়) অপটুতা দেখাচ্ছিল। আসলে তাঁর সংস্থাপনায় তাঁকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়েই পদাতিক স্কুলের উচ্চতর কোর্সে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। সে অবস্থায় যেকোনো পাঞ্জাবি কিংবা পাঠানও অনুরূপ অথর্বের মতোই বেয়নেট চার্জের নমুনা দেখাতো; কিন্তু ছেলেটির দুর্ভাগ্য যে সে বাঙালি। তাই পাঞ্জাবি হাবিলদার শিক্ষক তাঁকে বাঙালি বলে গাল দিলো ও স্বভাবজাত কাপুরুষতার ইঙ্গিত দিলো। অদূরে দাঁড়িয়ে অলক্ষ্যে ক্যাপ্টেন আশফাক তাই শুনে গর্জে উঠলেন, 'দেখ সুয়োর দা পুত্রা, ম্যায় ভি বাঙালি' বলেই কাঁধে 'ই বেঙ্গল' লেখা ধাতব চিহ্নটি দেখালেন। 'তু বাঙালি নু বুজদিল সামঝা? ম্যায় দেখাতাহু বাঙালি কিয়া চিজ হ্যায়, ক্যায়সা শের দা পুত্রা হ্যায় বাঙালি।' এই বলে উচ্চকণ্ঠে মাঠের অন্য প্রান্তে প্রশিক্ষণরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন বাঙালি সিপাহিকে নাম ধরে ডাকলেন, 'ছালাম, ইধার আও, দৌড়কে আও।' সামনে আসতেই বললেন রাইফেলে বেয়নেট ফিট করতে। হাবিলদারকেও বললেন তাঁর রাইফেলে বেয়নেট ফিট করতে। দু'জনকে দাঁড় করালেন দু'দিকে। বললেন, 'হাবিলদার এবার খড়ের বস্তায় বেয়নেট চার্জ করার মহড়া নয়, তাজা সিনায় বেয়নেট চার্জ। দেখবো কে বাঘের বাচ্চা। ছালাম, এই শুয়োর তোমার অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভাইকে বাঙালি বলে গাল দিয়েছে। তুমি ওর বুকে তোমার বেয়নেট বসিয়ে দাও। চার্জ।' সকলেই বুঝলো রাগের মাথায় ক্যাপ্টেন আশফাকের দিগ্বিদিক জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। সবাই এসে দাঁড়ালো মাঝখানে। অনেক কাকুতি-মিনতি করে আশফাককে থামালো। তারপর ঠিক হলো জ্যান্ত টার্গেট নয়, খড়ভরা বস্তা দিয়েই প্রদর্শনী ম্যাচ হবে বাঙালি ও পাঞ্জাবির। তাই হলো। ছালাম প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে এসেছে এই কোর্সে। আশফাক তাঁকে চিনতেন ও তাঁর

দক্ষতার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল তাঁর। ছালাম অপূর্ব দক্ষতা ও বিক্রমে আক্রমণ করলো টার্গেট। তার তুলনায় হাবিলদারের দক্ষতা নেহাতই মধ্যম। সকলে একবাক্যে ঘোষণা করলো ছালামের বিজয়। হাবিলদার লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে। আশফাক বললেন, 'মাফি মাঙ্গ ও বাঙালি কুল (নিকট)।' হাবিলদার মাফ চাইলো। বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতীক তিনি কাঁধে পরেছেন ও টুপিতে লাগিয়েছেন। তাঁর সামনে বাঙালি সৈনিককে গালাগাল! কোনো ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাপার নয়। ন্যায়শাস্ত্র পড়েছেন বলে মনে হতো না তাঁকে দেখলে। তার ধারও ধারতেন না তিনি।

মেজর আশফাক অবসর নিয়ে এখন থাকেন মারী পর্বতের গায়ে। তাঁর নিজস্ব গ্রামে। একমাত্র ছেলে এখন ক্যাপ্টেন। বেশ কয়েকজন মেয়ের পর সর্বকনিষ্ঠ এই ছেলে। ঘোড়াগলি পাবলিক স্কুলের ছাত্র ছিল। বাপের মতোই সুশ্রী চেহারা। মারী পাহাড়ের পাকা কমলালেবুর মতো গায়ের রঙ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে; কিন্তু বাবার মতো উগ্র নয়, খুব ভদ্র ও নম্র। হঠাৎ আমার বন্দিবাসায় এসে হাজির। উর্দি পরেই। পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত লাজুকভাবে বললো, 'চাচা আমি এখানে আপনাদের কয়েকজনকে দেখতে এসেছি। আব্বাই বলে দিয়েছেন আসতে। নিজেই আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি অসুস্থ, ভ্রমণ করা নিষেধ। এই ক্যাম্পে আমার পোস্টিং হয়েছে শুনেই তিনি বললেন, আপনাদের কয়েকজনকে ও চাচি আম্মাদের সালাম করে যেন চাকরি শুরু করি। আর যেন আপনাদের দেখাশোনা করি।' আমার চোখটা ছলছল করে উঠলো। সামলে বললাম, 'দেখাশোনার তেমন দরকার নেই (অর্থাৎ তুমি জুনিয়র ক্যাপ্টেন হিসেবে আমাদের কোনো উপকারেই আসতে পারবে না)। তবে তোমার আব্বা-আম্মাকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলো যে, আমরা তাঁদের কোনো দিন ভুলবো না।'

ছেলেটা চলে গেল। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম মানবতা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার নয়।

আমার সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা হয় নি, কিন্তু কর্নেল খিজির হায়াত একদিন দেখা করে গেছেন আমাদের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে। বন্দিশিবিরে আসা ও বন্দিদের সঙ্গে দেখা করা নিশ্চয়ই সহজ ছিল না ওদের পক্ষে। চাকরিতে ক্ষতির আশঙ্কা ছিল সমূহ। তদ্‌সত্ত্বেও কর্নেল খিজির হায়াত এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। খিজির হায়াত ছিলেন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার, প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন লে. কর্নেল ও চতুর্থ বেঙ্গলের অধিনায়ক। আখাউড়া অঞ্চলে ছিল ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল। ২৬ মার্চের পর সেই উত্তাল ও ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে স্বভাবতই মেজর খালেদ মোশাররফ নিজের অধিনায়ককে বন্দি করতে বাধ্য হয়েছিলেন; কিন্তু

হত্যা করেন নি। হত্যা করা সহজ কাজও ছিল না হয়তো। খিজির হায়াত সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ভালোবাসতেন ইস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটি সৈনিককে। আগেই বলেছি, ভালোবাসা ভালোবাসার জন্ম দেয়। সৈনিকরাও অত্যন্ত সাদাসিধা, খোদাভক্ত সৎ মানুষটিকে ভালোবাসতো। অতএব, খালেদ মোশাররফও হয়তো বিপদেই ছিলেন এই পুণ্যাত্মাটিকে নিয়ে কি করবেন তাই ভেবে। অবশেষে তিনি তাঁকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেন। প্রায় বছরতিনেক বন্দি থাকার পর বন্দি বিনিময়ের সময় খিজির হায়াত দেশে ফেরেন। কালক্ষেপণ না করেই তিনি এসেছিলেন আমাদেরকে দেখতে, খোঁজ-খবর নিতে। সবকিছু সত্ত্বেও বাঙালির ওপর তাঁর কোনো আক্রোশ ছিল না।

মানবতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় না।

সাধারণ বেসামরিক পাঞ্জাবিদের মনোভাব :

শেষের দিকে যখন বন্দিদের মুক্তি দেয়া শুরু হয়ে গেছে, তখন আমাদের অনুমতি দেয়া হতো ২/৪ জন করে বাজারে যেতে অর্থাৎ মন্ডি বাহাউদ্দিন বাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে আনতে। ক্যানটিনে ছিল যেমনি গলাকাটা দাম, তেমনি ছিল বহু জিনিসের অপ্রাপ্যতা। বাজারটি ছিল মাইলখানেক দূরে। বাজারে সাধারণ লোকজনের সাথে কথা হতো। ওরা প্রায়শই বলতো, 'যা যা হয়েছে ভেতরের ব্যাপার, আমরা কিছুই জানতাম না। এতোদিনে আমরা কিছু কিছু জানতে পারছি। আপনাদের ওপর (অর্থাৎ বাঙালিদের ওপর) অনেক অন্যায় করা হয়েছে। আমরা আন্তরিকভাবেই দুঃখিত।' আমরা বলতাম, '১৯৭১ সালে যখন ঘটনাগুলো ঘটছিল তখন জানতে পারো নি কেন?' উত্তরে কেবলি বলতো, 'আমাদের জানতে দেয়া হয় নি।' ওদের সাথে তর্ক করে লাভ নেই জানতাম। এও জানতাম যে ওরা জানতেও চায় নি। কোথায় ১২০০ মাইল দূরে কোনো অজানা বাঙালিদের ওপর এদের সৈনিকরা কি অত্যাচার করছিল এ খবরে তাদের উৎসাহও ছিল না।

পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে ছিল এক হাজার মাইলের ব্যবধান। মাঝখানে বিশাল একটি দেশ ভারত। পাকিস্তান নামক উদ্ভট দেশটির জনসাধারণের মধ্যে তেমন যোগাযোগ ছিল না। তাছাড়া জাতিগতভাবে, ভাষা ও সংস্কৃতিতে, দুটি অংশে যে মানবগোষ্ঠীদ্বয় বাস করে তারা পরস্পর থেকে একেবারেই ভিন্ন। সর্বোপরি দেশে ছিল না গণতন্ত্র, ছিল সামরিক শাসন অর্থাৎ পাঞ্জাবি শাসন। প্রচার মাধ্যমগুলো সামরিক শাসনের যাঁতাকলে আবদ্ধ। এ অবস্থায় কিই-বা আশা করা যায় এই সাধারণ লোকের, বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের

কাছ থেকে। ২/৪ জন যাঁরা বাইরের রেডিও যেমন বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা শুনতো তারা হয়তো জানতো কি হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও অনেকেই মনে করতো যে সামরিক অপারেশনে তো এটা হয়েই থাকে। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের যে রাজনৈতিক প্রত্যাশা অর্থাৎ স্বাধিকার—না হলে স্বাধীনতা, এ কথাটা প্রায় কেউ বুঝতো না বললেই হয়। তবে ব্যাপারটার গুরুত্ব তাঁদের মন প্রথম অনুধাবন করে যখন তাঁরা শুনলো যে, ভারতীয় সৈন্যের হাতে তাদের পাঞ্জাবি সৈন্যদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে এবং দেশটা ভেঙে গেছে।

সামরিক শাসকরা একটি বছর ধরে সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে কয়েকটি ব্যাপারে এদের মগজ ধোলাইয়ের প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং অনেকটা সক্ষমও হয়েছে। তা হলো, বাঙালিরা বিহারিদের ওপর অত্যাচার করেছে, বাঙালিরা ভারতের প্ররোচনাতে পাকিস্তান ভাঙতে চায়, অতএব তারা গাদ্দার (দেশদ্রোহী) এবং পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় ও পূর্ব পাকিস্তানে নব্বই হাজার অজেয়দের চরম কাপুরুষসুলভ আত্মসমর্পণ, হঠাৎই পাকিস্তানের জনসাধারণকে করে তুলেছে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। এই প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ ও বাঙালি বলে একটি জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে এদের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল। তবে এদের কারো ভেতরেই সত্যিকার জানার ইচ্ছা ও উদগ্রীবতা ছিল বলে আমার মনে হয় নি। এদের মধ্যে আমি বারো বছর বাস করেছি। সে সূত্রে আমার ধারণা, এরা আজও আসল সত্য জানে না এবং জানার খুব ইচ্ছেও তাঁদের নেই।

তবে হ্যাঁ, এদের মধ্যে ব্যতিক্রম নেই তা বলবো না।

এই সময় বাংলাদেশ বেতার আমাদের বন্দিদের জন্য একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও অভিনব প্রোগ্রাম চালু করলো। সন্ধ্যায় একটি সময়ে দেশে আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা আমাদের উদ্দেশ্যে বাণী পাঠাতেন। 'আমরা ভালো আছি, আমি অমুক বলছি, অমুক তুমি কেমন আছো, তোমাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে' ইত্যাদি। কোনো কোনো দিন প্রখ্যাত শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীরের স্বর ভেসে আসতো তাঁর সাবলীল পৌরুষসুলভ ভঙ্গিতে, 'খলিল ভাই, আমি সম্রাট বলছি (জাহাঙ্গীর নামের বদৌলতে আমি ওঁকে সম্রাট বলে ডাকতাম, এখনও ডাকি)।' 'সম্রাটে'র কোনো সাম্রাজ্য ছিল না আর প্রাসাদের পরিবর্তে ছিল দু'খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরার একটি বাড়ির ক্ষুদ্র একটি অংশ, যা একটি প্রাসাদের হাস্যকর তুলনাও নয়। কিন্তু সম্রাটের ছিল একটি সম্রাট-প্রমাণ হৃদয় এবং একটি সম্রাজ্ঞী-প্রমাণ অর্ধাঙ্গিনী, অতুলনীয় অতিথিপরায়ণা। বেতার প্রোগ্রামের পরপরই আসতেন আশপাশের বন্ধু-বান্ধব, জানাতেন 'অভিনন্দন'। জিনিসটা অভিনন্দন পাওয়ার উপযুক্ত বটেই। সুদূর স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে আপনার নাম ধরে কেউ স্মরণ করছে। বাংলাদেশ তখনও আমাদের জন্য স্বপ্নের

দেশ। কবে কিংবা আদৌ যাওয়া হবে কিনা, রক্তমণ্ডিত সবুজ পতাকাটি দেশের মাটিতে উড্ডীন দেখবার অন্তিম সৌভাগ্য হবে কিনা এ সন্দেহ পুরোপুরি ছিল সবার মনে। প্রতিদিন অনেক পরিচিতজনের নাম শুনতাম বেতার তরঙ্গে ও 'আপনাদের স্মরণ করছি' প্রোগ্রামে। অনাবিল আনন্দে ভরে যেত মন।

সম্রাট ও তাঁর স্ত্রী আনিস উভয়ে ছিলেন রাওয়ালপিণ্ডিতে আমাদের প্রতিবেশী। ছবি আঁকায় তাঁর জুড়ি ছিল না ওই সময় পিণ্ডিতে। সেই সুবাদে কেউকেটা সবার সাথে দোস্তি। সম্রাট ও আনিস ছিলেন আতিথেয়তার প্রতীক। বিকেলে তাঁদের বাসার ছোট অলিন্দে বসে আনন্দ ভোজ ও পান আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদেরকে কোনো বন্দিশিবিরে যেতে হয় নি। জাহাঙ্গীর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কাবুল হয়ে পালিয়ে আসেন ১৯৭২/৭৩ সালে।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

অক্টোবর ১৯৭৩ থেকে শুরু হলো বন্দিদের প্রত্যাবর্তন। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের ব্যবস্থাপনায় উড়োজাহাজে করে দেশে ফেরা। ফেরত পার্টির তালিকা করতো পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ। সে তালিকা অনুযায়ী বন্দিরা প্রস্তুত হতো দেশে ফেরার জন্য। আমাদের মন্ডি বাহাউদ্দিন বন্দিশিবির থেকে বন্দিদের যেতে হতো রেলপথে লাহোর। সেখানে ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান এবং তারপর প্লেনে ঢাকা।

মুক্তি বিলম্বিত আমাদের তিন পরিবার

অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত বেশির ভাগ বন্দি বাংলাদেশে চলে গেলেন। আমাদের শিবির প্রায় খালি হয়ে এলো। একে একে সিনিয়র অফিসার ও তাঁদের পরিবারবর্গও চলে গেলেন। অধীর আগ্রহে আমার পরিবারের সবাই দিন গুণছিল; কিন্তু না, আমার নামটি আর আসে না। আমি বললাম, শেষ তালিকায় তো থাকবেই নাম—এতো চিন্তা কিসের? কিন্তু একটা অজানা অনিশ্চয়তা মনকে অভিভূত করতে লাগলো। শেষ পর্যন্তও আমার নাম এলো না। আমাদের 'বি' বিভাগে একমাত্র আমার পরিবার। ভয় পেয়ে গেলাম। মুখ শুকিয়ে গেল। তবে বিকেলে আরও দুটি পরিবারকে অন্য বিভাগ থেকে এনে আমার পাশে ব্রিগেডিয়ার মজিদুল হক কর্তৃক ছেড়ে যাওয়া বাসা ও তার পরের বাসাটিতে রাখা হলো। তাঁরা ক্যাপ্টেন (ডাক্তার) আবু বকর সিদ্দিক এবং ক্যাপ্টেন হারেস। কিছুই বুঝতে পারলাম না। ছেলেমেয়েদেরও কাঁদকাঁদ অবস্থা। বড়দের মুখ কালো; কিন্তু হারেস ও আবু বকরের পরিবারের অবস্থা দেখে আঁতকে উঠলাম। ভয়ে, দুশ্চিন্তায় ওরা উদ্ভ্রান্ত। সন্ধ্যা হয়ে এলো। চারদিক নিস্তব্ধ। একটু দূরে রাস্তায় একটি টিমটিমে বাতি। চারদিক অন্ধকার। স্বল্প আলোকে দেখা যায়

ওখানকার সান্ত্রী পোস্ট। যতো রাত বাড়ে ভয়ও ততো বাড়ে। ক্যাপ্টেনদ্বয়ের দুটি করে ছোট বাচ্চা আর ঘরে তরুণী স্ত্রী। আমরা তিন পরিবার ছাড়া এখানে কেবল ওই সান্ত্রীরা। আশপাশে আর কোনো বসতিও নেই, লোকজনও নেই। এখানে আমাদেরকে মেরে-কেটে ফেললেও কেউ দেখার নেই। শত চিৎকার করলেও কেউ শোনার নেই। ভয়ে রাতে কেউ ঘুমোতে পারলো না। পুরুষরা বাইরে পায়চারি করে বেশির ভাগ রাত কাটিয়ে দিলাম। মনে মনে একমাত্র সান্ত্বনা এসে উঁকি দেয়—হয়তো কাল সকালে আমাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আদেশটি আসতে পারে।

কিন্তু না, পরদিনও কোনো খবর নেই। ক্যাপ্টেনরা সান্ত্রীদের কাছে গেল খবর নিতে। না, ওরাও জানে না। তবে এখন পাহারা আরও কড়া। আমাদের ওপর হুকুম বাড়ির আঙিনা ছেড়ে এক পাও বাইরে না যাওয়া। বোঝা গেল আপাতত আমাদের মুক্তির কোনো আশা নেই। কেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না। ক্যাপ্টেন দু'জন কথায় কথায় ওদের মনের সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ওদের মনে হয় আমাকে বিচার ও শাস্তির জন্য রাখা হয়েছে। ওদের জিগ্যেস করলাম যে, ওঁরা এমন কিছু কি করেছেন যার জন্য বিশেষ করে তাঁদের দু'জনকে আমার সাথে আটকে রেখেছে। তাঁরা পরিষ্কার করেই বললেন, ক্যাম্পে আসার আগে এবং ক্যাম্পে আসার পরে এমন কিছু ঘটে নি যার জন্য তাঁদের দু'জনকে বেছে বেছে আটকে রাখতে পারে। তবে তাঁদের মনে হয় যে আমাকে অর্থাৎ একলা একটি পরিবারকে আটকে রাখলে কেমন খারাপ দেখায় বিধায় বাইরে একটি স্বাভাবিকতার প্রলেপ লাগানোর জন্য তাঁদের দু'জনকে রাখা। কথাটা খুব অযৌক্তিক মনে হলো না।

বিচার ও শাস্তি দেয়ার জন্য আমাকে আটকে রাখার ব্যাপারটা পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে যৌক্তিক হতেও পারে। একাত্তর সালে বেশ কয়েকজন বাঙালি অফিসার পলায়ন করেছিলেন, যাঁরা পলায়নের আগে আমার বাসায় এসেছেন। কর্তৃপক্ষ সেটা জানতো। এছাড়া আমার পলায়নের প্রচেষ্টা বিশেষ করে, মেজর জিয়াউদ্দিন ও তাহেরের পলায়নের সমস্ত ব্যাপারটা ওরা তদন্ত করেছে। মেজর মনজুরের পলায়নের পর শিয়ালকোট থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাকে টেলিফোনও করেছিল যে, এ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি কিনা। আমি উত্তরে বলেছিলাম, কোথায় শিয়ালকোট আর কোথায় পিণ্ডি। আমি কি করে জানবো? তখন উত্তর অপর প্রান্ত থেকে কিছুটা কঠিন গলায় বলা হয়েছিল, হ্যাঁ, তবে অনেক বাঙালি অফিসারই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। তাই কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনার তো জানার কথা। ওরা যে আমার ওপর চোখ রাখছে একথাটা বলাই উদ্দেশ্য ছিল সেদিন। বুঝেছিলাম ভালো করেই। এসব ঘটনার চাইতেও বড় একটা কারণ ছিল আমাকে বিচার করার। কর্নেল তাহের যিনি

আমার বাসা হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, তিনি নাকি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে নাকি সবিস্তারে ও অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে আমাদের পালানোর ষড়যন্ত্রটির উল্লেখ করেছিলেন। পরে দেশে ফেরার পর তাহের আমার হাত ধরে মাফ চেয়ে বলেন, 'স্যার, আবেগের বশবর্তী হয়ে লিখেছিলাম। পরে বুঝলাম আপনার ক্ষতি করেছি।'

আগেই বলেছি, বেছে বেছে আমাদের কিছু অফিসারের প্রহসনের বিচার করা হতে পারে। কিন্তু এদিকে যাঁদের বিচার করার কথা ছিল যেমন জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসার, সকলকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, সকলে এখন বাংলাদেশে। সিমলা চুক্তি ততোদিনে হয়ে গেছে। বন্দি বিনিময়ের চুক্তিও হয়ে গেছে। আমাকে একা বিচার করার তো কোনো যৌক্তিকতা বোধগম্য হয় না। মনে মনে এসব ভাবছি আর আমার সামনে তখন বসা দুই অফিসার ও তাঁদের পরিবারবর্গ এবং আমার পরিবারের লোকেরা। ওদের দিকে তাকানো যায় না। ভবিষ্যতে কি বিচার-আচার হবে, কি শাস্তি হবে সে দুশ্চিন্তা তাদের তেমন বেশি ঘায়েল করতে পারে নি। ঘায়েল করেছে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দৈহিক নিরাপত্তা, বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তা। এ ভয়টি যে কেমন তা ভুক্তভোগী ছাড়া কারো সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা হয়তো সম্ভব নয়। এইভাবেই কাটল আরেকটি দিন। আরেকটি রাত্রি, আরও একটি দিন-রাত্রি।

ব্রিগেডিয়ার রহিমের আবির্ভাব

বিকেলবেলা বসে আছি ঘরের বাইরের রৌদ্রে। নভেম্বরের শেষ। তীব্র শীত। হঠাৎ গেটের সান্ত্রীরা খটখট শব্দ করে সামরিক কায়দায় একসাথে সাবধান, অস্ত্র উত্তোলন ও অভিবাদন করলো। বুঝলাম কর্নেলের উপরস্থ পদবির কোনো অফিসার এসেছেন। অভিবাদনের পরে গেট খুলে গেল। পরনে বেসামরিক শীতবস্ত্র, মাথায় পাঠানি টুপি ও হাতে ছড়ি নিয়ে কেবল একজন লোক এগিয়ে আসতে লাগলেন আমার বাসার দিকে। কাছে এলে ভালো করে তাকিয়ে দেখে চিনতে পারলাম, ব্রিগেডিয়ার মিয়া ফজলুল রহিম। এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। মনে দুশ্চিন্তা থাকলেও মুখে হাসি ধরে রাখার প্রচেষ্টা। রহিম কিছুটা দ্রুততার সাথে এগিয়ে এলেন, অত্যন্ত উষ্ণ ও সরব অভিবাদন—প্রথমে হাত মেলানো, পরে আলিঙ্গন, প্রয়োজনের চাইতে বেশিক্ষণ ধরে। 'খলিল, ইয়ারা ক্যায়সে হো? ভাবি কিধার হ্যায়, বাল বাচ্চেঁ ক্যায়সে হ্যাঁয়?' এতো কথার উত্তর দেয়ার কোনো চেষ্টাই করতে পারলাম না। ভাবছি কি ব্যাপার, ততোক্ষণ রহিম আমাকে ছেড়ে আমার বসার ঘরে ঢুকে পড়েছেন, মুখে হাঁকডাক 'ভাবি, ভাবি

কিধার হ্যাঁয় আপ।' বলাবাহুল্য, সেই উচ্চ ডাকে আমার স্ত্রী বেরিয়ে এলেন, রহিমকে দেখে বললেন, 'রহিম ভাই, আপনি কি করে? এখানে?' উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, 'দেখুন না ভাবি, সবই ভাগ্যের ব্যাপার। তা না হলে, এই অকালকুষ্মাণ্ড মন্ডি বাহাউদ্দিনে, যার নামও কোনোদিন শুনি নি, আপনারা তো আরও শোনেন নি, সেখানে আমাদের এই অবস্থায় দেখা হবে? ওসব থাক, আপনি কি আমাকে এক পেয়ালা চাও খাওয়াবেন না?' বলেই হঠাৎ মুখটা কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে গেল রহিমের। চিন্তান্বিত স্বরেই প্রশ্ন করলেন, 'চায়ের বন্দোবস্ত আছে তো?' তা আছে শুনে রহিম বসলেন আমাদের ওই চেয়ারগুলোর একটিতে। মুখে বললেন, 'সবই ভাগ্য (মুকাদ্দর), ভাবি।' ক্ষণিকের তরে হলেও আমরা ভুলে গেলাম বর্তমান। কোনো অজানা মুহূর্তে চলে গেছি আমরা পূর্ববর্তী জীবনে। এই বাঙালি, এই পাঠান, এই পাঞ্জাবি, এই বালুচি, সবাই একসাথে ছিলাম, ভাইবোনও হয়তো ছিলাম একদিন; কিন্তু এই পাকিস্তানিরাই হয়ে গেছে এখন বর্বরতার প্রতীক, মানুষ নামের কলঙ্ক।

রহিমের চা খাওয়া ও কুশল বিনিময়ের ফাঁকে একবার জিগ্যেস করলাম, তিনি এখানে কেন? উত্তরে বললেন, আমাদের খালি করা ক্যাম্পে একটি ব্রিগেড আসার পরিকল্পনা হয়েছে। সেই ব্রিগেডটির অধিনায়ক হয়ে এসেছেন রহিম। বাসস্থান নির্ধারণ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি প্রাথমিক কাজগুলো করার জন্য তিনি অগ্রগামী হিসেবে এসেছেন একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে। উঠেছেন আমাদের 'বি' বিভাগের সর্ববৃহৎ বাড়িটিতে। বাড়িটি অদূরে। এসে জানতে পারলেন এখানে এখনও তিনটি পরিবার আছে। আমার নাম দেখে আর দেরি করেন নি। সাক্ষাতের জন্য তিনি ছুটে এসেছেন। স্বভাবতই জানতে চাইলাম, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা। জানেন না। তবে আশ্বাস দিলেন জেনে বলবেন। পরদিন রাতে তাঁর বাসায় অর্থাৎ ফ্লাগ স্টাফ হাউসে আমার পরিবারসহ দাওয়াত। বলতে চাইলাম ও আকারে-ইঙ্গিতে বললামও যে, আমরা তো বন্দি, বাড়ির আঙিনা ছেড়ে আমাদের এক পা বাইরে যাওয়ারও আদেশ নেই। উত্তরে একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে ও কয়েকটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে রহিম যা বললেন তার অর্থ হলো যে, তিনি এই বেজন্মাদের (কর্তৃপক্ষ) খবর জানেন না এবং জানতেও চান না। তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন এবং আমাদের যেতে হবে। অনেক কথা আছে। যাওয়ার সময় আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাবি, জরুর আইয়ে গা, ঔর বাচ্চোঁ কো লেতে আইয়ে গা।'

রহিম চলে গেলেন। আমার হুঁশ পুরোপুরি ফেরত আসার আগেই শুনি, 'স্যার, কি ব্যাপার?' ক্যাপ্টেন দু'জন ও তাঁর পরিবারবর্গ স্বভাবত এতোক্ষণ দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলেন দেয়ালের আড়ালে। তাঁদের আলিঙ্গন করে আশ্বস্ত করলাম। বললাম যে, আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সুখবর নেই; কিন্তু

যেটা সত্যিকারের সুখবর সেটা হলো আমাদের দৈহিক নিরাপত্তা। এখনও আমরা বন্দি, কিন্তু অসহায়, নিরাপত্তাহীন বন্দি নই। এখন থেকে আমরা হিসাবের খাতায় উঠেছি। বলাবাহুল্য, অফিসারদের পরিবারবর্গ সে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছিল।

পরদিন বিকেলে বাক্স থেকে কিছু শীতবস্ত্র বের করে, ইস্ত্রি করে নিজেদের যতোটা সম্ভব গ্রহণযোগ্য করে তোলা হলো। এ কাপড়গুলো পাকিস্তানে থাকা অবস্থায় আমরা পরবো ভাবি নি। রহিম একা থাকেন। তাঁর পরিবার এখনো এখানে আসে নি। অনেক গল্পসল্প হলো। রহিম জানালেন তাঁর ভগ্নিপতি একজন মেজর, ই পি আরে চাকরি করতেন। তিনি এখন বন্দি। তাঁর বোন ও ভাগ্নে-ভাগ্নিরা অত্যন্ত চিন্তিত তাঁর জন্য। তিনি কি অবস্থায় আছেন কে জানে, বলেই দীর্ঘ নিশ্বাস নিলেন রহিম। একটু পরে বললেন, 'আচ্ছা খলিল, বন্দিজীবন কেমন?' এর উত্তর দু'এক কথায় কি দেয়া যায়? একটু চিন্তা করে বললাম, 'সংক্ষেপে এর উত্তর দেয়া কঠিন। মনে কর তুমি একজন ব্যক্তি ছিলে, তোমার একটি সত্তা ছিল। হঠাৎ একদিন তুমি সত্তাহীন, কেউ নও হয়ে গেলে (ইউ হ্যাভ বিন রিডিউস্‌ড্ টু নাথিংনেস)। রাস্তার কুকুরটাকেও তোমার ঈর্ষা করতে ইচ্ছে করে। অনেকটা সেই রকমই লাগে।' কতোক্ষণ অধোমুখে বসে থেকে রহিম অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। আমাদের চাকরি জীবন। কি করে পাঁচশ' অফিসারের প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় প্রথম তিনজনের মধ্যে স্থান পেয়ে আমরা দু'জনে বিদেশি স্টাফ কলেজে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাই, পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে একসাথে চাকরি, সামরিক স্কুল পি এম এ-তে একসাথে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। উঠবার সময় টুপি ও ছড়িটা হাতে নিয়ে আমাদের সাথে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এসে শুভ রাত্রি কামনা করে বিদায় নিলেন। যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, প্রতি বিকেলে যেন আমি তাঁর বাসায় যাই এবং চা খাই। অনেক গল্প নাকি আছে আমার সঙ্গে। প্রতিদিন না হলেও প্রায়শই যেতাম রহিমের বাংলোয়।

গল্প হতো নানা বিষয়ে। হঠাৎ একদিন বললেন, 'পাকিস্তান তো ভেঙে গেল। এখন তোমার কি মনে হয় আমাদের পাকিস্তান সম্বন্ধে? এই পাকিস্তান কি টিকবে?' রহিম ছিলেন একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি। ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলেন আর পড়াশোনা করতেন প্রচুর। ওঁকে মনের কথা খুলে না বললে ওঁ সেটা বুঝতে পারবে এবং গল্প আর জমবে না। তাই আন্তরিকতার সঙ্গেই বললাম, 'দেখ একটি অভিন্ন জাতিসত্তা গড়ে ওঠে নি এরকম একটি রাষ্ট্র তোমাদের এই পাকিস্তান। মোটামুটি চারটি জাতি নিয়ে গঠিত পাকিস্তান। ইসলাম ধর্মই একমাত্র যোগসূত্র। ভাষা ও সংস্কৃতির ফারাক অনেক। এই জনগোষ্ঠীকে অভিন্ন জাতিতে পরিণত করার একমাত্র রাস্তা অবাধ গণতন্ত্র, যেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতি নিজের স্বাধিকার নিয়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীতে একীভূত হতে পারবে।

যেমনটির প্রচেষ্টা চলছে ভারতে। প্রায় পঁচিশোর্ধ্ব জাতিকে একমাত্র গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার শক্তি দিয়ে, ব্যক্তির মর্যাদাকে গোষ্ঠীর মর্যাদার ওপরে স্থান দিয়ে ভারতীয় নামে, একই সঙ্গে বায়বীয় এবং বাস্তব, একটি জনগোষ্ঠীতে, এক জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। সাত-আটটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তার অগ্রগতিও হয়েছে দর্শনীয়।'

'পাকিস্তানে তো গণতন্ত্র নেই। অদূর ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও এখানে ক্ষীণ। কারণ তোমাদের রয়েছে প্রয়োজনাতিরিক্ত সামরিক বাহিনী। আবার এই সামরিক বাহিনী প্রধানত এসেছে একটি প্রদেশ থেকে এবং প্রদেশটি একক বৃহত্তম পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের সামরিক ও বেসামরিক এলিট শ্রেণী কিছুতেই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে সায় দেবে না। অতএব, আপাতত সামরিকতন্ত্র পাকিস্তানে অবধারিত। আর এই সামরিকতন্ত্র এখানে থাকলে এখানকার চার জাতি কখনো এক হবে না। ধর্মের দোহাই যে এসব ব্যাপারে চলে না তা তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এটাও প্রমাণ হয়ে গেছে যে, সমগ্র জনগোষ্ঠীকে এক ধর্মের খোলসের মধ্যে ভরে তাকে মার্শাল ল' নামের বাহ্যিক চাপে পিষ্ট করে পিটিয়ে-পাটিয়ে একীভূত করে এক অভিন্ন জাতি গঠনের প্রচেষ্টার পরিবর্তে, ধর্মনিরপেক্ষতার মুক্ত হাওয়ায় ব্যক্তিমর্যাদার কর্ষণ অভিন্ন সত্তা উৎপাদনে অনেক বেশি ফলপ্রসূ; কিন্তু এরূপ প্রয়াস তোমাদের পাকিস্তানে দূরঅস্ত। অতএব, আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশান্বিত নই।'

মনে হলো রহিম কথাগুলো একটি একটি করে গিললেন। আমার ভয় ছিল হয়তো তিনি সাধারণ 'মনহীন' সামরিক অফিসারের মতো আমাকে ভাববেন পাকিস্তানের শত্রু এবং ইসলামের শত্রু। কিন্তু না, চিন্তাশীল রহিম অনেকক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, 'জান খলিল, আমারও সেই ভয়। তবে দোয়া করো আমরাও যেন তোমাদের মতো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও লালন করতে পারি।' হায় বিধি, তখন কি জানতাম আমাদের গণতন্ত্র কতোটা ভঙ্গুর ও কতোটা ক্ষণস্থায়ী হতে যাচ্ছে! সত্যি বলতে কি তখন ভাবি নি এবং জানতামও না যে চাইলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক মানসিকতা, সহনশীলতা ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল উন্নত মন। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর এসব গুণের চর্চা আমাদের দেশে হয় নি, হওয়ার সুযোগও ছিল না। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রীয় কর্ণধাররাও যেমন গণতন্ত্রের প্রতি আশানুরূপ নিষ্ঠাবান ও তার বাস্তবায়নের জন্য সুদক্ষ ছিলেন না। ফলত, অদক্ষ শাসনের ফলে একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। এদিকে দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল পরাজিত শক্তি তাদের কালো হাত নিয়ে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যক্তিমর্যাদা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে, তাদের

অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে নিশ্চিহ্ন হবে, এ সত্য তারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতো। অতএব, তারা তথাকথিত ধর্মরক্ষার যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিমর্যাদার মহান সত্যকে বলিদান দিতে সচেষ্ট হলো এবং সফলও হলো ১৯৭৫ সালে, মাত্র সাড়ে তিন বছর পরেই। আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠিত হলো সামরিকতন্ত্র যার একমাত্র, একনিষ্ঠ সহায়ক শক্তি ছিল সত্য হননকারী ও জ্ঞানপাপী, মধ্যযুগীয় ও মানবতাবিরোধী মৌলবাদী শক্তি। ফলত, পরের দীর্ঘ পনেরো বছরের বাংলাদেশ, পাকিস্তানের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে ভিন্ন কিছু সত্তা ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে (কথাটি পূর্ব অধ্যায়েও বলা হয়েছে), বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এই সুখবরটি শুনে প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত ও আফগানিস্তানে আপাত নির্বাসিত গফফার খান বলেছিলেন যে, এই উপমহাদেশে বাংলাদেশই গণতন্ত্র অনুশীলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা রাখবে। অতীত ও বর্তমানের গণতন্ত্র অনুশীলনের বাস্তবতা সত্ত্বেও আমি ব্যক্তিগতভাবে আশাবাদী যে, গফফার খানের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হবে বাংলাদেশে। কিন্তু তার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোনো অবদান থাকবে না, শতকরা একশ' ভাগ অবদান থাকবে বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের। কারণ এই মানুষই স্বাধীনতা এনেছে, এই মানুষই নিজের হাতে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করবে এবং এই মানুষই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র সংরক্ষণ করবে। এর আলামত আজকে ২০০৪ সালেও প্রতিভাত হতে শুরু করেছে।

রহিমের সাথে প্রায়শ আলোচনাতে এসব বিষয় বিশেষ স্থান পেত। আমাদের এখনও বন্দিশিবিরে আটকে রাখা হয়েছে কি উদ্দেশ্যে, তার সদুত্তর তাঁর কাছে আমি পাই নি। হয়তো রহিম জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে বলেন নি। শুধু বলতেন, একটু ধৈর্য ধর, তোমরাও যাবে। নভেম্বরের শেষ থেকে আমরা তিনজন বন্দিশিবিরে। অবশেষে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আদেশ এলো আমাদেরও মুক্তির। অন্তরের অন্তস্তল থেকে রহিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা রওনা হলাম রেল স্টেশনে। রহিম কি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দীর্ঘ মাসেক সময় ধরে তিনি আমাদের তিনটি বাঙালি পরিবারের সদস্যদের কতোটা মানসিক স্বস্তি দিতে পেরেছিলেন।

ঢাকার পথে লাহোর

ট্রেনে আমরা লাহোর পৌঁছলাম ২২ ডিসেম্বর সকাল এগারোটায়। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা; কিন্তু আমাদের মনের অবস্থা এই শ্রেণী বিশ্লেষণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। মুক্তির হাওয়া বইছিল আমাদের মনের আকাশে। কিন্তু একি?

লাহোরের স্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষমাণ আমেরিকায় নির্মিত বিশাল একটি শেভ্রলে স্টাফ কার। অদূরে দাঁড়িয়ে একজন ক্যাপ্টেন। আমার পরিবারের জন্য রয়েছে আলাদা ভদ্রোচিত গাড়ি। আমার গাড়ির দু'দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সিপাহি। চৌকস অভিবাদন গ্রহণান্তে গাড়িতে বসলাম। ভাবছিলাম কোথায় যাবো আমরা। জিগ্যেস করি নি। জিগ্যেস করার প্রবৃত্তিও ছিল না। গাড়ি গিয়ে থামলো অফিসার্স ক্লাবে। যে ক্যাপ্টেনটি আমাদের নিয়ে এসেছেন স্টেশন থেকে তিনি জানালেন যে, বিকেলে আমাদের দাওয়াত জি ও সির (জেনারেল অফিসার কমান্ডিং) ফ্লাগ স্টাফ হাউজে। আর দুপুরবেলা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আলতাফ কাদের। ইনি আমার অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ অধিকর্তা ছিলেন তুরস্কে আনকারার সেন্টো (CENTO) হেড কোয়ার্টার্সে। তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন যে, পুরনো দিনের খাতিরে হলেও আমরা যেন বাংলাদেশে ফেরার পথে তাঁদের সাথে একবার দেখা করে যাই। তিনি নাকি অনেকদিন ধরেই বারবার ফোন করছিলেন আমার খোঁজে।

জেনারেল আলতাফ কাদেরের কথা আলাদা। জিওসি'র বাড়িতে দাওয়াত, এমন সুদৃশ্য স্টাফ কার, চাকরিরত ব্রিগেডিয়ারের মতো সম্মান প্রদর্শন, এসবের অর্থ কি? উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। পরে বুঝেছিলাম উদ্দেশ্য। কথায় বলে, নাটকের শেষ দৃশ্যটাই মনে রেখাপাত করে বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। 'মনবিহীন' (মাইন্ডলেস) সাধারণ পাঞ্জাবি অফিসাররা হয়তো ভেবেছে যে, শেষ মুহূর্তের ভালো ব্যবহার বোধহয় আমাদের সুদীর্ঘ কারাজীবনের পশুসুলভ জীবনযাত্রা ভুলিয়ে দেবে অবলীলাক্রমে। তাই এই ভালো ব্যবহার দিয়ে বিদায়।

দুপুরবেলা আমরা গেলাম জেনারেল আলতাফ কাদেরের বাসায়। বাসাটি তাঁর নিজের এবং লাহোর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। ১৯৬৬ সাল থেকে অবসর নিয়ে এই বাসাতে আছেন স্বামী-স্ত্রীতে। খুব ভালো লাগছিল যেতে। আনকারায় থাকতে উভয়ে অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমাদের। বিশেষ ঘনিষ্ঠও ছিলাম। আনকারায় তিনি ছিলেন পাঁচ দেশের (আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তান) পাঁচজন লে. জেনারেলের অন্যতম। আর মেজর হিসেবে আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র স্টাফ অফিসার। অন্যান্য দেশের কয়েকজন করে অফিসার ছিলেন তাঁদের জেনারেলকে সাহায্য করতে; কিন্তু পাকিস্তান ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য মাত্র একজন অফিসারকে সাহায্যকারী হিসেবে রাখতো। দেশে ফেরার আগে এঁদের সঙ্গে দেখা হবে ভাবি নি।

তাঁর রীতি অনুযায়ী আমার স্ত্রীকে গাড়ির দরজা খুলে অভিবাদন করলেন জেনারেল সাহেব। তিনি অত্যন্ত মার্জিত ভদ্রলোক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্য ব্যবহার তাঁর স্বভাবজাত। তিনি স্যার আবদুল কাদেরের দ্বিতীয় পুত্র। প্রথম পুত্র

প্রখ্যাত আইনজীবী মনজুর কাদের, যিনি খ্যাত হয়েছেন আইয়ুব খানের মন্ত্রী হিসেবে। আলতাফ কাদের পণ্ডিত ও সুলেখক বলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আনকারা থাকতে যখনই তিনটি রিজিওনাল দেশের (তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তান) জেনারেলগণ আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যকে চাপ প্রয়োগ করার জন্য একত্র হতেন, তখন প্রস্তাবনার খসড়া লেখার ভার পড়তো আলতাফ কাদেরের ওপর। ওই রকম সুলিখিত খসড়া আমি খুব কম দেখেছি।

প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর জেনারেল সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হালিল বে, (তুর্কি ভাষায় 'খ' উচ্চারণটি নেই বলে, ওরা 'খ'-কে 'হ' বলে। সে সূত্রে আমার নাম ছিল হালিল আর জেনারেল সাহেব আমাকে সেভাবেই সম্বোধন করতেন) তুমি ১৯৬৬ সালে আমার আনকারার বাড়িতে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলে। তখন তোমার কথার তেমন গুরুত্ব দিই নি। পরে সেগুলো আক্ষরিক অর্থেই এতো তাড়াতাড়ি এতো সত্যি হবে জানতাম না।' তাঁর কথায় ছেদ টেনে বেগম আলতাফ বলে উঠলেন, 'আলতাফ, সেদিন আমরা একটি ভুল করেছি। খলিলের কথাগুলো রেকর্ড করে রাখা উচিত ছিল। কেমন মজা হতো, তাই না?' আমি এক দারুণ লজ্জাকর ও বিব্রতকর অবস্থায়। জেনারেলের আমার প্রতি স্নেহ বরাবরই পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট। মনে পড়ে তিনি যে আমাকে বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট (এসিআর) দিয়েছিলেন তা পড়েও আমার কান গরম ও চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। কোনোক্রমে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলাম, 'আপনি অত্যন্ত সদয়।' খটাখট জবাব, 'না, এসবই তোমার প্রাপ্য।'

ভাবছি কি বলব, জেনারেল আবার বললেন, 'এবার তোমাকে বলতে হবে, কি হলো আমাদের দেশটিতে আর কেন হলো। আরও বলতে হবে ভবিষ্যতে কি হবে। এবার আমি তোমার কথা লিখে রাখবো।' এদিকে আমার কেবল ভাসাভাসা মনে আছে আনকারায় সেদিন কিসব বলেছিলাম; কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী? কি বলেছিলাম?

বললাম, 'স্যার, আমি তো কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করেছি বলে মনে পড়ে না।' বললেন, 'বাহ, তুমি বলো নি যদি পাকিস্তান সরকার এই এই কাজগুলো না করে তবে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে? বলো নি?'

ধীরে ধীরে মনে পড়ছিল কথাগুলো। তাছাড়া ওঁরা দু'জনে আমার স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতেও সাহায্য করছিলেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি জেনারেলের। ঘটনার কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ না দিলে পাঠক বুঝতে পারবেন না।

১৯৬৬ সালের একদিন অফিসের পর আনকারায় আমার নিজের বাসায় ফিরে এসেছি। জেনারেল কাদেরের টেলিফোন, 'হালিল বে, তুমি আজ সন্ধ্যায় কি করছো? যাই করো না কেন এবং যেকোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টই থাকুক না

কেন, তোমাকে আমার বাসায় আসতে হবে।' জেনারেলের স্বকীয় গুণে তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল। ঠিক ঊর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক নয়। ঠাট্টা করে বললাম, 'এটা কি সামরিক আদেশ?' 'না, আদেশ নয়, তবে তোমাকে আসতে হবে এবং এখানেই খাবে এবং তুমি একা (অর্থাৎ স্ত্রী নয়)।' বললাম, 'কি ব্যাপার, স্যার?' 'ব্যাপার কি সেটা এলে জানতে পারবে। তবে সন্ধ্যাটা চিত্তাকর্ষক হবে আশা করেছি' বলে টেলিফোন রেখে দিলেন।

যথাসময়ে জেনারেলের বাসায় পৌঁছে দেখি সেখানে ওঁর সাথে বসে আছেন জেনারেল ওমরাও খান (পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন জি ও সি), পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরামর্শক গিয়াসউদ্দিন আহমদ আর পাকিস্তান বিমানবাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান। পরিচয়ের পর জেনারেল কাদের বললেন, 'এঁর কথাই তোমাদের বলছিলাম। এঁর কাছে অনেক খবর পাবে বলে আমার বিশ্বাস। খলিল, জানোই তো ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর আমাদের বন্ধু দেশগুলো পাকিস্তানের প্রতি নারাজ হয়েছে ও সাহায্য বন্ধ করতে চাচ্ছে। এই অসন্তুষ্টির কারণগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও অন্যতম। এঁরা এসেছেন এসব বিষয়ে বন্ধু রাষ্ট্রদেরকে পাকিস্তান সম্বন্ধে অবহিত করতে, বিশেষ করে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ কেন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সেটা বোঝাতে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি জানাতে। তা পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে তুমিই তো ভালো জানো। বলো এঁদেরকে।' তারপর একটি পানীয় ধরিয়ে দিয়ে ওঁদের সামনে আমাকে বসিয়ে দিলেন।

কিছুই বুঝতে পারলাম না এঁরা কি জানতে চান পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে। তাছাড়া পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে চাকরি করে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। কথায় কথায় মুখ খোলার সমূহ বিপদ সম্বন্ধে আমরা বাঙালিরা কেউই অনবগত নই। কঠোর পরিশ্রমের চাকরি। অধিকর্তা সবাই অবাঙালি। ক্ষমাশীল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, সহানুভূতিশীলদের সংখ্যাও হাতে গোনা যায় (আলতাফ কাদের অবশ্য ব্যতিক্রম)। কাজেই সাবধান হলাম। বললাম, 'কি জানতে চান পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে—রাস্তাঘাট, চলাচল, নাকি অন্য কিছু।' জেনারেল কাদের সরাসরি এলেন প্রশ্নটিতে, 'এরা জানতে চান শেখ মুজিব যে ছয় দফা দাবি দিয়েছেন সে সম্বন্ধে। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের মধ্যে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে বা হচ্ছে বলে তুমি মনে করো।'

একে তো রাজনীতি বিষয়ক প্রশ্ন, তার ওপর চরম সংবেদনশীল বিতর্কিত বিষয়। প্রমাদ গুণলাম। ঠিক করলাম এই প্রশ্নের ধারেকাছেও যাবো না এঁদের সামনে। জেনারেল একা হলে হয়তো বলতাম যা জানি। এঁদের কাছে বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বোকার মতো মুখ করে বললাম, 'স্যার, আমি রাজনীতির 'র'ও বুঝি না। তাছাড়া দেশছাড়া প্রায় দু'বছর। পত্রিকাও পাই না তেমন। কাজেই আমি দুঃখিত যে এ ব্যাপারে আমি একেবারেই অজ্ঞ।' আগন্তুক তিনজন

আমার কথা বিশ্বাস করলেন মনে হলো এবং একটু নিরাশ হলেন।

কিন্তু আলতাফ কাদের দমবার লোক নন, কারণ তিনি আমাকে ভালো করেই চিনতেন। পরম স্নেহভরে বললেন, 'হালিল বে, এঁরা একটা জিনিস জানতে চান। আর তুমি বিষয়টা সম্বন্ধে জানো। আমি জানি, তুমি জানো এ সম্বন্ধে। বলতে তো কোনো দোষ দেখি না আমি।' কথায় অনেকটা অনুনয়ের সুর। মনটা নরম হলো। আর ভাবলাম, এরা উচ্চতম পর্যায়ের নীতিনির্ধারক ও সিদ্ধান্তকারী দল। যদি কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে বলা যায় যথা, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সত্যিই সত্যিই কি চায়, আর যদি এঁরা সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন তবে একজন সত্যিকারের বাঙালি হিসেবে তো আমার বলাই উচিত। তাতে পাকিস্তানের ও পূর্ব পাকিস্তানের দুয়েরই মঙ্গল। তবে হ্যাঁ, এরা যদি 'মনবিহীন' সাধারণ পাকিস্তানি হয়ে থাকে তবে আমার কথাটার উলটো অর্থই করবে। আমাকে পাকিস্তানের দুশমন ভাববে এবং আমার ভবিষ্যৎও হবে ফকফকে। কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। জেনারেল আলতাফ কাদেরের মুখের দিকে তাকালাম। নিঃশঙ্ক চিত্ত ও আশান্বিত একটি মুখ। নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলাম। বললাম, 'প্রশ্ন করুন, যা বুঝি ও যা জানি বলার চেষ্টা করবো।' তাঁদের প্রশ্ন ছয় দফার আসল তাৎপর্য কি, শেখ মুজিব আসলে কি চান? পাকিস্তানকে কি ভাঙতে চান? এটা কি রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল নয়? সাধারণ বাঙালিদের কি এর প্রতি সমর্থন আছে?

যথাসম্ভব গুছিয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। বললাম, 'দেখুন, ছয় দফা কি তা আমি পত্রিকায় পড়েছি। সে সম্বন্ধে আমি মোটামুটি বুঝিয়ে বলতে পারি। আমি জানি সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনারা তিনজনেও পড়েছেন। কিন্তু শেখ সাহেবের আসল উদ্দেশ্য কি, তিনি পাকিস্তানকে ভাঙতে চান কিনা, এসব প্রশ্ন শেখ মুজিবকে করাই সর্বোত্তম পন্থা। তিনি কিংবা তাঁর অন্তরঙ্গ লেফটেন্যান্ট ছাড়া তো অন্য কারও তাঁদের মনের কথা জানার কথা নয়।' এ সময় আলতাফ কাদের বাধা দিয়ে বললেন, 'ছয় দফা সম্বন্ধে আমি অতো গভীরভাবে জানি না। এই দাবির প্রভাব কি কি হতে পারে সে সম্বন্ধে আমি আরও কম জানি। খলিল, তুমি তোমার নিজস্ব চিন্তাধারা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলো না কেন?'

বুঝলাম আলতাফ কাদের নিজে ব্যাট ধরেছেন। বল করতেই হবে। ভণিতামূলক বল দিয়ে তাঁর মনে আঘাত দেয়া যাবে না। কারণ তিনি তা বুঝতে পারবেন। তখন শান্ত কণ্ঠে ছয় দফার পুনরাবৃত্তি করলাম। মাঝে মাঝে কিছু ব্যাখ্যাও দিলাম। শেষে বললাম যে, এই ছয় দফার একটি পটভূমিকা আছে। এই পটভূমিকাটি হলো ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এই কথা শুনে তিন আগন্তুক যেন নড়েচড়ে বসলেন। মনোযোগ আরও তীক্ষ্ণ করলেন।

বললাম যে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিজস্ব কোনো প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না। বস্তুত পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল, নিতান্তই ভারতের দয়ার ওপর নির্ভর করে। তবে ভারত সত্যি সত্যি দয়া দেখিয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে নি। আমি তো জানি, এখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও জানে যে আপনাদের প্রতিরক্ষা পলিসি হলো, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তান দখল করেও নেয়, নিক। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের একটি বড় খণ্ড দখল করে নেবে। তারপর অস্ত্রবিরতির পর আবার বিজিত ভারত ভূখণ্ডের সাথে বিনিময় করা হবে পূর্ব পাকিস্তানের। অত্যন্ত চমৎকার একটি চিন্তা। কিন্তু সামান্য একটু মন খুলে চিন্তা করলে চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভারতীয় সিপাহিরা পূর্ব পাকিস্তান জয় করবে। ইচ্ছামতো আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করবে। আমাদের সম্পদ, ঘরবাড়ি লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করবে, তাদের পদাঘাতে আমাদের সমস্ত সত্তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এদিকে আপনারাও পদানত ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুরূপ আচরণ করবেন এবং তা দিয়ে আমার বোনের ধর্ষণের কথা ভুলে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হবো। এ অত্যন্ত উত্তম কথা; কিন্তু এই ব্যাপারহি দেখা হোক দৃশ্যটা একটু পালটে দিয়ে। ধরুন পাকিস্তানের প্রধান প্রতিরক্ষা শক্তি থাকলো পূর্ব পাকিস্তানে। আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা দিল্লি না হোক এলাহাবাদ পৌঁছে গেলাম যুদ্ধ করে। দিল্লি থরথর করে কাঁপতে লাগলো এবং জোড়হাতে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ভারত হাজির হলো। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষ করে পাঞ্জাবের সবটা ভারতীয় সিপাহিরা দখল করে নিলো এবং ধর্ষণ ও লুটপাট যথারীতি সম্পন্ন হলো, তারপর অস্ত্রবিরতি ও ভূখণ্ড বিনিময়। এই চিত্রটা কেমন লাগছে আপনাদের?' আমি প্রশ্ন করলাম ওই তিন আগন্তুককে।

আলতাফ কাদেরের মুখ ফ্যাকাসে। তিনজনের একজন বললেন, 'তোমাদের ভূখণ্ডের অতো গভীরতা নেই অর্থাৎ তোমাদের অংশ ছোট, দ্বিতীয়ত পাকিস্তানিরা সামরিক দক্ষতায় জগদ্বিখ্যাত। পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে কি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা বাস্তব?'

উত্তরে বললাম, 'পাঞ্জাবিদের সামরিক দক্ষতা বর্তমানে আমাদের অজানা নয়। মাতৃভূমি রক্ষার্থে নিযুক্ত কিছু কিছু পাঞ্জাবি ব্যাটালিয়ন ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে অপারগ হয়ে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পশ্চাদপসারণ করেছে। অনেকেই পালিয়ে গেছে; কিন্তু আপনারা জানেন পাঞ্জাবের 'পবিত্র' ভূমি রক্ষার্থে বেদীয়ান সেক্টরে নিযুক্ত হয় প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সিনিয়র টাইগার্স নামে খ্যাত। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্য ব্যাটালিয়ন (মোট চারটি মাত্র) পূর্ব পাকিস্তানেই ছিল। পার্শ্ববর্তী কোনো কোনো

পাঞ্জাবি ব্যাটালিয়ন পিছু হটে গেলেও প্রথম বেঙ্গল ছিল অটল। ডজনখানেক শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করে এই বাঙালি, আপনাদের কাছে 'নন-মার্শাল' জাতিগোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা গঠিত ব্যাটালিয়ন, প্রথম বেঙ্গল। বহু ক্ষয়ক্ষতি হয় ভারতীয় আক্রমণকারীদের। ফলত, প্রথম বেঙ্গলকে প্রদান করা হয় ১৭টি সামরিক পদক। অন্য কোনো পাকিস্তানি ব্যাটালিয়ন এতোসংখ্যক পদক পায় নি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে। অতএব, সামরিক দক্ষতায় পাঞ্জাব অদ্বিতীয় একথা আর কেউ না হোক, বাঙালি সিপাহি বিশ্বাস করে না। এটা তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণও করেছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

তারপর রইলো ভৌগোলিক গভীরতা ইত্যাদি। আপনারা বলবেন যে, উভয় পাকিস্তানকে রক্ষা করার মতো যথেষ্ট শক্তি পাকিস্তান আর্মির নেই। এর জবাবে আপনাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রশ্ন যে, সমরবাহিনীর জন্য ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ আসে পূর্ব পাকিস্তান হতে অথচ তা ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায়। পূর্ব পাকিস্তান রয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। এটা কেমনতর ন্যায়শাস্ত্র? শেখ মুজিব ঠিক এই প্রশ্নটি রেখেছেন সবার সামনে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সামনে। এক্ষেত্রে কোন ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে তাঁকে কি দোষ দেয়া যায়? আপনারাই বলুন। যদি শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিজস্ব একটি প্যারামিলিটারি ফোর্স ছয় দফায় অন্তর্গত করে থাকেন তাঁকে কি দোষ দেয়া যায়?'

ওমরাও খান দু' বছর পূর্ব পাকিস্তানে জি ও সি ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে তাঁর বেশ ভালো জ্ঞান। উল্লেখ্য, বায়তুল মোকাররম নির্মাণের প্রধান উদ্যোগী তিনিই ছিলেন। এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের অনেকের কাছে পরিচিত ও প্রিয়ও ছিলেন। তিনি বললেন, 'ছয় দফার বাকি দফাগুলো গ্রহণ করলে তো পূর্ব পাকিস্তান অনেকটা স্বাধীন হয়ে যায়। এটা কি বাস্তব?'

উত্তরে বললাম, 'পাকিস্তানে যদি গণতন্ত্র থাকতো, তা হলে ছয় দফার প্রয়োজন পড়তো না। তখন হয়তো একজন বাঙালিই হতেন প্রধানমন্ত্রী। আর না হলেও কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের গুরুত্ব থাকতো অর্ধেক অর্থাৎ অলঙ্ঘনীয়। কোথাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে পূর্ব পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক অসমতা (ডিসপ্যারিটি) সেটাও আস্তে আস্তে কমে আসতে বাধ্য হতো। চাকরির ক্ষেত্রে (সেনাবাহিনী সমেত) যে অসমতা তাও কমে আসতো; কিন্তু সামরিক একনায়কতন্ত্রে তো তা সম্ভব নয়। আর অবস্থাদৃষ্টে যা মনে হচ্ছে এই সামরিকতন্ত্র পাকিস্তান থেকে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই।'

এ সময় ওমরাও খান প্রশ্ন করলেন, 'তা হলে বর্তমানে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রকে তুমি গণতন্ত্র বলতে চাও না?' প্রশ্নটি শুনে আমি হেসে

ফেললাম; কিন্তু দেখি ওমরাও খান ব্যতীত বাকি তিনজনের মুখেও হাসি। কাজেই ওমরাও খান আর এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করলেন না। বললেন, 'খলিল, তুমি তো জানো তোমাদের পূর্ব পাকিস্তান আগে থেকেই অনেকটা ঐতিহাসিক কারণে পশ্চিমের চেয়ে গরিব; অর্থনীতি, চাকরি-বাকরি, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে অনগ্রসর। তুমি কি মনে করো না এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে পশ্চিমের ফারাক আইয়ুবের আমলে দিন দিন কমে আসছে?'

এ নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হলো। আমি যা বললাম তার সারমর্ম হলো, 'দুই অংশের মধ্যে এই ফারাক দিন দিন বাড়ছে।' দু'একটি উদাহরণ দিলাম। মনে আছে বলেছিলাম, পি আই এ-তে প্রায় সতেরোশ' স্থায়ী কর্মচারী আছে। এর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা তিনশ'র অধিক নয়। আর চেয়ে দেখুন আমাদের এই দূতাবাসটি। বাঙালিরা তো কেরানি তৈরি করার জন্য বিখ্যাত; কিন্তু এখানে ২০ জন কেরানির মধ্যে মাত্র ক'জন বাঙালি। এই সময় একটু রূঢ় কথাও বলে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম যে প্রায় অর্ধেক রাষ্ট্রদূতই তো দেখি অযোগ্য। তাদের প্রধান কাজ তো বিদেশের দামি বিলাসিতার দ্রব্য, যা আজকাল দেশে অপ্রাপ্য কিংবা দুষ্প্রাপ্য, সেগুলোর চালান করে দু'পয়সা কামাই করা। এমনি অযোগ্য ও অসৎ লোকও কি পূর্ব পাকিস্তানে দুর্লভ? তারপর সামরিক বাহিনী। কয়েক লক্ষ সৈনিকদের মধ্যে কেবল পাঁচ শতাংশ বাঙালি হয় কেন?

এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এক সময় আলতাফ কাদের বললেন, 'খলিল যা বলেছে তা যদি সত্য হয় তা হলে তো আমাদের কিছু করা দরকার ও সেই দরকারও অবিলম্বে। আচ্ছা খলিল, পূর্ব পাকিস্তানের সব মানুষই কি ছয় দফা সমর্থন করে বলে তুমি মনে করো?' এ সময় ওমরাও খান বললেন, 'কাদের, সাধারণ বাঙালি কি বোঝে? তাদের যা বোঝানো যায় তাই বোঝে। শেখ মুজিব ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক এই কাজটি করছে—বাঙালিদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। এজন্যই তো তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছে।'

আলতাফ কাদের বললেন, 'ওমরাও, তোমরা তাহলে শেখকে বন্দি করে এই সমস্যাটার সমাধান করেছ বলে মনে করো—তাই না? তা হলে তো আর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এই আলোচনারও কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাই না ওমরাও, তাই না গিয়াস সাহেব? কিন্তু একজন দেশবাসী হিসেবে আমি এতোটা নিশ্চিত হতে পারছি না। দেখি একজন বাঙালি হয়ে খলিল কি মনে করে। খলিল তুমি মন্তব্য করো।'

এ ধরনের প্রসঙ্গে মন্তব্য করা নিরাপদ তো নয়ই, নেহাত বিপজ্জনক; কিন্তু পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। এখন আর পেছানোর উপায় নেই। তাই এগিয়ে চললাম। যা বললাম তার সারমর্ম, 'আমাদের দেশের মানুষ নির্বোধ, আমি তা

মনে করি না। তাদের যা বোঝানো যায় তাই বোঝে, এ কথায় সামান্য সত্যতা থাকলেও সবটা সত্য নয়। মানুষ সত্য কথা বুঝতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কোনো নেতা যদি মানুষের মনের সত্য অনুভূতি বুঝতে পারেন এবং সাহসের সঙ্গে তা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন, তবে মানুষ তাঁকে অনুসরণ করবে। প্রয়োজনে মানুষ সেই নেতার কথায় আত্মাহুতি দিতেও প্রস্তুত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের দেশের মানুষ বিশেষ করে বাঙালিরা ইংরেজের কাছ থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও আসল স্বাধীনতা পায় নি, অর্থনৈতিক মুক্তি পায় নি। কাজেই ছয় দফার আক্ষরিক অর্থে না ঢুকেও সে বুঝে ছয় দফার মতো একটি দাবি প্রতিফলিত করছে তার অনুভূতি ও তার আকুতি। যদি সেরকম নেতৃত্ব পায় তবে বাঙালি এর জন্য আত্মত্যাগ করবে বলে আমার বিশ্বাস। অতএব, ছয় দফার প্রতি বাঙালি জনগণের একটি সাধারণ সমর্থন আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

আলতাফ কাদের প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে এক্ষেত্রে উপায় কি, আমাদের করণীয় কি?' বললাম, 'এর উত্তর পাকিস্তানে অবিলম্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আর যদি পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিশেষ করে পাঞ্জাবের সামরিক/বেসামরিক আমলাতন্ত্র গণতন্ত্র দিতে না চান—তারা চাইবে না বলেই আমার বিশ্বাস, তা হলে উচিত হবে পূর্ব পাকিস্তানের ছয় দফার প্রস্তাব গ্রহণ করা।'

এরপর আলতাফ কাদের প্রশ্ন করলেন, 'ধর, যদি এর কোনোটাই দেয়া না হয়। দেয়া হবে না বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

বললাম, 'তা হলে? অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক এবং অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে কথাটা বলছি, তাহলে একমাত্র অবধারিত পথ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রাম। সে সংগ্রাম কিভাবে হবে, কিভাবে এগুবে, কি রূপ নেবে জানি না।'

কথাটা বলে ফেলে যেমন আমি থ হয়ে গেলাম, তেমনি শ্রোতারাও থ হয়ে গেলেন। এরপর আর কথা চলে নি। আর বিশেষ কথা ছিলও না। অল্প পরে ডিনার পরিবেশন করা হলো।

এই কথোপকথনটির প্রসঙ্গই তুলেছিলেন বেগম আলতাফ কাদের, ১৯৭৩ সালের ২২ ডিসেম্বর। যাওয়ার সময় জেনারেল কাদের বললেন, সেদিন তোমার কথাগুলো ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে রেখাপাত করেছিল; কিন্তু আমিও অতোটা গুরুত্ব দিই নি কথাগুলোতে। আর আমার মনে হয় ওঁরা তিনজন তো আরও গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু আমি ও আমার স্ত্রী প্রায় গোটা ১৯৭১ সাল জুড়ে তোমাদের কথা মনে করেছি। তোমাকে খুঁজেছি। একদিন টেলিফোন করেছিলাম; কিন্তু টেলিফোনে তোমার পক্ষে খোলাখুলি কথাবার্তা বলা সম্ভব ছিল না আমি জানতাম। এবার বলো আমাদের এই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কি?'

ব্রিগেডিয়ার রহিমকে যা বলেছিলাম তার পুনরাবৃত্তি করলাম। অর্থাৎ, যদি

গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে পাকিস্তানের এই চার জাতির সহ-অবস্থান সম্ভব। না হলে দুরূহ।

রাতের খাওয়া ছিল জেনারেল সওয়ার খানের বাসায়। পাঠককে মনে করিয়ে দেয়ার জন্য বলছি, ইনি সেই ব্রিগেডিয়ার সওয়ার খান, যিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে শবেবরাত সম্বন্ধে আমি পাকিস্তানে এসেই প্রথম জেনেছি কিনা। তিনি এখন লাহোরের জি ও সি। এক সময় আমার অধিকর্তা ছিলেন। তখন বেশ হৃদ্যতা ছিল এই দম্পতির সঙ্গে। অতএব, ভালোই কাটলো সন্ধ্যার পর্বটা।

পরদিন ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩ বেলা দশটার দিকে আমরা লাহোর বিমানবন্দরে। ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব রেডক্রস সংক্ষেপে আই. সি. আর. সি আমাদের সব বন্দিকে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছে। ওদেরই ভাড়া করা বড় জেট বিমানগুলো। এই আই. সি. আর. সি কর্মকর্তারা ছিলেন সুইজারল্যান্ডের। এদের পেছন ছিল ইউ. এন. এইচ. সি. আর.। জাতিসংঘের খরচেই এতো বড় ও ব্যয়সঙ্কুল বন্দি বিনিময়। আই. সি. আর. সি করছিল দু'পক্ষের মধ্যে ঘটকালি অর্থাৎ সমন্বয়।

শ' দুয়েক যাত্রী নিয়ে বিমান উড়ে চললো ঢাকার দিকে। কয়েক মাস আগে কল্পনা করাও কঠিন ছিল এই মুক্তির দিনটি কবে আসবে কিংবা কখনও আসবে কিনা। নিজেদের ভবিষ্যৎ, জাতির ভবিষ্যৎ ইত্যাদি দুরূহ চিন্তার চাইতে আত্মীয়-স্বজনদের মুখ, আমার গ্রামের বাড়ি ও সেখানকার লোকজনের মুখ এই সব বিশেষ করে ভেসে বেড়াচ্ছিল মনে। জীবনের সবচাইতে আনন্দদায়ক দিনগুলোর অন্যতম ছিল এটি।

সন্ধ্যার দিকে বিমান পৌঁছল তেজগাঁও বিমানবন্দরে। বিমান অবতরণের আগে একবার মনে পড়েছিল ১৯৪৮ সালের ১৪ আগস্টের কথা, সেদিন ছিল সামরিক জীবনে যোগদানের জন্য যাত্রা। সেদিন এই তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি অভিমুখে আমার যাত্রা। সেই পাকিস্তান থেকে শেষ প্রত্যাবর্তন এমনভাবে হবে ভাবি নি।
